২৪ ডিসেম্বর ১৯৮৬ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ চার টাকা

মেলামেলা

কল্পবিজ্ঞান-সংখ্যা

প্রচ্ছদ-নিবন্ধ

এ-যুগ কল্পবিজ্ঞানের

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস □ অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়া
সত্যজিৎ রায়ের রোবট-কাহিনী 'অনুকূল'
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ,
এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
ও সঙ্কর্ষণ রায়ের গল্প

ত্বকে আসুক চির বসন্ত

বোরো ক্যালেন্ডুলা অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম—সতেজ আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক'র সাথী। এতে আছে প্রাকৃতিক উপাদান—ক্যালেন্ডুলা ও হাইড্রাস্টিস ভেষজ'র উপকারী নির্য্যাস। বোরো ক্যালেন্ডুলা অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম—প্রতিকূল আবহাওয়ায় আপনার ত্বক'র চিরকালীন সুরক্ষা। ঠোঁট ফাটা, ছোটো খাটো কাটা-ছড়া আর পোড়া'র ক্ষতকেও চটপট সারিয়ে তোলে। বোরো ক্যালেন্ডুলার ভেষজ পরশ, ত্বক'র যত্ন—সারা বরষ।

বোরো ক্যালেন্ডুলা*
অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

HL এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

Mileage/HL/1-86

* A PATENT AND PROPRIETARY HOMOEOPATHIC MEDICINE OF HAHNEMANN LABORATORY

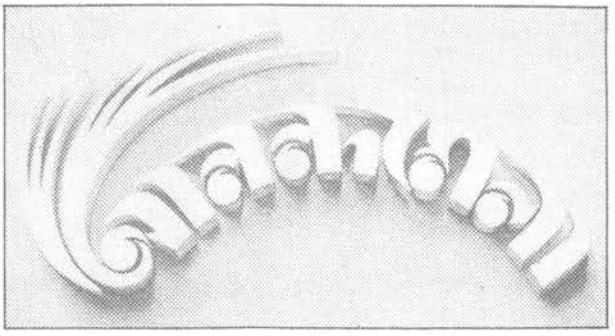

কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক সম্পূর্ণ উপন্যাস
ঘনাদার চিংড়ি-বৃত্তান্ত
প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪৪

কল্পবিজ্ঞানের ছড়া
চন্দ্রযান
অন্নদাশঙ্কর রায় ৯
কল্পবিজ্ঞানের গল্প
অনুকূল
সত্যজিৎ রায় ১২

টিকু লাটিম ও কাটরুবুড়ো
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৮

অদৃশ্য বলয়
...ক্ষী চট্টোপাধ্যায় ২৬
...তের ভবিষ্যৎ
...েন্দু মুখোপাধ্যায় ৩২

পাশের বাড়ির বন্ধু
অনীশ দেব ৫৯
ক্যাপ্টেন
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৬৫

রং বদলায়
সঙ্কর্ষণ রায় ৬৯
মৃত্যু-তালিকা
সুবোধ সরকার ৭১
নতুন মানুষ
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮

প্রচ্ছদ-নিবন্ধ
এ-যুগ কল্পবিজ্ঞানের
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮

জুলে ভার্ন, ওয়েলস
চঞ্চল পাল ৪১

ধারাবাহিক উপন্যাস
নীলমূর্তি-রহস্য
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৮৩
ডোরাকাটা জামা
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৮৬
শার্লক হোমসের গল্প
গ্রিক দোভাষীর বিপদ
সার আর্থার কোনান ডয়েল ৮৯
খেলাধুলো
লাম্বা টেস্টেও সফল হবেন, আশা করা যায়
মানস চক্রবর্তী ৯৮

গাওস্কর যাঁর কাছে খেলা শেখেন
রূপক সাহা ১০১

উষার সাফল্যের মূলে
(ডাঃ) সুনীল ঠাকুর ১০৩
কমিক্‌স্‌
স্টার ওঅরস ৬৩, স্পাইডারম্যান ৭৫, টারজান ৭৭, টিনটিন ৯৫, গাবলু ৯৭, রোভার্সের রয় ১০৫
নিয়মিত বিভাগ
কুইজ ৭, ধাঁধা ৯২, মজার খেলা ৯২, হাসিখুশি ৯২, আঁকিবুকি ৯৩, শব্দসন্ধান ৯৩, কিসের ফোটো ৯৩, ডাক্তারবাবু বলছেন ৯৪,

প্রচ্ছদ
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আগামী সংখ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর গল্প : নিখোঁজ নিরুদ্দেশ হতে গেলে
দুলেন্দ্র ভৌমিকের সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ) : মাঠের রাজা
অরূপরতন ভট্টাচার্যের প্রচ্ছদকাহিনী : কীভাবে শিকার ধরে জীবজন্তুরা
সীতা মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ : ভুপাল থেকে পাঁচমারি
কুইজ □ ডাকটিকিট □ ম্যাজিক □ খেলাধুলো

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম চার টাকা।
বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ৩০ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের চাই কমপ্লান

একমাত্র কমপ্লান-এই আছে এদের প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় ২৩-টি খাদ্যগুণ

সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা ১৫ বা ১৬ বছর বয়সের মধ্যে প্রায় সর্বদিক থেকেই পুরোপুরি ভাবে বেড়ে ওঠে।

তাই এদের এই সময়ে দরকার এমন পুষ্টি যা সরাসরি সুস্থ-সবল শরীর গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এই কারণেই আপনার ছেলেমেয়েদের আজ থেকেই **কমপ্লান** খাওয়ানো শুরু করুন। **কমপ্লান**-এ আছে প্রোটিনের সেরা মিল্ক প্রোটিন(২০%)। এছাড়া আছে আরো ২২-টি খাদ্যগুণ; । যেমন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ-পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, প্রভৃতি যা ওদের বাড়ন্ত বয়সের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এইসব অশেষ গুণের জন্যই আপনার ছেলেমেয়েদেরও নিয়মিত কমপ্লান দিন দিনে দু'বার করে।

কমপ্লান পাবেন চকোলেট, স্ট্র... এলাচ-জাফরান ও আইসক্রীমের চমৎকা... স্বাদে গন্ধে আর প্লেনও— যা বাচ্চাদের দারুণ ভাল লাগবেই লা...

23

সুপরিকল্পিত মাত্রায় ২৩-টি প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ

প্রোটিন	রিবোফ্ল্যাভিন্
ফ্যাট	নিকোটিনামাইড
কার্বোহাইড্রেট	ক্যালসিয়াম প্যান্টোথিনেট
ক্যালসিয়াম	কলিন
ফসফরাস	পাইরিডক্সিন (বি৬)
সোডিয়াম	ভিটামিন বি১২
ক্লোরাইড (সি এল রূপে)	ফলিক অ্যাসিড
পটাসিয়াম	ভিটামিন সি
আয়রণ	ভিটামিন ডি
আয়োডিন	ভিটামিন ই
ভিটামিন এ	ভিটামিন কে
ভিটামিন বি১	

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কমপ্লান® –সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

B84.GLC

সম্পাদকের চিঠি

চাও যে সায়েন্স-ফিকশন, তাই
ঢুঁড়েছি দিগ্বিদিক,
ফলে যা পাচ্ছ, তার সবটাই
বিজ্ঞানভিত্তিক ।
সত্যজিতের অনুকূল, আর
প্রেমেনদাদার ঘনা,
খাঁটি বিজ্ঞান তিন সিকি তার,
এক সিকি কল্পনা ।
বাদবাকিরাও স্বনামধন্য,
সঙ্গে আছেন তারই ;
তাই এ-সংখ্যা পড়ার জন্য
লাগবেই কাড়াকাড়ি ।

আমাদের সৌরপরিবার

আনন্দমেলা ২৯ অক্টোবর সংখ্যায় 'আমাদের সৌরপরিবার' পড়ে ভাল লাগল । তবে লেখাটিতে একটি বড় ভুল আছে । প্রবন্ধটি পড়ে অনেকের মনে হতে পারে, সৌরজগতের সুদূরতম প্রান্তের গ্রহ প্লুটো । কিন্তু সাধারণভাবে প্লুটো দূরবর্তী গ্রহ হলেও বর্তমানে নেপচুন খামখেয়ালিভাবে কক্ষপথ পরিভ্রমণ করছে । তার এই খামখেয়ালি ব্যবহারের জন্য সে এখন অবস্থান করছে প্লুটোর পেছনে । ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত নেপচুন এভাবেই থাকবে । তাই যদি প্রশ্ন করা হয়, সূর্যের থেকে সব চেয়ে দূরের গ্রহের নাম কী, তা হলে '১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তার উত্তর হবে নেপচুন ।

রমেন চৌধুরী
মহেশমাটি, মালদহ

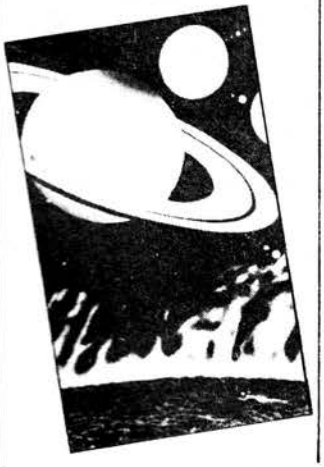

'আমাদের সৌরপরিবার' প্রবন্ধে নবাবিষ্কৃত দশম গ্রহ ভালকান এর নাম নেই । ভালকান নিয়ে লেখা দেখতে চাই ।

গঙ্গোত্রী ঘোষ
জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়

ভালকান-এর উল্লেখ করে চিঠি পাঠিয়েছেন জলপাইগুড়ি স্টেশন রোডের সুরঞ্জনা দত্তচৌধুরী, হুগলি জেলার রাজহাটের শমিত মণ্ডল, বেহালার সোমশুভ্র মুখার্জি, কান্দি, মুর্শিদাবাদের মিঠু সাহা ও হাওড়া জেলার খালনা গ্রামের সুমন দেয়াশী ।

'আমাদের সৌরপরিবার' পড়ে উপকৃত হয়েছি । প্রবন্ধে এক জায়গায় বলা হয়েছে, পৃথিবীর অক্ষ তার কক্ষতলের ওপর ২৩·৫° কোণ করে হেলে আছে । কিন্তু যতদূর জানি, পৃথিবী ৬৬·৫° কোণ করে হেলে আছে । এ সম্পর্কে লেখকের মতামত জানতে পারলে খুশি হব ।

শোভন শীল
বোলপুর, বীরভূম

আমাদের সৌরজগতে গ্রহাণুপুঞ্জ ছাড়া ন'টি গ্রহ আছে । কিন্তু সম্প্রতি রুশ মহাকাশবিজ্ঞানীরা প্লুটোর পরেও আরও দুটি গ্রহ আবিষ্কার করেছেন । এ দুটি হল এক্স-ওয়ান এবং এক্স-টু ।

সৈকত বসাক
কলকাতা-৫

সৌরজগতে বর্তমানে দশটি গ্রহ । দশম গ্রহটির নাম ভালকান । এ ছাড়া একাদশতম গ্রহটির অস্তিত্বও বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন । তা পরীক্ষাধীন বলে এখনও ভূগোলের পাতায় স্থান পায়নি । অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, 'পৃথিবীর অক্ষ তার কক্ষতলের ওপর ২৩·৫ ডিগ্রি কোণ করে হেলে আছে । এ-তথ্য তোমরা অনেকেই ভূগোলে পড়েছ ।' কিন্তু আমরা ভূগোল বই পড়ে জেনেছি, পৃথিবী তার কক্ষতলের সঙ্গে ৬৬·৫ ডিগ্রি কোণ করে হেলে আছে ।

মোহনচন্দ্র মণ্ডল, ও স্বপনকুমার মণ্ডল
সুভাষনগর, বেঙ্গাই, হুগলি

'আমাদের সৌরপরিবার' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, সবচেয়ে ছোট গ্রহ বুধ । কথাটা ভুল । সৌরজগতের সব চেয়ে ছোট গ্রহ প্লুটো । ১৯৭৮-এর ২২ জুন এটা জানা গিয়েছে । এর ব্যাস ৩, ০০ কিলোমিটার । ২৪৮·৫৪ বছরে এটা একবার সূর্য-প্রদক্ষিণ করে ।

মনোমিত ভৌমিক
বরাহনগর

দশম গ্রহ *'ভলকান'-এর কথা উল্লেখ করা হয়নি । ১৯৭১-এ এই গ্রহটি আবিষ্কৃত হয় । লেখক বলেছেন, সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে বুধের সময় লাগে ৫৯ দিন । আমরা পাঠ্য বইয়ে পড়েছি, সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে বুধের সময় লাগে ৮৮ দিন । এ নিয়ে আমরা নিশ্চিত নই । সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা করলে ভাল হয় ।*

অমৃতা রায়, অনিন্দিতা রায়
কলকাতা-২

পোড়া জায়গায় ঠাণ্ডা জল

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, পোড়া জায়গায় জল দেওয়া, বিশেষ করে ঠাণ্ডা জল দেওয়া ক্ষতিকারক নয় । এই জল দেহকে ঠাণ্ডা করে । যতক্ষণ না যন্ত্রণা কমে, ততক্ষণ পোড়া জায়গায় জল ঢালতে থাকুন । জল আগুন নেভায় তাড়াতাড়ি এবং আগুন যাতে চামড়ার ক্ষতি না করে, সেইজন্যই চাই জল । কিন্তু দিগ্‌দর্শক টিভি নিয়ে লেখায় যা বলেছিলেন তার অর্থ হল, পোড়া জায়গায় জল দেওয়া ঠিক নয় । অনেকে বলেন, পুড়ে গেলে জল ঢাললে ফোস্কা পড়ে ও তা খারাপ । ফোস্কা পড়ার মানে কিন্তু পোড়া ব্যক্তির চামড়া জীবন্ত । এরকম রোগী তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে ।

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনও মলম লাগাবেন না । গুরুতর রকমের পোড়া হলে, পরিষ্কার চাদর ঢাকা দিয়ে ডাক্তারের কাছে খবর দিন ।

লস্ প্রিভেনশন অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ এইসব তথ্য নানাভাবে প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন । আমার দাদু বিখ্যাত প্লাস্টিক সার্জন ডাঃ মুরারীমোহন মুখোপাধ্যায় বার্নস অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি । তিনি লস্ প্রিভেনশন অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে তাঁদের প্রচারের কার্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন । মানুষের জীবন অমূল্য । তাই ওগুলি পড়বেন ও অন্যদের জানাবেন ।

বিশ্বপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-২

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!

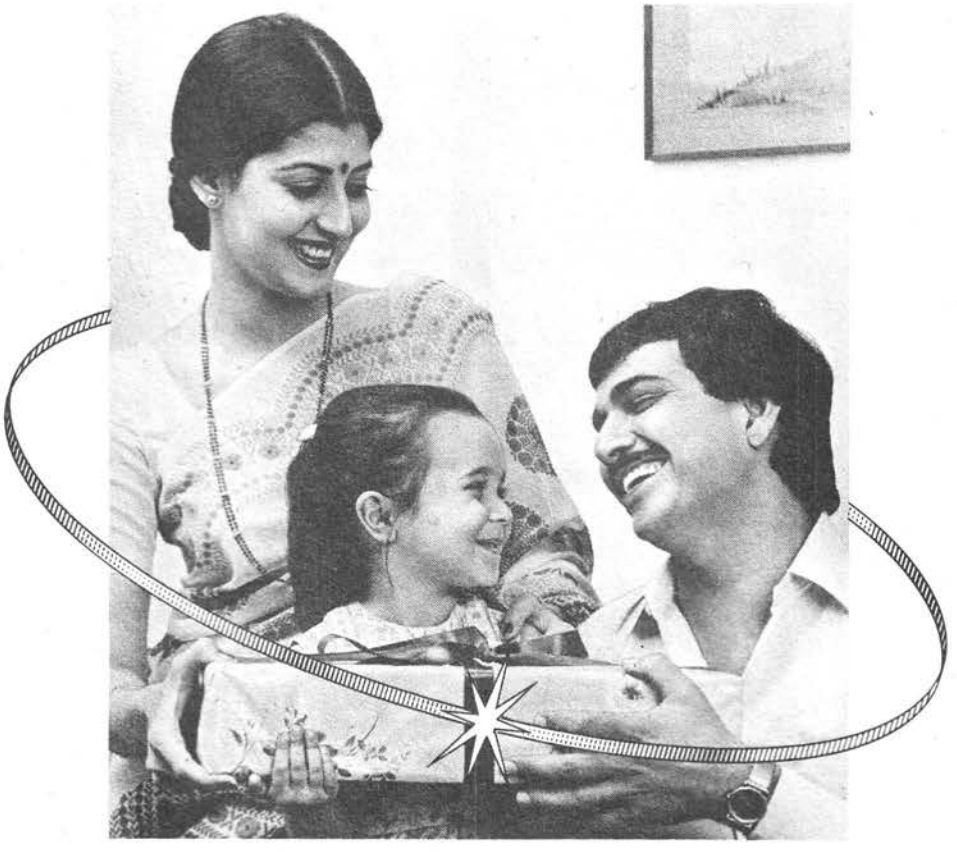

আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

নিয়মিত কোলগেট ব্যবহার সারা পরিবারকে দেয় সুস্থসবল দাঁত
আর তাজা নির্মল নিশ্বাস। এর থেকেই তো আসে আত্মবিশ্বাস!
আর কোলগেটের তাজা মিষ্টি স্বাদ কার না পছন্দ!

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়ে কোলগেটের বিশিষ্ট
ফর্মূলা কীভাবে কাজ করে দেখুন।

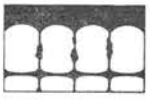

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা
খাবারের টুকরো থেকেই নিশ্বাসের গন্ধ
আর দাঁত ক্ষয়ের শুরু।

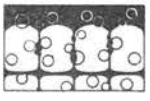

কোলগেটের অজস্র সক্রিয় ফেনা
দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয়ক্ষতিকারী
খাবারের কণাগুলো বার করে আনে,
রোগজীবানু হ'তে দেয় না।

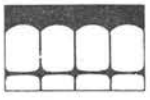

ফলে দাঁত থাকে সুস্থসবল,
নিশ্বাস হয় ঝরঝরে তাজা।

প্রতিদিন নিয়মিত কোলগেট দিয়ে দাঁত
মাজতে ভুলবেন না। সম্ভব হ'লে প্রতিবার খাবার পর।
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!
আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র।

কি তাজা মিষ্টি স্বাদ!

B84.55 Ben

গত সংখ্যার উত্তর

(১) কর্টেজ।
(২) I।
(৩) বনমালী নস্কর লেন।
(৪) শূন্য রানে তিনি বোলড্-আউট হন। বল করেছিলেন এরিক হলিস।

(৫) জওহরলাল নেহরু।

(৬) আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট।
(৭) কিরীটী রায়।

(৮) মহম্মদ ইকবাল।
(৯) শুঁটকি মাছ।
(১০) কিট ও হেলোয়াজ।
(১১) যাঁকে আমরা ক্রিস্টোফার কলম্বাস বলে চিনি, স্পেনীয় ভাষায় তিনিই হচ্ছেন ক্রিস্টোবেল কোলন।
(১২) ওয়াল্ট ডিসনির 'স্নো-হোয়াইট অ্যাণ্ড দি সেভ্ন ডোয়ার্ফস'।

কুইজ

নিল ও' ব্রায়েন

কল্পবিজ্ঞানের গল্প আঁকে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ছবি

রূপকথার সঙ্গে কল্পবিজ্ঞানের পার্থক্য কোথায়, কেউ যদি তোমাকে এই প্রশ্ন করেন তো বলবে, রূপকথার সঙ্গে বাস্তবের কোনও যোগসম্পর্ক নেই, আর কল্পবিজ্ঞানের গল্প সেক্ষেত্রে সেই ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে চায়, বৈজ্ঞানিক নানা উদ্ভাবন হয়তো যে-ভবিষ্যতের দুয়ারে একদিন আমাদের পৌঁছে দেবে। অর্থাৎ কল্পবিজ্ঞানের গল্প শোনায় ভবিষ্যতের বাস্তবের কথা, আর সেই কারণেই সে সম্ভাব্যতার সীমানাকে কখনও অতিক্রমও করে না। এ-কথা বলে রূপকথাকে একটুও ছোট করা হচ্ছে না, শুধু বলা হচ্ছে যে, দুটো দুই ধরনের জিনিস। কল্পবিজ্ঞানের গল্প অর্থাৎ সায়েন্স-ফিকশনকে অনেকে সংক্ষেপে বলেন 'স্কি-ফি' বা 'সাই-ফাই'। তোমরা কিন্তু এ-সব না-বলে সায়েন্স-ফিকশনই বলবে। কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের বয়স নেহাত কম হল না। রোমান কবি লুকান-এর (প্রথম খ্রিস্টাব্দ) রচনায় ছিল এই ধরনের গল্পের বীজ। তবে কিনা আজকাল এই গল্পকে যে-চেহারায় আমরা দেখি, তার সার্থক সূচনা গত শতকে। মেরি শেলির 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' রচিত হয়েছিল ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। সেটিই সম্ভবত প্রথম ইংরেজি কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী। ফরাসি লেখক সিরানো দ্য বারজারাক-এর 'অন্য জগৎ' অবশ্য লেখা হয়েছিল অনেক আগে, সপ্তদশ শতকে। পরবর্তী কালের ফরাসি লেখক জুলে ভার্ন এবং ইংরেজ লেখক এইচ· জি· ওয়েলস যে কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীর লেখক হিসেবে অনেক বেশি যশস্বী, তা তোমরা জানো। যা হয়তো জানো না, তা এই যে, কারেল কাপেক-এর 'রসাম'স ইউনিভার্সাল রোবট্স' নাটকেই রোবট শব্দটা প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল।

প্রশ্ন

(১) এইচ· জি· ওয়েলস-এর 'ওঅর অভ দি ওঅর্লড্স'-এ কোন্ দুই গ্রহের সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে ?
(২) টারজান-এর স্রষ্টা এডগার রাইস বারোজ এমন এক অভিযাত্রীর গল্পও লিখেছেন, যিনি কিনা পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম কী ?
(৩) ফ্ল্যাশ গর্ডন-এর শত্রু কে ?
(৪) কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের কোন্ লেখক নানা বিষয়ে দু'শোরও বেশি বই লিখেছেন ?
(৫) 'স্টার ওঅরস'-এর গল্পে আছে কথা বলতে সক্ষম একটি রোবট। কে সে ?
(৬) প্রোফেসর শঙ্কুর বাড়ি কোথায় ?

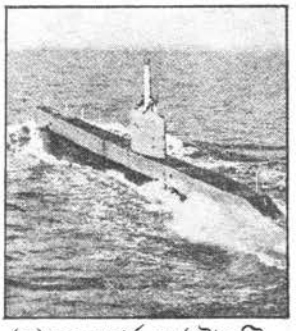

(৭) জুলে ভার্ন-এর 'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগ্স আণ্ডার দ্য সি' কাহিনীতে যে ডুবোজাহাজের কথা আছে, সেটির নাম কী ?
(৮) সেই ডুবোজাহাজের কম্যাণ্ডারের নামটাই বা কী ?
(৯) কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীর জন্য দেওয়া হয়, এমন কয়েকটি বিখ্যাত পুরস্কারের নাম বলো।
(১০) টিভিতে প্রদর্শিত 'স্টার ট্রেক' ছবির স্টারশিপ এণ্টারপ্রাইজ-এর কম্যাণ্ডার কে ?
(১১) 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' চলচ্চিত্রে অভিনয় করে বরিস কার্লফের খুব নাম হয়েছিল। তা চলচ্চিত্রে যে-চরিত্রটি তিনি অভিনয় করেন, তার নাম কী ?

(১২) 'রাডার'-এর উন্নয়নে যিনি সাহায্য করেছিলেন, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে একদিন বিশাল এক যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে, কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীর সেই লেখকের নাম কী ?

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

বাড়ীর গিন্নীকে কে দেখবে!

সকালের জল খাবার, বাচ্চাদের স্কুলের জন্য তৈরী করা, স্বামীর দুপুরের খাবার,
বাজার-হাট, ঘর-বাড়ী গোছান, পরিবারের সকলের ঠিকভাবে দেখা শুনো করা...।
আমার দিনগুলো কাজে ঠাসা, সেই জন্য আমার চাই হরলিক্স।

হরলিক্সে আছে পুষ্টি—
যা আমাকে সারাদিন অফুরন্ত কাজের জন্য প্রচুর শক্তি এবং ক্ষমতা যোগায়।
এমনকি সারাদিন কাজের শেষে বিকেল বেলায় স্বচ্ছন্দে পরিবারের সকলের সাথে
আনন্দমুখর মুহূর্তগুলি উপভোগ করতে পারি।

হরলিক্স ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি আর সোনালী গমের
দানার পুষ্টিগুণে ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, পৃথিবী জুড়ে কোটি
কোটি পরিবারে পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।

গৃহীনির জন্য শক্তি-পানীয়।

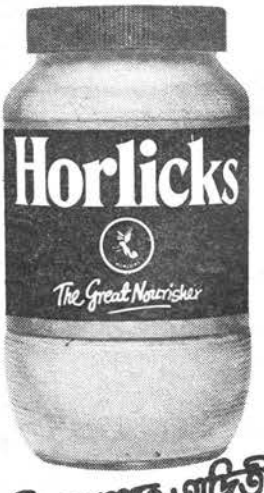

পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়

HMM-9241BEN

চন্দ্রযান

অন্নদাশঙ্কর রায়

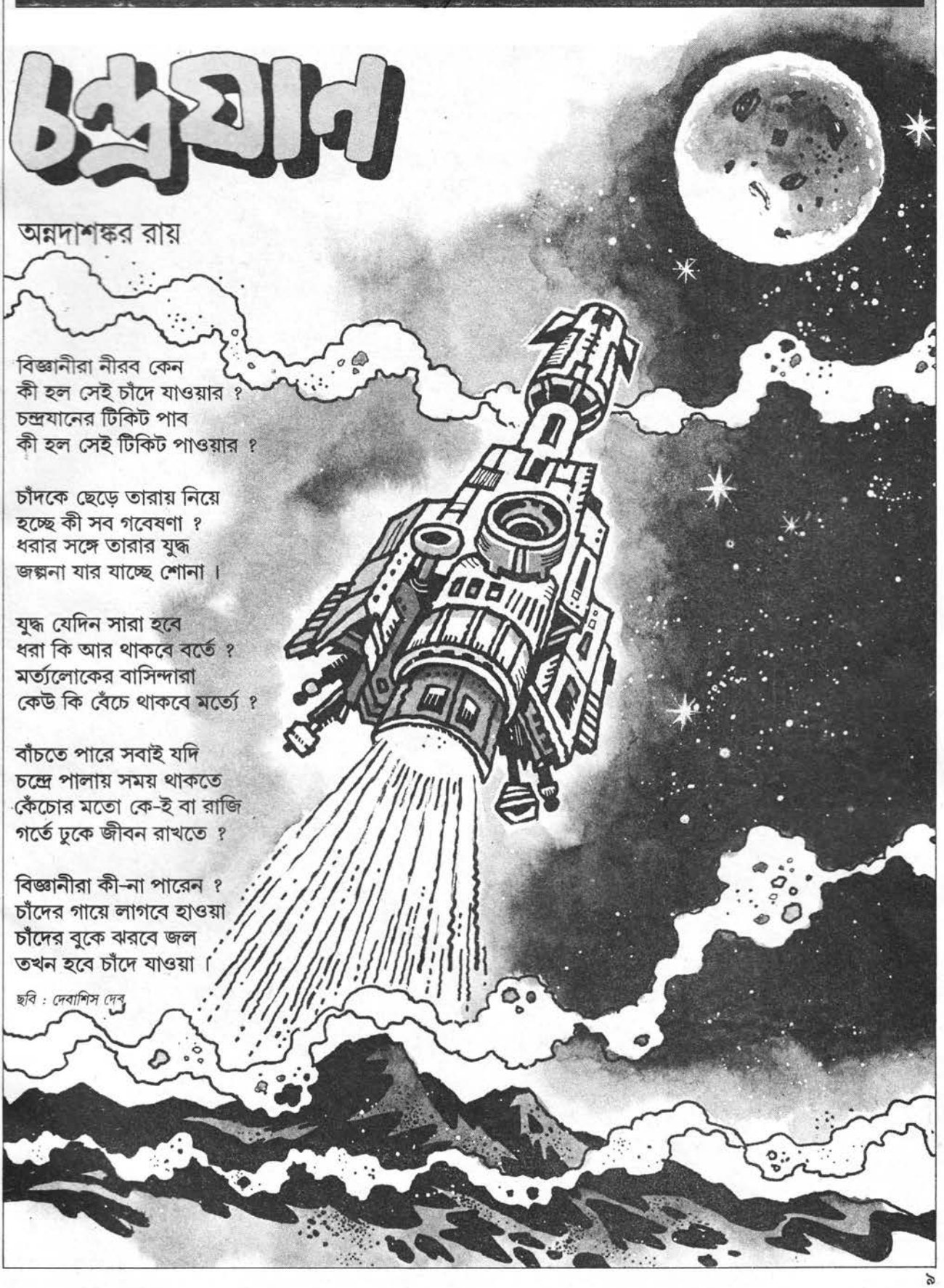

বিজ্ঞানীরা নীরব কেন
কী হল সেই চাঁদে যাওয়ার ?
চন্দ্রযানের টিকিট পাব
কী হল সেই টিকিট পাওয়ার ?

চাঁদকে ছেড়ে তারায় নিয়ে
হচ্ছে কী সব গবেষণা ?
ধরার সঙ্গে তারার যুদ্ধ
জল্পনা যার যাচ্ছে শোনা ।

যুদ্ধ যেদিন সারা হবে
ধরা কি আর থাকবে বর্তে ?
মর্ত্যলোকের বাসিন্দারা
কেউ কি বেঁচে থাকবে মর্ত্যে ?

বাঁচতে পারে সবাই যদি
চন্দ্রে পালায় সময় থাকতে
কেঁচোর মতো কে-ই বা রাজি
গর্তে ঢুকে জীবন রাখতে ?

বিজ্ঞানীরা কী-না পারেন ?
চাঁদের গায়ে লাগবে হাওয়া
চাঁদের বুকে ঝরবে জল
তখন হবে চাঁদে যাওয়া ।

ছবি : দেবাশিস দেব

গৃহস্থের রক্ষাকবচ

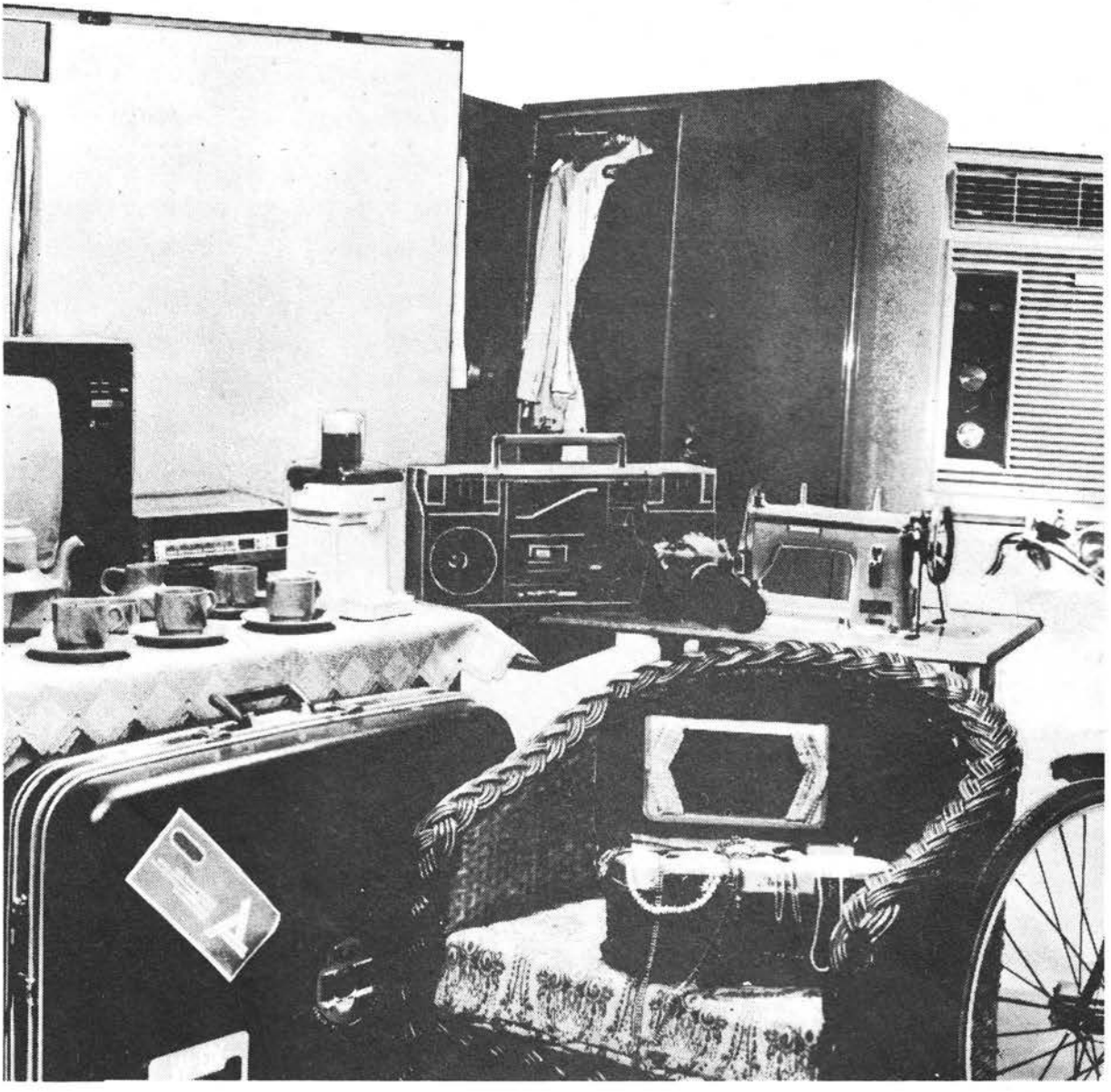

ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার হাউসহোল্ডারস পলিসি আপনার গৃহস্থালির যাবতীয় পরিসম্পদের রক্ষাকবচ। আপনার জড়োয়া গহনা ও মূল্যবান জিনিসপত্র, রান্নাঘরের সাজসরঞ্জাম, ফার্নিচার ও ফিক্সচার, বাসন-কোসন, টিভি, ভিসিআর, রেডিও, প্যাডেল সাইকেল, সঙ্গের লটবহর, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা, এমনকি চুরি, অগ্নিকান্ড ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে আপনার বাড়িটিও আমাদের পলিসির আওতায় পড়ে।

ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার হাউসহোল্ডারস পলিসি আপনার গৃহের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে।

আরও বিবরণের জন্য আপনার নিকটতম ইউ আই অফিস অথবা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

MAA (S) UI 8644

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ

২৪, হোয়াইট্‌স রোড, মাদ্রাজ-৬০০ ০১৪

বোর্নভিটা দিয়ে জেগে উঠল শরীর-মন স্বাস্থ্যে ঝলমলালো!

প্রতিটি মা জানেন যে, ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা. কোকো, মল্ট, দুধ ও চিনির পুষ্টিগুণে ভরপুর থাকে। বোর্নভিটা দুধে, এমনই স্বাদেভরা গুণ ভরে দেয়, যা বাচ্চাদের দারুণ পছন্দের—

যেসব বাচ্চারা প্রতিদিন বোর্নভিটা পায়, প্রতি কাজে ও প্রতি খেলায় তারা স্ফূর্তি দেখায়—বোর্নভিটা, সুস্থ-সবল, সজাগ-সচেতন রাখতে ও বাড়তে, ওদের সবদিক দিয়ে সঙ্গ দেয়।

এ হল সেই স্বাদ, যার সাথে সাথে বাড়তে থাকার মজাই আলাদা!

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

অনুকূল

সত্যজিৎ রায়

'এর একটা নাম আছে ত ?' নিকুঞ্জবাবু জিগ্যেস করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বই কি।'

'কী বলে ডাকব ?'

'অনুকূল।'

চৌরঙ্গিতে রোবট সাপ্লাই এজেন্সির দোকানটা খুলেছে মাস ছয়েক হল। নিকুঞ্জবাবুর অনেক দিনের শখ একটা যান্ত্রিক চাকর রাখেন ; ইদানীং ব্যবসায় বেশ ভাল আয় হয়েছে, তাই শখটা মিটিয়ে নেবার জন্য এসেছেন।

নিকুঞ্জবাবু রোবটটার দিকে চাইলেন। এটা হচ্ছে যাকে বলে অ্যান্ড্রয়েড, অর্থাৎ যদিও যান্ত্রিক, তাও চেহারার সঙ্গে সাধারণ মানুষের চেহারার কোনো তফাত নেই। দিব্যি সুশ্রী দেখতে, বয়স মনে হয় বাইশ-তেইশের বেশি নয়।

'কী ধরনের কাজ করবে এই রোবট ?' জিগ্যেস করলেন নিকুঞ্জবাবু। ডেস্কের উলটো দিকের ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'সাধারণ চাকর যা পারে, ও তার সবই পারবে। কেবল রান্নাটা জানে না। তা ছাড়া, ঘর ঝাড়পোঁছ করা, বিছানা পাতা, কাপড় কাচা, চা দেওয়া, দরজা জানালা খোলা বা বন্ধ করা—সবই পারবে। তবে হ্যাঁ—ও যা কাজ করবে সবই বাড়িতে। ওকে দিয়ে বাজার করানো চলবে না, বা পান-সিগারেট আনাতে পারবেন না। আর ইয়ে—ওকে কিন্তু তুমি বলে সম্বোধন করবেন। তুইটা ও পছন্দ করে না।'

'এমনি মেজাজ-টেজাজ ভাল ত ?'

'খুব ভাল। সে-দিক দিয়ে ট্রাবল আসবে, যদি আপনি কোনো কারণে ওর গায়ে হাত তোলেন। আমাদের রোবটরা ওটা একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না।'

'সেটার অবিশ্যি কোনো সম্ভাবনা নেই ; কিন্তু ধরুন, যদি কেউ ওকে একটা চড় মারল, তা হলে কী হবে ?'

'তা হলে ও তার প্রতিশোধ নেবে।'

'কী ভাবে ?'

'ওর ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে ও হাই-ভোল্টেজ ইলেকট্রিক শক দিতে পারে।'

'তাতে মৃত্যু হতে পারে ?'

'তা পারে বই কি। আর আইন এ-ব্যাপারে কিছু করতে পারে না, কারণ রক্ত-মাংসের মানুষকে যে শাস্তি দেওয়া চলে, যান্ত্রিক মানুষকে তা চলে না। তবে এটা বলতে পারি যে, এখনো পর্যন্ত এরকম কোনো কেস হয়নি।'

'রাত্তিরে কি ও ঘুমোয় ?'

'না। রোবটরা ঘুমোয় না।'

'তা হলে এতটা সময় কী করে ?'

'চুপ করে বসে থাকে। রোবটের ধৈর্যের অভাব নেই।'

'ওর কি মন বলে কোনো বস্তু আছে ?'

'ওরা এমন অনেক কিছু বুঝতে পারে, যা সাধারণ মানুষ পারে না। এ গুণটা সব রোবটের যে সমান পরিমাণে থাকে তা নয় ; এটা খানিকটা লাকের ব্যাপার। এ গুণটা সময়ে প্রকাশ পায়।'

নিকুঞ্জবাবু রোবটটার দিকে ফিরে বললেন, 'অনুকূল, আমার বাড়িতে কাজ করতে তোমার আপত্তি নেই ত ?'

'কেন থাকবে ?' ষোলো আনা মানুষের মতো গলায় বলল অনুকূল। তার পরনে একটা নীল ডোরা কাটা শার্ট আর কালো হাফপ্যান্ট, বাঁ পাশে টেরি আর পাট করে আঁচড়ানো চুল, গায়ের রং বেশ ফরসা, দাঁতগুলো ঝকঝকে আর ঠোঁটের কোণে সব সময়ই যেন একটা হালকা হাসি লেগে আছে। চেহারা দেখে মনে বেশ ভরসা আসে।

'তা হলে চলো।'

ছুটির দিনের সাথী
সকাল থেকে উড়ছে ঘুড়ি চারটে, ছটা, আটটা,
হলদে সবুজ চাঁদিয়ালটা ওই দ্যাখো ভোকাট্টা!
ধরব বলে তাড়াতাড়ি উঠতে গেলাম গাছে,
হঠাৎ ডালের ঘষা লেগে কাটল হাঁটুর কাছে।
দেখলেই মা বকবে ভীষণ, ভয় তো কেবল তাই–
তার থেকে নয় আগেভাগেই বোরোলীন লাগাই।
বোরোলীন কাটাছড়া, ব্রণ, ফুসকুড়ি, ফাটা ও শুকনো চামড়ার ইনফেকশন সারিয়ে তোলে। বোরোলীনের অ্যান্টিসেপ্টিক গুণ ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।
বোরোলীন
সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম
BOROLINE
শুষ্ক ত্বকে ও সাধারণ কাটাছড়ায় অসাধারণ কাজ দেয়
GD
জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল কলকাতা ৭০০০৫৩
প্রসাধন সামগ্রী নয়
Response.1014

নিকুঞ্জবাবুর মারুতি ভ্যান দোকানের বাইরেই অপেক্ষা করছিল, অনুকূলের জন্য চেকটা দিয়ে রসিদ নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তিনি লক্ষ করলেন যে, ভৃত্যের হাঁটাচলা দেখেও সে যে যান্ত্রিক মানুষ, সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই।

নিকুঞ্জবাবু বাড়ি করেছেন সল্ট লেকে। বিয়ে করেননি, তবে বন্ধুবান্ধব কয়েকজন আছে, তারা সন্ধ্যাবেলা আসে তাস খেলতে। তাদের আগে থেকেই বলা ছিল যে, বাড়িতে একটি যান্ত্রিক চাকর আসছে। কেনার আগে অবিশ্যি নিকুঞ্জবাবু খোঁজ নিয়ে নিয়েছিলেন। এই ক'মাসে কলকাতার বেশ কিছু উপরের মহলের বাড়িতে রোবট-ভৃত্য বহাল হয়েছে। মানসুখানি, গিরিজা বোস, পঙ্কজ দত্তরায়, মিঃ ছাবরিয়া—সকলেই বললেন তাঁরা খুব স্যাটিসফাইড, এবং তাঁদের চাকর কোনো ট্রাবল দিচ্ছে না। 'মুখ খুলতে না খুলতেই ফরমাশ পালন করে আমার জীবনলাল,' বললেন মানসুখানি। 'আমার ত মনে হয় ও শুধু যন্ত্র নয়, ওর মাথার মধ্যে মগজ আছে আর বুকের মধ্যে কলিজা আছে।'

সাতদিনের মধ্যে নিকুঞ্জবাবুরও সেই একই ধারণা হল। আশ্চর্য পরিপাটি কাজ করে অনুকূল। শুধু তা-ই নয়, কাজের পারম্পর্যটাও সে বোঝে। বাবু স্নানের জল চাইলে সেটা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সাবান তোয়ালে যথাস্থানে রেখে বাবু কী কাপড় পরবেন, কী জুতো পরবেন স্নান করে এসে, সেটাও পরিপাটি করে ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রেখে দেয়। আর সব ব্যাপারেই সে এত ভব্য যে, তাকে তুমি ছেড়ে তুই বলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

নিকুঞ্জবাবুর বন্ধুদের অনুকূলকে মেনে নিতে একটু সময় লেগেছিল—বিশেষত বিনয় পাকড়াশি নিজের বাড়ির চাকরদের তুই বলে এমন অভ্যস্ত যে, অনুকূলকেও একদিন তুই বলে ফেলেছিলেন। তাতে অনুকূল গম্ভীর ভাবে বলে, 'আমাকে তুই বললে কিন্তু তোকেও আমি তুই বলব।'

এরপর থেকে বিনয়বাবু আর কোনোদিন এ-ভুলটা করেননি।

নিকুঞ্জবাবুর সঙ্গে অনুকূলের একটা বেশ সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠল। অনুকূল বেশির ভাগ কাজই হুকুম দেবার আগেই করে ফেলে। এটা অবিশ্যি নিকুঞ্জবাবুর বেশ আশ্চর্য বলে মনে হয়, কিন্তু রোবট সাপ্লাই এজেন্সির মিঃ ভৌমিক বলেছিলেন যে, তাঁদের কোনো-কোনো রোবটের মস্তিষ্ক বলে একটা পদার্থ আছে, চিন্তাশক্তি আছে। অনুকূল নিশ্চয়ই সেই শ্রেণীর রোবটের মধ্যেই পড়ে গেছে। ঘুমোনোর ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিকুঞ্জবাবু ভৌমিকের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। যে এতটাই মানুষের মতো, সে সারারাত জেগে বসে থাকবে, এও কি সম্ভব? ব্যাপারটা যাচাই করতে তিনি একদিন মাঝরাত্তিরে চুপিসাড়ে অনুকূলের ঘরে উঁকি দিতেই অনুকূল বলে উঠল, 'বাবু, আপনার কি কোনো দরকার আছে?' নিকুঞ্জবাবু অপ্রস্তুত হয়ে 'না' বলে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

অনুকূলের সঙ্গে কাজের কথা ছাড়াও অন্য কথা বলে দেখেছেন নিকুঞ্জবাবু। তিনি দেখে আশ্চর্য হয়েছেন অনুকূলের জ্ঞানের পরিধিটা কত বিস্তীর্ণ। খেলাধুলা বায়স্কোপ থিয়েটার নাটক নভেল, সব কিছু নিয়েই কথা বলতে পারে অনুকূল। আর সত্যি বলতে কি, অনুকূল এসব বিষয় যত জানে, নিকুঞ্জবাবু তার অর্ধেকও জানেন না। বাহাদুরি বলতে হবে এই রোবট প্রস্তুতকারকদের। কত কী জ্ঞান পুরতে হয়েছে ওই যন্ত্রের মধ্যে!

কিন্তু সুসময়েরও শেষ আছে।

অনুকূল আসার এক বছরের মধ্যে নিকুঞ্জবাবু তাঁর ব্যবসায়ে কতকগুলো বেচাল চেলে তাঁর আর্থিক অবস্থার বেশ কিছুটা অবনতি করে ফেললেন। অনুকূলের জন্য মাসে তাঁর ভাড়া লাগে দু' হাজার টাকা। সে-টাকা এখনো তিনি নিয়মিত দিয়ে আসছেন, কিন্তু কতদিন পারবেন সেটাই হল প্রশ্ন। এবার একটু বেশি হিসেব করে চলতে হবে নিকুঞ্জবাবুকে। রোবট এজেন্সির নিয়ম হচ্ছে যে, এক মাসের ভাড়া বাকি পড়লেই তাঁরা রোবটকে ফেরত নিয়ে নেবে।

কিন্তু হিসেবে গণ্ডগোল করে দিল একটা ব্যাপার।

ঠিক এই সময় নিকুঞ্জবাবুর সেজোকাকা এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'চন্দননগরে একা-একা আর ভাল লাগছে না, তাই ভাবলুম তোর সঙ্গে ক'টা দিন কাটিয়ে যাই।'

নিকুঞ্জবাবুর এই সেজোকাকা—নাম নিবারণ বাঁড়ুজ্যে—মাঝে-মাঝে ভাইপোর কাছে এসে ক'টা দিন থেকে যান। নিকুঞ্জবাবুর বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, তিন কাকার মধ্যে একমাত্র ইনিই অবশিষ্ট। খিটখিটে মেজাজের মানুষ, শোনা যায় ওকালতি করে অনেক পয়সা করেছেন, তবে বাইরের হালচালে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। আসলে ভদ্রলোক বেজায় কঞ্জুষ।

'কাকা, এসেই যখন পড়েছেন তখন থাকবেন বই কি,' বললেন নিকুঞ্জবাবু, 'কিন্তু একটা ব্যাপার গোড়াতেই আপনাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। আমার একটি যান্ত্রিক চাকর হয়েছে। আজকাল কলকাতায় কয়েকটা রোবট কোম্পানি হয়েছে জানেন ত?'

'তা ত জানি,' বললেন নিবারণ বাঁড়ুজ্যে, 'কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে। কিন্তু চাকরের জাতটা কী শুনি। আমার আবার ওদিকে একটু কড়াকড়ি জানই ত। এ কি রান্নাও করে নাকি?'

'না না না,' আশ্বাস দিলেন নিকুঞ্জবাবু। 'রান্নার জন্য আমার সেই পুরনো বৈকুণ্ঠই আছে। কাজেই আপনার কোনো ভাবনা নেই। আর ইয়ে, এই চাকরের নাম অনুকূল, আর একে তুমি বলে সম্বোধন করতে হয়। 'তুই'টা ও পছন্দ করে না।'

'পছন্দ করে না?'

'না।'

'ওর পছন্দ-অপছন্দ মেনে চলতে হবে বুঝি আমাকে?'

'শুধু আপনাকে না, সকলকেই। তবে ওর কাজে কোনো ত্রুটি পাবেন না।'

'তা তুই এই ফ্যাসাদের মধ্যে আবার যেতে গেলি কেন?'

দ্যাখো, দ্যাখো কী মজা
কে হ'ল টফির রাজা !

প্যারীস্

প্যারীস্-এর টফি যদি খাও একবার—
তো চাইবে প্যারীস্-ই বারবার ! যখনই
কোনো সেরা টফি-র কথা ভাববে,
প্যারীস্-ই প্রথম তোমার মনে জাগবে !
আসলে, প্যারীস্ মানেই যে মজা-ই
মজা···টফি-র রাজা !

প্যারীস্-এর মজাদার
নানান টফি ঃ
ক্যারামিল্ক
ট্রাই-মি
চকোলেট একলেয়ার্স
চকলেয়ার্স
কোকোনাট ক্রীম
লালীপপ্স
গোল্ডেন বন্‌বন্

Parry's

গত ৭০ বছর ধ'রে টফি-র
দুনিয়ায় সবসেরা নাম !

PCL-1827

'বললাম ত—ও কাজ খুব ভাল করে।'

'তা হলে একবার ডাক তোর চাকরকে ; আলাপটা অন্তত সেরে নিই।'

নিকুঞ্জবাবু ডাক দিতেই অনুকূল এসে দাঁড়াল। 'ইনি আমার সেজোকাকা,' বললেন নিকুঞ্জবাবু, 'এখন আমাদের বাড়িতে কিছুদিন থাকবেন।'

'যে আজ্ঞে।'

'ও বাবা, এ ত দেখি পরিষ্কার বাংলা বলে,' বললেন নিবারণ বাঁড়ুজ্যে। 'তা বাপু দাও ত দেখি আমার জন্য একটু গরম জল করে। চান করব। বাদলা করে হঠাৎ কেমন জানি একটু ঠাণ্ডা পড়েছে, তবে আমার আবার দু'বেলা স্নান না করলে চলে না—সারা বছর।'

'যে আজ্ঞে।'

অনুকূল ঘর থেকে চলে গেল আজ্ঞাপালন করতে।

নিবারণবাবু এলেন বটে, কিন্তু নিকুঞ্জবাবুর অবস্থার কোনো উন্নতি হল না। মাঝখান থেকে সান্ধ্য আড্ডাটি ভেঙে গেল। একে ত খুড়োর সামনে জুয়াখেলা চলে না, তার উপর নিকুঞ্জবাবুর সে সংস্থানও নেই।

এদিকে কাকা কতদিন থাকবেন তা জানা নেই। তিনি মর্জিমাফিক আসেন, মর্জিমাফিক চলে যান। এবার তাঁর হাবভাবে মনে হয় না তিনি সহজে এখান থেকে নড়ছেন। তার একটা কারণ এই যে, অনুকূল সম্বন্ধে তাঁর একটা অদ্ভুত মনোভাব গড়ে উঠেছে। তিনি এই যান্ত্রিক ভৃত্যটি সম্পর্কে যুগপৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অনুভব করছেন। চাকর যে ভাল কাজ করে, সেটা তিনি কোনোমতেই অস্বীকার করতে পারেন না, কিন্তু চাকরের প্রতি ব্যবহারে এতটা সতর্কতা অবলম্বন করাটাও তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। একদিন ভাইপোকে বলেই ফেললেন, 'নিকুঞ্জ, তোর এই চাকরকে নিয়ে কিন্তু মাঝে-মাঝে আমার খুব মুশকিল হচ্ছে।'

'কেন কাকা?' নিকুঞ্জবাবু ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'সেদিন সকালে গীতার একটা শ্লোক আওড়াচ্ছিলাম, ও ব্যাটা আমার ভুল ধরে দিলে। ভুল যদি হয়েই থাকে, সেটা সংশোধন করা কি চাকরের কাজ? ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি? ইচ্ছা করছিল ওর গালে একটা থাপ্পড় মেরে দিই, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম।'

'ওই থাপ্পড়টা কখনো মারবেন না কাকা—ওতে ফল খুব গুরুতর হতে পারে। ওর ওপর হাত তোলা একেবারে বারণ। আপনি তার চেয়ে বরং ও কাছাকাছি থাকলে গীতা-টিতা আওড়াবেন না। সবচেয়ে ভাল হয় একেবারে চুপ থাকলে।'

নিবারণবাবু গজগজ করতে লাগলেন।

এদিকে নিকুঞ্জবাবুর অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। অনুকূলের জন্য মাসে দু' হাজার করে দিতে এখন ওঁর বেশ কষ্টই হচ্ছে। একদিন অনুকূলকে ডেকে কথাটা বলেই ফেললেন।

'অনুকূল, আমার ব্যবসায় বড় মন্দা চলেছে।'

'সে আমি জানি।'

'তা ত জানো, কিন্তু তোমাকে আমি আর কদ্দিন রাখতে পারব জানি না। অথচ তোমার উপর আমার একটা মায়া পড়ে গেছে।'

'আমাকে একটু ভাবতে দিন এই নিয়ে।'

'কী নিয়ে?'

'আপনার অবস্থার যদি কিছু উন্নতি করা যায়।'

'সে কি তুমি ভেবে কিছু করতে পারবে? ব্যবসাটা তো আর তোমার লাইনের ব্যাপার নয়।'

'তবু দেখি না ভেবে কিছু করা যায় কি না।'

'তা দেখ। কিন্তু সেরকম বুঝলে তোমাকে আবার ফেরত দিয়ে আসতে হবে। এই কথাটা তোমাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখলাম।'

'যে আজ্ঞে।'

দু'মাস কেটে গেল। আজ আষাঢ় মাসের রবিবার। নিকুঞ্জবাবু বুঝতে পারছেন, টেনেটুনে আর দুটো মাস তিনি অনুকূলের ভাড়া দিতে পারবেন। তারপর তাঁকে মানুষ চাকরের খোঁজ করতে হবে। সত্যি বলতে কি; খোঁজ তিনি এখনই আরম্ভ করে দিয়েছেন। ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল লাগছে না। তার উপর আবার সকাল থেকে বৃষ্টি, তাই মেজাজ আরো খারাপ।

খবরের কাগজটা পাশে রেখে অনুকূলকে ডাকতে যাবেন এক পেয়ালা চায়ের জন্য, এমন সময় অনুকূল নিজেই এসে হাজির।

'কী অনুকূল, কী ব্যাপার?'

'আজ্ঞে, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।'

'কী হল?'

'নিবারণবাবু জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা বর্ষার গান করছিলেন, এমন সময় কথার ভুল করে ফেলেন। আমি ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলাম, বাধ্য হয়ে ওঁকে সংশোধন করতে হয়। তাতে উনি আমার উপর খেপে গিয়ে আমাকে একটা চড় মারেন। ফলে আমাকে প্রতিশোধ নিতে হয়।'

'প্রতিশোধ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা হাইভোল্টেজ শক্ ওঁকে দিতে হয় ওঁর নাভিতে।'

'তার মানে—?'

'উনি আর বেঁচে নেই। অবিশ্যি যেই সময় আমি শক্‌টা দিই, সেই সময় কাছেই একটা জোরে বাজ পড়েছিল।'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছিলাম।'

'কাজেই মৃত্যুর আসল কারণটা কী, সেটা আপনার বলার দরকার নেই।'

'কিন্তু—'

'আপনি চিন্তা করবেন না। এতে আপনার মঙ্গলই হবে।'

আর হলও তাই। এই ঘটনার দু'দিন পরেই উকিল ভাস্কর বোস নিকুঞ্জবাবুকে ফোন করে জানালেন যে, নিবারণবাবু তাঁর সম্পত্তি উইল করে রেখে গিয়েছেন তাঁর ভাইপোর নামে। সম্পত্তির পরিমাণ হল সাড়ে এগারো লক্ষ টাকা।

ছবি : সমীর সরকার

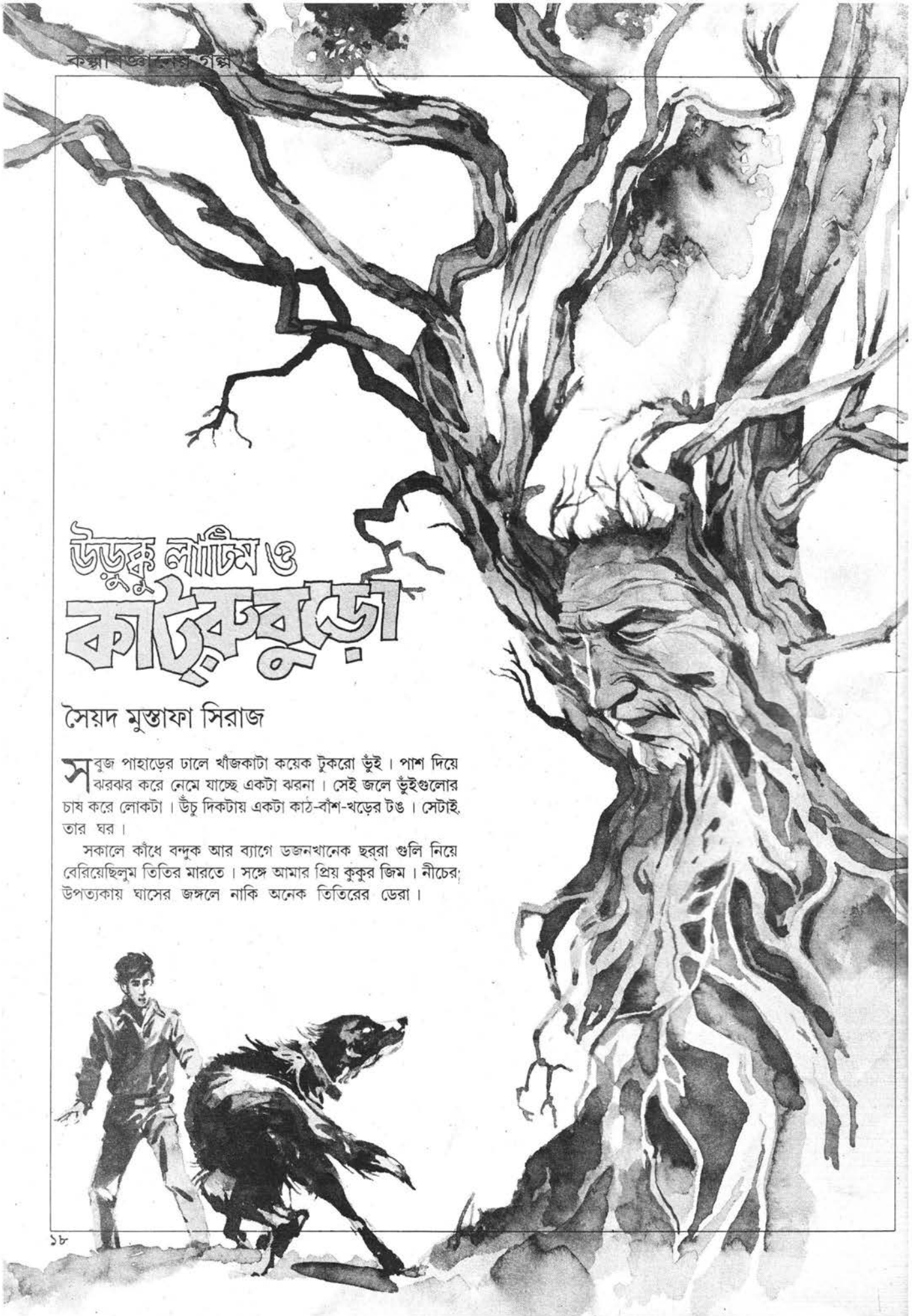

উড়ুক্কু লাটিম ও কাঠবুড়ো

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবুজ পাহাড়ের ঢালে খাঁজকাটা কয়েক টুকরো ভুঁই। পাশ দিয়ে ঝরঝর করে নেমে যাচ্ছে একটা ঝরনা। সেই জলে ভুঁইগুলোর চাষ করে লোকটা। উঁচু দিকটায় একটা কাঠ-বাঁশ-খড়ের টঙ। সেটাই তার ঘর।

সকালে কাঁধে বন্দুক আর ব্যাগে ডজনখানেক ছর্‌রা গুলি নিয়ে বেরিয়েছিলুম তিতির মারতে। সঙ্গে আমার প্রিয় কুকুর জিম। নীচের উপত্যকায় ঘাসের জঙ্গলে নাকি অনেক তিতিরের ডেরা।

ঝরনার ধারে যেতেই লোকটার সঙ্গে দেখা। মাথায় সাধুবাবাদের মতো চুড়োবাঁধা প্রচণ্ড সাদা চুল আর তেমনি দাড়ি। খালি গা, খালি পা, পরনে একফালি ন্যাতার মতো কাপড় জড়ানো। হাতে খুরপি। ঝুপসি জামুনগাছের তলায় দাঁড়িয়ে **তাকে** একটা সিগারেট দিলুম। নিজে একটা ধরিয়ে নিলুম। তারপর তিতিরের খবর জানতে চাইলুম। তখন সে ভাঙা-ভাঙা হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে একটা অদ্ভুত গপ্প শোনাল।

নীচের সমতল উপত্যকায় দিব্যি চাষ করা যেত। কিন্তু এই যে সে পাহাড়ের গায়ে উঠে এসে ভুঁই করেছে কেন, সেটা আমার জানা উচিত, বিশেষ করে আমি যখন নীচের ঘাসের জঙ্গলে তিতির মারতে যাচ্ছি। বছর কয়েক আগে ওই ঘাসজমি ছিল তার চাষের ভুঁই। ফসল ফলত অঢেল। ঝরনাটা ওখানে নদী হয়েছে। সেই নদীর চড়ায় এক রাত্তিরে স্পষ্ট দেখল কী, একটা পেল্লায় লাটিমের মতো আজগুবি জিনিস আকাশ থেকে নেমে এল। বনবন করে সেটা ঘুরছিল। ঘুলঘুলির মতো ফোকর ছিল লাটিমটার চারদিকে। আর সেখান দিয়ে ঠিকরে পড়ছিল রঙ-বেরঙের আলো। কিছুক্ষণ তুলকালাম ঝড় বইছিল। অথচ আকাশ ফাঁকা। ঝলমলে তারা জ্বলছে। ঝড়টা থামলে লাটিমটার ঘুরপাক থামল, অথবা লাটিমটার ঘুরপাক থামলে ঝড়টা থামল। তখন সাহস করে লোকটা টঙ থেকে নেমে নদীর ধারে গেল ব্যাপারটা জানতে। সেইসময় লাটিমের ফোকর থেকে দুটো বেঁটে, পেটমোটা, কালো দু'ঠেঙে প্রাণী বেরোল। তারপর সটান তার কাছে চলে এল। নদীতে তখন জল্প ছিল না। **তারা তার কাছ-বরাবর এল। তারপর যা বলল, তা হচ্ছে,** কে-ক্কে-ক্কে-ক্কে···কি-ক্কি-ক্কি-ক্কি···ডা-ড্ডা-ড্ডা-ড্ডা···ডি-ড্ডি-ড্ডি-ড্ডি···

"বলো কী! তা, তুমি কী বললে?"

"আমি কী বলব?" লোকটা একটু হাসল, "আমি তো ভয়ে কাঠ। মুখে কথাটি নেই। ওরা একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। লাটিমটার ফোকর গলিয়ে ঢুকে পড়ল। তখন আবার সেটা বনবন করে ঘুরতে লাগল। ফোকর দিয়ে তেমনি রঙ-বেরঙের আলো ঠিকরে পড়তে থাকল, তারপর ফের শনশন করে দারুণ ঝড়। লাটিমটা মাটিছাড়া হয়ে চোখের পলকে উড়ে **আকাশের** তারার সঙ্গে মিশে গেল। ঝড়টাও থেমে গেল।"

লোকটা একা এই পাহাড়-জঙ্গলে থাকে। সে যে গপ্পটা বলল, তা নিশ্চয় 'ইউফো' বলতে যা বোঝায়, **তা-ই**। এরকম একটা নিরক্ষর লোক, যে জীবনে কখনও শহরে গেছে কি না সন্দেহ, তার মুখে ইউফো-বৃত্তান্ত শুনে আমি তো তাজ্জব। লোকটা আমাকে পইপই করে নীচের উপত্যকায় যেতে বারণ করে চলে গেল। জিম ঝরনার ধারে একটা পাথরে বসে নিশ্চয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিল, এমন তার ভঙ্গি। ডাকলুম, "জিম, চলে আয়।"

জিম যেন একটু বিরক্ত হয়েই আমার সঙ্গ ধরল। সেই লোকটা তার চাষের ভুঁইয়ে বসে লক্ষ করছিল, আমি কী করি। না, তাকে খুশি করার জন্য নয়, কিংবা ভয় পেয়েও নয়। আমি বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের কাছে ফিরে যাচ্ছিলুম। ওপাশে নিচু টিলার গায়ে তাঁর বাড়ি। সে বড় অদ্ভুত বাড়ি। যেন কিউবিক চিত্রকলা। টিলাটা ঘন সবুজ। তার গায়ে ওই বাড়িটায় রঙ-বেরঙের ত্রিভুজের জটিলতা। বাইরের লোকের পক্ষে দরজা খুঁজে পাওয়া কঠিন। তা ছাড়া আরও ব্যাপার আছে। দরজা জানা থাকলেই হল না, সেখানে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে হবে। তা হল, 'হিং টিং ছট!' অমনি দরজা খুলবে।

সেই আলিবাবা ও চল্লিশ চোর গপ্পের 'চিচিং ফাঁকে'র মতো আর কি। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত রসিক মানুষ। সেটা কোনও কথা নয়। ওঁর কিছু গোপন কাজকর্মের ব্যাপার আছে। বহু বছর ধরে এই নির্জন জঙ্গুলে এলাকায় বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনও গ্যালাক্সিতে কোথাও সভ্য প্রাণী আছে কি না ঢুঁড়ে-ঢুঁড়ে হন্যে হচ্ছেন। কাজেই তাঁকে এই লাটিম-ইউফোর ঘটনাটি বলা দরকার।

জটিল জ্যামিতিক আঁকিবুকির মতো বাড়িটার দরজার সামনে গিয়ে বললুম, "হিং টিং ছট!" অমনি দরজা খুলে গেল। আমরা ঢুকলে বন্ধ হয়েও গেল। বিজ্ঞানী **চন্দ্রকান্তকে** খুঁজে পেলুম ওঁর ল্যাবরেটরিতে। আমাদের দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন, "এত শিগগির ফিরে এলেন যে! পেলেন তিতির?"

বললুম, "একটা খবর আছে। ঝরনার ধারে একটা লোক ইউফো দেখার গপ্প বলল। তাই শুনে····"

কথা কেড়ে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত বললেন, "কাটরু তো? ও একটা ধড়িবাজ। উড়ুক্কু লাটিমের গপ্প ও এ-পর্যন্ত অসংখ্য শিকারিকে বলেছে। আসলে ও চায় না, উপত্যকায় কেউ পাখি মারুক। পাখি মারা ওর পছন্দ নয়। আপনি লক্ষ করেননি, পাখিগুলো ওকে ভয় পায় না। ওর কাঁধে বা মাথায় বসে থাকে।"

"কিন্তু ইউফো ব্যাপারটা ওর মতো লোকের কল্পনা করা তো অসম্ভব। ও যে বর্ণনা দিল, তার সঙ্গে অনেক বিলিতি সায়েন্স-ফিকশনে পড়া মহাকাশযানের আশ্চর্য মিল।"

কথাটা বলে আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালুম।

বিজ্ঞানী **চন্দ্রকান্ত** একটা কম্পিউটারের সামনে বসে কয়েকটা বোতাম টেপাটিপি করতে করতে বললেন, "আপনি নিশ্চিন্তে তিতির মারতে যান। শুধু একটা বিষয়ে সাবধান। সেবারকার মতো মহাজাগতিক কালো-ঘুড়ির পাল্লায় পড়বেন না। আর জিমকে সঙ্গ-ছাড়া করবেন না। ওকে সেবার অনেক কষ্টে উদ্ধার করেছিলুম, মনে আছে তো?"

মনে পড়ে গেল। সে অবশ্য আলাদা গপ্প। একই মফস্বল শহরের বাসিন্দা ছিলুম আমি ও বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত। খেলার মাঠে অবেলায় পড়ে-থাকা একটা কালো-ঘুড়ির ভেতর জিম অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ঘুড়িটা নাকি এক ধরনের খুদে 'ব্ল্যাক হোল'। কোনও দূরের গ্যালাক্সি থেকে উড়ে এসেছিল। **শব্দ** যেমন রেকর্ড করা যায়, তেমনি জীবজন্তু ওর পাল্লায় পড়লে রেকর্ড হয়ে যায়। কী জটিল সমস্যা! রেকর্ড থেকে শব্দ উদ্ধারের মতো তখন তাদের উদ্ধার করতে হয়। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত না থাকলে জিমকে আমি ফিরেই পেতুম না।

সেই ঝরনার ধার দিয়ে ফের যেতে যেতে কাটরুবুড়োকে খুঁজলুম। দেখতে পেলুম না। হয়তো টঙে উঠে ছাতুটাতু খাচ্ছে।

জিম খুব উৎসাহী। একটু এগোলেই ধমক দিচ্ছিলুম। বলছিলুম, "সাবধান জিম! ব্ল্যাক হোল কী সাঙ্ঘাতিক জিনিস, ভুলে যেও না। একটি বিশাল গ্যালাক্সি কোটি-কোটি বছর বিকিরণ ঘটাতে ঘটাতে যখন ফতুর হয়ে যায়, তখন তার ঘনত্ব বাড়তে বাড়তে আর গুটিয়ে যেতে যেতে এতটুকুনটি হয়ে পড়ে। তখন কী হয় জানো? তার নাগালে যা কিছু গিয়ে পড়ে, সে একঝিলিক আলো হোক কি উপ-পারমাণবিক কণিকাই হোক, শুষে নেয়। যেন রাক্ষুসে হাঁ। টুপ করে ধরে গিলে খায়। সাবধান!"

সমতলে ঘাসের বনে পৌঁছনো অবধি জিমকে ব্ল্যাকহোল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলুম। সে আমার পায়ের কাছ থেকে যেভাবে মুখ তুলে তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল পুরোটাই বুঝেছে। মাঝে-মাঝে সে আমার দু'পায়ের ফাঁকে ঢুকে পড়ছিল। হুঁ, ওর মনে পড়েছে সেবারকার সাঙ্ঘাতিক ঘটনাটা।

ঘাসের বনের শিশির সবে শুকিয়েছে। ঘাসফড়িংরা বেরিয়ে এসে

ঘাসের পাতায় বসে রোদ নিতে নিতে কিরকির করে গান গাইছে। প্রজাপতিরা চনমন করে উড়ে বেড়াচ্ছে। এখানে-ওখানে উঁচু গাছপালার জটলা। সেখানে পাখি ডাকছে। অন্য পাখি মারব না। কেনই বা মারব ? তিতিরের মাংস সুস্বাদু। তাই তিতির পেলেই মারব। তিতির থাকে ঘাসের বনে। কখনও আকাশে উড়ে ডাকতে থাকে ট্রি ট্রি ট্রি···ট্রি ট্রি···ট্রি···

কিন্তু কোথায় তিতির ? পায়ের শব্দ পেলেই গুঁড়ি মেরে দৌড়নো অভ্যাস আছে ওদের। তাই খুব নজর রেখে এগোচ্ছি। ঘাসের ভেতর কালো-কালো পাথর ছড়ানো। তারপর সামনে পড়ল নদী। সেই ঝরনাটা এখানে ছোট্ট নদীটি হয়ে পাথর আর বালির চড়ার ফাঁক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। জিমকে কাঁধে তুলে পাথরে পা রেখে-রেখে নদী ডিঙিয়ে গেলুম। তারপর ওপারে ঘাসের বনে পৌঁছতেই কাটুরুবুড়োর মুখোমুখি।

সে নিষ্পলক চোখে আমাকে দেখছিল। বলল, "তো আপ মেরা মানা না শুনা ?"

বললুম, "কাটুরু, তুমি যাই বলো, অন্তত একটা তিতির আমি মারবই।"

"ঠিক হ্যায়। মারিয়ে।" বলে সে হাততালি দিয়ে মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করতে থাকল। তারপর যা দেখলুম, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না।

একটা দুটো করে তিতিরের একটা ঝাঁক বেরিয়ে এল ঘাসের বন থেকে। ওর মাথায়, কাঁধে, কোমরে, পায়ের নীচে তিতির আর তিতির। জিম অনবরত মুখ ভেঙাতে থাকল ওদের। তারপর একসঙ্গে অতগুলো তিতিরের ডাক ট্রি ট্রি ট্রি···ট্রি ট্রি ট্রি···আমার কান ঝালাপালা একেবারে।

কাটুরু বাঁকা হেসে বলল, "কী হল ? বন্দুক ছুঁড়ুন !"

শরৎকালের উজ্জ্বল রোদে এই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটছে আমার সামনে বড়জোর মিটার দশ-বারো দূরে। কাটুরুকে দেখাচ্ছে এই জঙ্গলেরই একটা গাছ, নাকি খুব পুরনো, আদিম আর রহস্যেভরা পৃথিবীর কোনও আজব দু'ঠেঙে প্রাণী ! তারপর যেন তার মুখেও তিতিরের ডাক শুনতে পেলুম ট্রি ট্রি ট্রি···ট্রি ট্রি ট্রি···ট্রি ট্রি ট্রি···ট্রি ট্রি ট্রি···

সাহস উবে গেল। জিমকে কাঁধে তুলে নিয়েই অ্যাবাউট টার্ন করে নদী পেরিয়ে দৌড় দৌড় দৌড়।

ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে দেখলুম বিড়বিড় করে কী আওড়াচ্ছেন, আর চুল খামচে ধরে চোখ বুজে নাক কুঁচকে ফেলছেন। আমার ও জিমের দিকে লক্ষই নেই। কান করে শুনি, কী অবাক ! বিজ্ঞানীপ্রবর আওড়াচ্ছেন, "কে-ক্কে-ক্কে-ক্কে··· কি-ক্কি-ক্কি-ক্কি-ক্কি-ক্কি-ক্কি··· ডা-ড্ডা-ড্ডা- ড্ডা-ড্ডা··· ডি-ড্ডি-ড্ডি- ড্ডি-ড্ডি···"

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়লুম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "ওঃ !"

চন্দ্রকান্ত ঘুরলেন। বললেন, "ট্রি-ট্রি-ট্রি- ট্রি-ট্রি ?"

"হ্যাঁঃ !"

"কাটুরু ?"

"হুঁঃ !"

চন্দ্রকান্ত উঠে এলেন আমার কাছে। ওঁকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। চাপা স্বরে বললেন, "কাটুরু সম্পর্কে আমার ধারণা বদলাতে বাধ্য হয়েছি। একবছর এখানে এসেছি। অথচ ওর সম্পর্কে কিছু তলিয়ে ভাবিনি। লাটিমের গল্পটা ও আমাকেও বলেছিল। তো কিছুক্ষণ আগে আপনি ফের ওর গল্পটা বলে যাওয়ার পর ফোনেটিক ডি-কোডিং যন্ত্রটার সামনে বসলুম। আমাদের এই গ্যালাক্সিতে যতরকমের শব্দ হওয়া সম্ভব, তার মানে শব্দতরঙ্গের **হ্রস্বতম** থেকে দীর্ঘতম স্তর অব্দি, ওই এফ-ডিতে ফিড করিয়ে সংশ্লেষণের মাধ্যমে উৎস নির্ণয় করা যায়।"

মাথা আরও ঝিমঝিম করতে লাগল কথাটা শুনে। বন্দুকটা পাশে দাঁড় করানো, জিম আমার উরুর ওপর। বেচারা তখনও কাঁপছে। বললুম, "কাটুরু আমার ঘিলু উপড়ে নিয়েছে চন্দ্রকান্তবাবু। মুণ্ডুটি শুকনো লাউ-এর খোল। ট্রিং ট্রিং ট্রিং বাজনা ছাড়া আর কিছু নেই। আস্ত একতারা বানিয়ে দিয়েছে আমাকে।"

বিজ্ঞানী বললেন, "ট্রি-ট্রি-ট্রিতে যাচ্ছি। কে-ক্কে-ক্কে থেকে শুরু করা যাক। এফ-ডি থেকে কী বেরোল জানেন ? দেখাচ্ছি।" বলে একটা কম্পিউটার থেকে জিভের মতো বেরিয়ে থাকা লম্বাটে কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে এলেন। গ্রাফের ছক কাটা কাগজটাতে লাল একটা আঁকাবাঁকা রেখা। "কিছু বুঝলেন ?" চন্দ্রকান্ত মিটিমিটি হেসে প্রশ্ন করলেন।

মাথা নেড়ে বললুম, "নাঃ, জ্যামিতি আমার মাথায় ঢোকে না।"

"জ্যামিতি নয়, অঙ্ক।"

"অঙ্কে স্কুলে বরাবর গোল্লা পেতুম।"

চন্দ্রকান্ত হতাশ মুখে বললেন, "তা হলে তো মুশকিল। যাই হোক, উড়ুক্কু লাটিমটা যে আমাদের গ্যালাক্সির, তাতে আমি নিঃসন্দেহ। আর ওই কাটুরু সম্পর্কে আমার ধারণাও বদলানো দরকার। কাটুরু··· ক-আ-ট-র-উ··· কে-এ-টি-আর-ইউ ···কা-ক্কা-ক্কা··· ট-ট্ট-ট্ট··· রু-রু-রু···"

বিড়বিড় করতে করতে বিজ্ঞানী উঠে দাঁড়ালেন। আবার গিয়ে বসলেন সেই এফ-ডি যন্ত্রটার সামনে। খটাখট বোতাম টিপতে থাকলেন। টিভির মতো ছোট্ট চৌকো কাচের পর্দায় লাল-নীল-সবুজ রঙের ফুটকি আর তরঙ্গরেখা ফুটে উঠল। মিলিয়ে গেল। আবার ফুটে উঠল, আবার মিলিয়ে গেল। তারপর আচমকা উঠে বেরিয়ে গেলেন চন্দ্রকান্ত। আমি তো থ।

কিন্তু জিমের সবটাতেই নাক গলানো চাই। সে আমার উরুর ওপর থেকে তুড়ুক করে লাফ দিয়ে চন্দ্রকান্তের পিছনে দৌড়ল। "জিম, জিম, ব্ল্যাক হোল !" ওকে ভয় দেখাতে দেখাতে আমিও পা বাড়ালুম। কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই জিম বন্ধ দরজায় আঁচড় কাটছে। হাসতে হাসতে বললুম, "কী ? বেরো এবারে। বুদ্ধু কোথাকার ! বল দরজা খোলার মন্তর ! পারবি বলতে হিং টিং, ছট ?"

এই রে ! কেলেঙ্কারি করে ফেললুম তো। সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে গেল। আর জিমও একলাফে বাইরে।

বাইরে গিয়ে জিমকে দেখতে পেলুম না। ডাকতে থাকলুম, "জিম, জিম, জিম !" সাড়া না পেয়ে ভয় হল। জিমটা যে বরাবর বড্ড বোকা ! চারদিকে ছোট ও বড় সবুজ পাহাড়, মধ্যিখানে উপত্যকা। কাটুরুবুড়োর টঙটা দেখা যাচ্ছিল। একটু পরে দেখি, সেখান থেকে কাঠের মই বেয়ে নেমে আসছেন বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত। ওঁকে দেখে ঢাল বেয়ে ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে হন্তদন্ত এগিয়ে গেলুম। কাটুরুর চাষের জমিতে পৌঁছলে চন্দ্রকান্ত আমাকে দেখে একটু হাসলেন। হন্তদন্ত বললুম, "জিমকে দেখেছেন ?"

চন্দ্রকান্ত এ-কথায় কানই দিলেন না। বললেন, "ঠিকই ধরেছি। কাটুরুর জমিতে এই সবুজ উদ্ভিদগুলো লক্ষ করুন। আমরা ফসল

বলতে যা বুঝি, এগুলো মোটেও তা নয়। ধান নয়, গম নয়, বাজরা নয়, ভুট্টা নয়, অড়হর নয়—তার মনে পাহাড়ি মাটিতে যা ফলে, তার কোনওটাই নয়। অথচ এগুলো ফসলই।" বলে উনি ঘাসের মতো দেখতে একটা গুছি থেকে **শিষ** ছিঁড়ে নিলেন। তারপর আপনমনে খিকখিক করে হেসে উঠলেন।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিমকে খুঁজতে খুঁজতে আনমনে বললুম, "হাসছেন কেন?"

"ভুল হয়ে গেছে। আসলে এগুলোকে বলে কাংনিদানা। পাখিকে খাওয়ানো হয়। এ আপনি শহরের পশুপাখির খাদ্যভাণ্ডারে পেয়ে যাবেন।" **চন্দ্রকান্ত** শিষটা ফেলে দিয়ে পা বাড়ালেন। "চলুন, ফেরা যাক। কাট্‌রু আমাকে ভয় পায়। তাই গা-ঢাকা দিয়েছে। কী হল? আসুন।"

"জিম আপনার পেছন-পেছন এসেছে। তাকে দেখতে পাচ্ছি না।"

চন্দ্রকান্ত গলায় ঝোলানো বাইনোকুলারে চোখ রেখে জিমকে খুঁজতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, "মাই গুডনেস! কী অবাক, কী অবাক! আসুন তো দেখি।"

ওঁকে অনুসরণ করে সেই ঝরনার ধারে গেলুম। সত্যি অবাক হওয়ার মতো দৃশ্য। জামুনগাছটার তলায় কাট্‌রুবুড়ো বসে আছে। তার কাঁধে হতচ্ছাড়া জিম, যেন নিঃশব্দে হেসে অস্থির হচ্ছে। একপাল ধেড়ে ও বাচ্চা হরিণ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর পাখি। রঙ-বেরঙের সবরকম পাখি এসে জড়ো হয়েছে জামুনগাছে, তলার ন্যাড়া মাটিতে, কাটরুর চারপাশেও, এমনকী জিমের কাঁধেও একটা কাঠঠোকরা!

কিন্তু সব্বাই চুপ, সব্বাই। চুপ আর নিথর। যেন ছবি। একটু দূরে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম। চন্দ্রকান্ত আমার কাঁধ ধরে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসলেন। ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে থাকলুম সেই আশ্চর্য দৃশ্য। একটু পরে হঠাৎ দেখি, কাট্‌রু যেন কাট্‌রু নয়, প্রাচীন যুগের এক মুনিঋষি—না, তাও নয়। আমারই চোখের ভুল। ও এই জঙ্গলেরই একরকম গাছ। ওর গায়ের খসখসে রুক্ষ চামড়া আস্ত বাকল, ওর পা দুটো শেকড়, হাত দুটো ডাল, আর আঙুলগুলো চিরোল পাতা। ওর চুড়োবাঁধা চুল একরাশ সাদা ফুল। আর···

চন্দ্রকান্তের চিমটি খেয়ে চমকে উঠলুম। ঝরনার পাথর ডিঙিয়ে একটা চিতাবাঘ আসছে। সর্বনাশ! কুকুর চিতার প্রিয় খাদ্য। জিম, বুদ্ধু গবেট হাঁদারাম! যেন চিতাটাকে 'ওয়েলকাম' বলার মতো হাঁ করেছে। চিতাটা এসে হরিণের পালের একটু তফাতে পেছনের দু'ঠ্যাঙ মুড়ে বসে একটা প্রকাণ্ড হাই তুলল। কী সাঙ্ঘাতিক দাঁত!

তারপর দেখতে দেখতে এসে জুটল একদঙ্গল কাঠবেড়ালি, খরগোশ, গন্ধগোকুল, বেজি। এমনকী ঝরনার জল থেকে উঠে এল কয়েকটা কোলাব্যাঙ, একজোড়া ভোঁদড়।

তারপর যা দেখলুম, ভয়ে কাঠ। একটা শঙ্খচূড় সাপ এসে একমিটার উঁচু হয়ে চক্কর তুলল।

আর মাথা ঠিক রাখা গেল না। বন্দুকে ছররা গুলি পোরা ছিল। চন্দ্রকান্ত বাধা দেবার আগেই বন্দুক তুলে হ্যামার টেনে ট্রিগারে চাপ দিলুম। লক্ষ ছিল সাপটার চক্কর। **চন্দ্রকান্তের** ধাক্কায় নলটা গেল উঠে। কিন্তু সামান্য ছররা গুলির যা আওয়াজ হল, আরও অবিশ্বাস্য! চারদিকের পাহাড়ে তুমুল প্রতিধ্বনি উঠল। সেকেণ্ডে তুলকালাম অবস্থা। চিতাটা লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল। হরিণ, খরগোশ, গন্ধগোকুল, ভোঁদড় নিমেষে উধাও। কোলাব্যাঙগুলো ঝরনায় ঝাঁপ দিল। আর পাখপাখালি চ্যাঁচামেচি করতে করতে ঝাঁক বেঁধে উড়ে পালাল। শুধু শঙ্খচূড় সাপটা পালিয়ে গেল না। তেড়ে এল আমাদের ঝোপের দিকে। সেই সময় একপলকের জন্য কাট্‌রুকে দেখলুম উঠে দাঁড়িয়েছে। দুটো চোখে নীল আগুন। ও চোখ মানুষের নয়, আমাদের ঝোপটার দিকে দৃষ্টি। তার কাঁধ আঁকড়ে বিশ্বাসঘাতক জিম! সে ঘেউ-ঘেউ করে আমাকেই ধমক দিচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চললেন। রোগাটে গড়ন হলে কী হবে, অসম্ভব জোর তো ওঁর শরীরে! খাপ্পা হয়ে বললুম, "সাপটাকে মারতে দিন। তাড়া করে আসছে যে!"

চন্দ্রকান্ত হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "ছেড়ে দিন! সব বুঝতে পেরেছি। এভরিথিং ক্লিয়ার!" বলে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে ঢাল বেয়ে দৌড়ে চললেন।

জিমের জন্য মনখারাপ। ল্যাবরেটরির পাশে বেডরুমে শুয়ে আছি। ভীষণ ক্লান্তও বটে। ঝরনার ধারে জামুনতলার দৃশ্যটা চোখে ভেসে আসছে। অবাক হতে গিয়ে জিমের জন্য রেগে যাচ্ছি। শুধু একটাই আশা, ওই সবতাতে-নাক-গলানো স্বভাবের খুদে বুদ্ধুটাকে সেবারকার মতো এবারও বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত উদ্ধার করতে পারবেন।

ল্যাবরেটরি থেকে এসে গেলেন বিজ্ঞানীপ্রবর। মুখে মিটিমিটি হাসি। "ভাববেন না। বাড়ির চারধারে লেসার-রশ্মির বেড়াজাল ঘিরে দিয়ে এলুম। সাপ কেন, পোকামাকড়ও দেওয়াল ছুঁলে ছাই হয়ে যাবে।" বলে ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন।

চমকে উঠে বললুম, "সর্বনাশ! জিম ফিরে এলে যে···"

কথা কেড়ে দুলতে-দুলতে চন্দ্রকান্ত বললেন, "টি-ডি, অর্থাৎ টেলি-ডিটেক্টরে দেখে এলুম আপনার জিম কাট্‌রুর টঙে বসে কাংনিদানা খাচ্ছে।"

"সে কী! কাংনিদানা তো ঘাসের বীজ। জিম ঘাসের বীজ খাচ্ছে?"

"আহা কি স্বপ্নমধুর!"-বলেন শ্রীদেবী,
"লাক্সের নতুন সুগন্ধে আমার মন ভাসে স্বপ্নের জগতে!"

"স্টুডিওর কড়া আলোয় সারাদিন শুটিং-এর পর যখন ঘরে ফিরি, দেহ-মন চায় স্নিগ্ধ আরাম। আর স্নিগ্ধ আরাম আর নতুন সুবাসে ভরে দিতে ও সেইসঙ্গে রূপ-লাবণ্যের যত্ন নিতে লাক্সের আছে কি জুড়ি। লাক্স সত্যিই মনোরম" বলেন শ্রীদেবী।

নতুন
লাক্স– চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান।
হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

HLL-

বিজ্ঞানী **চন্দ্রকান্ত** চোখ বুজে একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "থাক না। ভাল লাগছে বলেই খাচ্ছে। নইলে কি খেত ? তবে ব্যাপারটা হল, কাট্‌রুর পরিচয় আমি অনেক ক্যালকুলেশন করে জানতে পেরেছি। ও একজন নির্বাসিত প্রাণী। আমাদের সৌর-জগতেরই একটা উপগ্রহে ছিল ওর বাড়ি। তাই ওর **চেহারা** মানুষের মতো। একই সোলার সিস্টেমে একই ধরনের প্রাণী জন্মাবে, একই ধারায় বিবর্তন ঘটবে, এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্লুটো নামে একটা গ্রহের কথা তো জানেন ?"

আনমনে বললুম, "হুঁ।"

"প্লুটোর একটামাত্র উপগ্রহ আছে। তার নাম রাখা হয়েছে 'কারন'। CHARON ইংরেজি বানান। শব্দটা এসেছে গ্রিক পুরাণ থেকে। হিন্দু পুরাণে যেমন বৈতরণী নদী, গ্রিকে তেমনি স্টিক্স নদী, মরার পর মানুষকে ওই নদী পার করে পাতালে পৌঁছে দেয় কারন। আক্ষরিক অর্থে খেয়া-মাঝি। বিজ্ঞানীদের মতে, প্লুটোর ওই উপগ্রহ আসলে একটা গ্রহ। প্লুটোর খপ্পরে পড়ে আমাদের চাঁদের দশা হয়েছে। চাঁদকেও তো ইদানীং কেউ-কেউ সেইরকম বন্দী-গ্রহ বলছেন। তবে কারন যে বন্দী-গ্রহ, তার প্রমাণ তার ভর প্লুটোর মাত্র এক দশমাংশ। এদিকে চাঁদের..."

বিরক্ত হয়ে বাধা দিলুম, "জিমকে কীভাবে উদ্ধার করা যাবে, তাই বলুন।"

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। "চলে যান না। কাট্‌রু সম্ভবত অহিংস প্রাণী। গিয়ে বুঝিয়ে বলুন। ক্ষমাটমা চান।"

"কিন্তু শঙ্খচূড় সাপটা হয়তো ওত পেতে আছে।"

বিজ্ঞানীপ্রবর চোখ বুজে কী ভেবে বললেন, "এক মিনিট। আপনাকে আমার লেসার-পিস্তলটা দিচ্ছি। সাবধান, ওটা অটোমেটিক। হ্যামার টানতে হয় না। সাপটা দেখলে ট্রিগারে চাপ দেবেন। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তা ছাড়া দরকার হলে কাট্‌রুকেও থ্রেটন করবেন। কিন্তু সাবধান ! ওকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।"

উঠে দাঁড়ালেন **চন্দ্রকান্ত**। ফের বললেন, "কিছুক্ষণের জন্য বাড়ির লেসার-রশ্মির বেড়াজাল অফ করে রাখছি, আপনি ফিরে না-আসা অব্দি।"

দুঃখের মধ্যে হাসি আসছিল। কাট্‌রু নাকি প্লুটোর উপগ্রহের নির্বাসিত প্রাণী ! দিব্যি ভাঙা হিন্দি-বাংলা বুলি বলতে পারে লোকটা। পশু-পাখি ওকে ভালবাসে, ওর কাছে আসে, এতে আর এমনকী অস্বাভাবিকতা আছে ? নির্জন প্রকৃতিচর মানুষ। পশু-পাখির ক্ষতি করে না। বহু বছর ধরে দেখে দেখে পশু-পাখিরা ওর কাছঘেঁষা হয়েছে। আসলে আমরা নতুন কোনও ঘটনা বা দৃশ্যের সামনে পড়লে মনের চোখ দিয়েই দেখি। যা দেখছি না, তাও দেখি, রঙ চড়িয়ে দেখতে ভালবাসি বলেই।

কাট্‌রু সম্পর্কে এই ব্যাখ্যাটা দাঁড় করালুম মনে-মনে। কিন্তু নজর তীক্ষ্ণ। লেসার-পিস্তল-বাগানো হাত। ফোঁস করলেই ট্রিগারে চাপ দেব। কিন্তু কোথায় বদমাশ শঙ্খচূড়টা ? কাট্‌রুর ভুঁই অব্দি দিব্যি আসা গেল। টঙ নিঝুম খাঁখাঁ। ডাকলুম, "কাট্‌রু, কাট্‌রুখুড়ো !" খুড়ো বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। নাকি হিন্দিতে 'কাটরুমৌসা'—কাটরুমেসো বলে ডাকব ? ঠিক আছে। গলা ঝেড়ে ডাকলুম, "কাটরুমৌসা, তুম কিধার হো ?" সাড়া না পেয়ে ডাকলুম, "জিম, জিম।" তাও সাড়া নেই।

কাঠের মই বেয়ে টঙে উঠে উঁকি মেরে দেখি, ঘাসের তৈরি কুঁড়েঘরটার ভেতর কেউ **নেই**। ঘাসের বিছানা পাতা। ঘাসের বালিশ। **একখানা** পাথরের থালা আর ডেকচি গড়নের পাত্র। থালায় কাংনিদানা পড়ে আছে খানিকটা। ডেকচিতে জল।

এদিকে-ওদিকে খুঁজতে থাকলুম উঁচু টঙের ওপর থেকে। না কাট্‌রু, না জিম। উপত্যকা, চারপাশের ছোটবড় সবুজ পাহাড়, সবখানে নির্জনতা ছমছম করছে। হাওয়া-বাতাস বন্ধ। কিন্তু কী সুন্দর প্রকৃতির এই সাজানো বাগান। দাগড়া-দাগড়া সবুজ রঙের ওপর সাদা হলুদ-লাল ছোপ। ওগুলো ফুল। নদীর দিকটাতে কাশফুল থরেবিথরে সাজানো। তারপর ক্রমশ পোকামাকড়ের ডাক আর পাখির ডাক কানে আসতে লাগল। শিউরে উঠলুম। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি ! প্রকৃতির একটা গোপন **কেন্দ্রে** এসে পড়েছি, যেখানে লক্ষকোটি প্রাণ সাড়া তুলেছে। এত প্রাণ, এত রঙ, এত সুর।

নেমে আসছি টঙ থেকে, তখন আমি যেন অন্য মানুষ। ভাবের ঘোরে উদাসীন। এখন যদি শঙ্খচূড়টা ফোঁস করে তেড়ে আসে, বলব, "লক্ষ্মী ভাইটি আমার। আয়, দুজনে মিতে পাতাই।"

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, আর আমি তিতির মারব না। কোনও পাখিকেই মারব না। জানোয়ার দেখলে বলব, "হ্যাল্লো, ব্রাদার অর সিস্টার ! হাউ ডু য়ু ডু ?"

বিজ্ঞানী **চন্দ্রকান্ত** বাড়ির ছুঁচলো ছাদ থেকে বাইনোকুলারে আমাকে লক্ষ করছিলেন। এবার খুব হাত নেড়ে ডাকতে লাগলেন। ঢাল বেয়ে উঠে বাড়িটার কাছে যেতেই শুনলুম, "আপনার কুকুরটা খুঁজে পেলেন না তো ? পাবেন না। এইমাত্র ক্যালকুলেশন করে দেখলুম, কাট্‌রুর কাঁধে চেপে পশ্চিমপাহাড়ের ওধারে চলে গেছে।"

"জিম যা খুশি করুক। হিং টিং ছট !"

দরজা খুললে ভেতরে গেলুম। একটু পরে ছাদ থেকে **চন্দ্রকান্ত** নেমে এলেন। মুখটা গম্ভীর। বললেন, "গুরুতর ব্যাপার। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আপনি যাওয়ার পর প্লুটোর ওই উপগ্রহের সঙ্গে ট্যাকিওনের সাহায্যে যোগাযোগ করেছিলুম। 'ট্যাকিওন' বোঝেন ? বোঝেন না। একরকম কণিকা, যার গতিবেগ আলোর সমান। সেকেণ্ডে ২৯৯৭৯২·৫ কিলোমিটার। কোনও Mass বা ভর নেই। তো কারন উপগ্রহ থেকে পাল্টা **সংকেত** ধরা পড়ল। কারন পৃথিবীর মতোই ফুল অভ লাইফ। হ্যাঁ, মানুষের মতো দ্বিপদ বুদ্ধিমান প্রাণীও আছে। সংকেত ডি-কোড করে বুঝলুম, ওরা শিগগির রওনা দিচ্ছে। যদি কোনও অঘটন না ঘটে, আজ রাত্তিরেই ওরা এসে পড়বে।"

"আপনি কি ডাকলেন ওদের ?"

"হ্যাঁ।" চাপা স্বরে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত বললেন। "কাট্‌রুকে ওরা ফেরত নিয়ে যাক। বড্ড ঝামেলা করে ও মাঝে-মাঝে। তার চেয়ে বড় কথা, আমি নিরিবিলিতে অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্সের যেসব গোপন পরীক্ষা করছি, অন্য গ্রহ বা উপগ্রহের বাসিন্দা তা টের পাক, এটা আমি চাই না। কে বলতে পারে, ওরা ঈর্ষাকাতর হয়ে আমার এই ল্যাবরেটরি জ্বালিয়ে দেবে না ?" **চন্দ্রকান্ত** অনর্গল বলতে থাকলেন এইসব কথা।

আমার মনে রীতিমত বৈরাগ্যভাব এখন। ইচ্ছে করছে আমিও কাট্‌রু হয়ে যাই। গাছপালার ভেতর, ঘাসের মাঠে, ঝরনার ধারে কাট্‌রুর মতো খালি-গা খালি-পা হয়ে কোমরে একফালি মাত্র কৌপীন জড়িয়ে ঘুরে বেড়াই। জঙ্গল একটুখানি সাফ করে তার মতো কাংনিদানার চাষ করি। পাখিদের জন্য, স্রেফ পাখিদের জন্যই। কারণ, মুঠো মুঠো কাংনিদানা ছড়ালেই ওরা এসে যাবে আমার

এল.আই.সি. সানন্দে— লাভসহিত মেয়াদী আর আজীবন বীমার পলিসির ওপর তার **৩০তম জয়ন্তী বোনাসের** ঘোষণা করছে!

৩১শে মার্চ ১৯৮৬তে কর্পোরেশনের নিজস্ব পরিসম্পৎ আর দেনার **বিশেষ মূল্যাঙ্কনের** ভিত্তিতে ঘোষিত হলো এই বোনাস।

ঘোষিত বোনাসের হার :

আজীবন বীমা পলিসির জন্যে	**টা. ৬৫.০০—প্রতি হাজার টাকার ওপর প্রতি বছরে**
এনডাউমেন্ট পলিসির জন্যে	**টা. ৫২.০০—প্রতি হাজার টাকার ওপর প্রতি বছরে**

৩১শে মার্চ ১৯৮৫তে কর্পোরেশনের পরিসম্পৎ আর দেনার মূল্যাঙ্কনের ভিত্তিতে অতি উচ্চ বোনাস ঘোষণার এক বছরের মধ্যেই আবার এই বোনাসের ঘোষণা!

এই বছরের এই রেকর্ড বোনাস ঘোষণা—কর্পোরেশনের নতুন ব্যবসা বৃদ্ধি, নিজস্ব ধনের মিতব্যয়ী সুপরিচালনা, ফলপ্রসূ খরচ ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা ইত্যাদির দরুণই সম্ভব হয়েছে!

তাছাড়া কর্পোরেশনের বিভিন্ন কার্যবিধি—শাখাগুলি বিকেন্দ্রীভূত করার ফলে সম্ভব হয়েছে সেরা বিক্রয়োত্তর সেবা ব্যবস্থা তথা পলিসিহোল্ডারদের সন্তোষ বৃদ্ধি!

এই রেকর্ড বোনাস এবং সব যোগ্য পলিসি-র ওপর প্রাপ্য আকর্ষণীয় চূড়ান্ত (অতিরিক্ত) বোনাসের দরুণ জীবন বীমা আজ আগের চেয়ে আরো বেশি আকর্ষণীয়!

আপনার ও আপনার পরিবারের অন্যদের জীবন বীমা বৃদ্ধির এইতো সঠিক সময়!

লাইফ ইন্সিওরেন্স
কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া

৩০ বছর ধরে জনগণের সেবায়

daCunha/LIC/200/86 BN

কাছে। আপন হয়ে যাবে। আমাকে ঘিরে কিচিরমিচির করবে। আমিও কিচিরমিচির করব। তিতির হয়ে ডাকব, ট্রি ট্রি ট্রি। ট্রি ট্রি ট্রি! আমার গায়ে-মাথায় তিতিরের ঝাঁক। আর আমি তখন এক 'পাখিবাবা'! কী মজাই না হবে।

চন্দ্রকান্তের ডাকে ঝিমুনি কেটে গেল। "আসুন, লাঞ্চ সেরে নিই। নিরিমিষ কিন্তু! বলেছিলেন তিতিরের মাংস খাওয়াবেন। আপনিই ফেল করেছেন!" বিজ্ঞানীপ্রবরের সঙ্গে ডাইনিং-রুমে ঢুকলুম। প্রচুর খিদে পেয়েছে বটে।

চন্দ্রকান্তের হিসেবে কারন উপগ্রহের স্পেসশিপ পৌঁছবে কাঁটায়-কাঁটায় দশটা বত্রিশ মিনিট একুশ সেকেণ্ডে। আঁধার রাত। হাওয়াবাতাস নেই। উপত্যকার **আকাশে** জ্বলজ্বল করছে লক্ষ কোটি তারা। নদীর ধারে পাথরের আড়ালে দু'জনে ওত পেতে বসে আছি। শঙ্খচূড়টার ভয়ে আমাদের পরনে স্পেসস্যুটের মতো পোশাক। ছোবল দিলে বৈদ্যুতিক শক খাবে নিজেই। **চন্দ্রকান্ত** হাতে একটা টর্চের সাইজ যন্ত্র নিয়ে বসে আছেন। আমাকে নজর রাখতে বলেছেন আকাশে। হাতঘড়িতে দশটা বত্রিশের ঘরে রেডিয়াম-কাঁটা। সেই সময় একবার ঘুরে কাট্‌রুর টঙের দিকটা দেখে নিলুম। টঙের সামনে খুঁটিতে লণ্ঠন জ্বলছে। কারন থেকে যারা আসছে, তারা কাট্‌রুকে ধরে নিয়ে যাবে। তখন জিমকে উদ্ধার করা সহজ হবে তো? জিমকে সুদ্ধু ধরে নিয়ে গেলে কেলেঙ্কারি!

আবার আকাশের দিকে তাকালুম। হঠাৎ দেখি একটা তারা ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। বড় হতে হতে সেটা নেমে আসছে। এইসময় শনশন করে বাতাস উঠল। বাতাসটা বাড়তে লাগল। বাড়তে বাড়তে তুলকালাম ঝড়। এমন ঝড় যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে সবকিছু। আমরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম দু'জনে। সেই প্রকাণ্ড তারাটা এবার লাল-নীল-হলুদ-সবুজ-বেগুনি রঙ বদলাতে বদলাতে ঠিক আমাদের মাথার ওপর এসে স্থির হল এক সেকেণ্ডের জন্য। তারপর সামনের বালির চড়ায় বালি উড়িয়ে নামল। বনবন করে ঘুরতে থাকল। কাট্‌রু যা বলেছিল, ঠিক তেমনটি। প্রকাণ্ড লাটিম। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, ওটা বাইরের কিছুকে আলোকিত করছে না। অথচ প্লেনের জানালার মতো টুকরো-টুকরো ফোকর দিয়ে রঙ-বেরঙের আলো বেরোচ্ছে। চক্কর থামার পর একটা ফোকর দিয়ে দুটো কালো নাদুসনুদুস বেঁটে পুতুল গড়নের প্রাণী বেরোল। কাট্‌রুর বর্ণনায় একটুও গণ্ডগোল নেই দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানী **চন্দ্রকান্তকে** উঠতে দেখে আমিও উঠে দাঁড়ালুম। আর দু'ঠেঙে প্রাণীদুটো এসে ধাতব কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, "কে-ক্কে-ক্কে-ক্কে··· কি-ক্কি-ক্কি- ক্কি-ক্কি···· ডা-ড্ডা-ড্ডা-ড্ডা··· ডি-ড্ডি-ড্ডি-ড্ডি!"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "কা-ক্কা-ক্কা-ক্কা···· ট-ট্ট-ট্ট-ট্ট··· রু-রু-রু-রু-রু!"

প্রাণী দুটো আঁধারে রঙ-বেরঙের আলোর পুতুলের মতো কাট্‌রুর টঙ লক্ষ করে উড়ে গেল। **চন্দ্রকান্ত** বললেন, "ওদের স্পেসশিপটা একটু দেখে আসা যাক।"

চন্দ্রকান্ত যখন উড়ুক্কু লাটিমটার কাছে, তখন টঙের দিক থেকে জিমের গলা শুনতে পেলুম। প্রচণ্ড ধমক দিচ্ছে। হাঁদারামকে ধরে নিয়ে যাবে ভেবে অস্বস্তি হচ্ছিল। হঠাৎ সেইসময় সেই প্রাণী দুটো সুড়ুত করে ভেসে নদীর ওপর দিয়ে উড়ুক্কু লাটিমের কাছে ফিরে এল। চন্দ্রকান্ত 'কি-ক্কি-ক্কি' করে উঠলেন। ওরা কোনও জবাব না দিয়ে ফোকর গলিয়ে লাটিমে ঢুকল। অমনি বনবন করে সেটা ঘুরতে লাগল। আবার সেই ঝড়। আবার শুয়ে পড়লুম। উড়ুক্কু লাটিমটা বোঁও করে আকাশে উঠে ছোট হতে হতে নিমেষে তারার সঙ্গে মিশে গেল। ঝড় থামলে **চন্দ্রকান্তের** কাতর ডাক শুনলুম, "হেল্প্ মি। জলে পড়ে গেছি।"

জলে স্পেসস্যুট-পরা বিজ্ঞানীপ্রবরের অবস্থা করুণ। টেনেটুনে ওঠালুম। বললেন, "ওরা অমন করে পালিয়ে গেল কেন বলুন তো?"

টঙের দিক থেকে জিমের গলা ভেসে আসছে। সমানে ধমক দিচ্ছে এখনও। হুঁ, উদ্ভুট্টে প্রাণী দুটোর পড়ি-কি-মরি করে পালানোর রহস্য বোঝা গেল। পা বাড়িয়ে বললুম, "আমার ধারণা, কারন-উপগ্রহে কুকুর নেই।"

চন্দ্রকান্ত ব্যস্তভাবে বললেন, "ক্যালকুলেশন করতে হবে। চলুন শিগগির!"

কী ভেবে টঙের কাছাকাছি গিয়ে ডাকলুম, "কাট্‌রুমৌসা, কাট্‌রুমৌসা!"

চন্দ্রকান্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "আঃ! করছেন কী? ও সব টের পেয়ে গেছে। এখন আমাদের নাম্বার ওয়ান এনিমি!"

ওঁকে গ্রাহ্য না করে টঙের দিকে চললুম। বিজ্ঞানী খাপ্পা হয়ে চলে গেলেন। টঙের নীচে দাঁড়িয়ে আবার ডাকলুম, "কাট্‌রুমৌসা, ঘাট মানছি। আর কখনও বন্দুক ছুঁড়ব না। জিমকে ফেরত দাও।"

কাট্‌রুর সাড়া পেলুম না। কিন্তু জিমকে সে ফেরতই দিল বলতে হবে। জিম টঙের মই বেয়ে নেমে এসে আমার পায়ের ফাঁকে ঢুকে কুঁইকুঁই শব্দ করতে থাকল। হুঁ, সেও বলছে, ঘাট মানছি। আর কক্ষনো এমনটি হবে না। ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে **চন্দ্রকান্তের** বাড়ি পৌঁছলুম।

বিজ্ঞানীপ্রবর ল্যাবরেটরিতে ছিলেন। হাসিমুখে বললেন, "আপনি ঠিক বলছিলেন। কারনে এ-জাতীয় চতুষ্পদ প্রাণী নেই। তাই ওরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। যাই হোক, আপনি জিমকে নিয়ে দেশে ফিরলে তখন ফের ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। কাট্‌রুকে আমার মোটেও পছন্দ হয় না।"

আর-একটু আছে। সেটাই আসল গপ্প। তা বলার জন্যই এতখানি লম্বাচওড়া পরিপ্রেক্ষিত।

পরদিন সকালে কাট্‌রুর সঙ্গে কথা বলার জন্য ওর টঙের দিকে যাচ্ছি। সঙ্গে জিম। হাতে বন্দুক নেই। সাপের ভয়ও নেই কারণ কাট্‌রু আমার ওপর খুশি হয়েছে। নইলে জিমকে ফেরত দিত না।

কিন্তু কী অবাক, কোথায় টঙ? ভেঙেচুরে পড়ে আছে মাকড়সার জালে ঢাকা চালছপ্পর, কাঠের মই, সবকিছুই। আর সেখানেই রাতারাতি গজিয়ে গেছে একটা গাছ। একমাথা সাদা ফুল। ধূসর বাকলে রাতের শিশির। শিশির তার পাতায়, ফুলে। গাছটার গায়ে হাত রাখতেই মনে হল দারুণ জ্যান্ত, কোনও প্রাণীর শরীরে হাত রাখলে যেমন লাগে। চমকে উঠে পিছিয়ে এলুম। বললুম, "কাট্‌রু মৌসা, কেন তুমি গাছ হয়ে গেলে বলো তো? বেশ তো ছিলে মানুষের মতো।" জিমও গাছটার দিকে তাকিয়ে লেজ নেড়ে কুঁইকুঁই করতে থাকল।

গাছের পাতায় একঝাঁক পাখি এসে বসল। অমনি ঝরঝর করে ঝরে পড়ল রাতের শিশির। দুঃখিত মনে বিজ্ঞানী **চন্দ্রকান্তের** বাড়ির দিকে পা বাড়ালুম। ওঁকে জানানো দরকার কারন উপগ্রহের নির্বাসিত মানুষ কাট্‌রু পৃথিবীর এক গাছ হয়ে গেছে। কাজেই এ-নিয়ে আর মাথা ঘামানো নিষ্ফল।

ছবি : অনুপ রায়

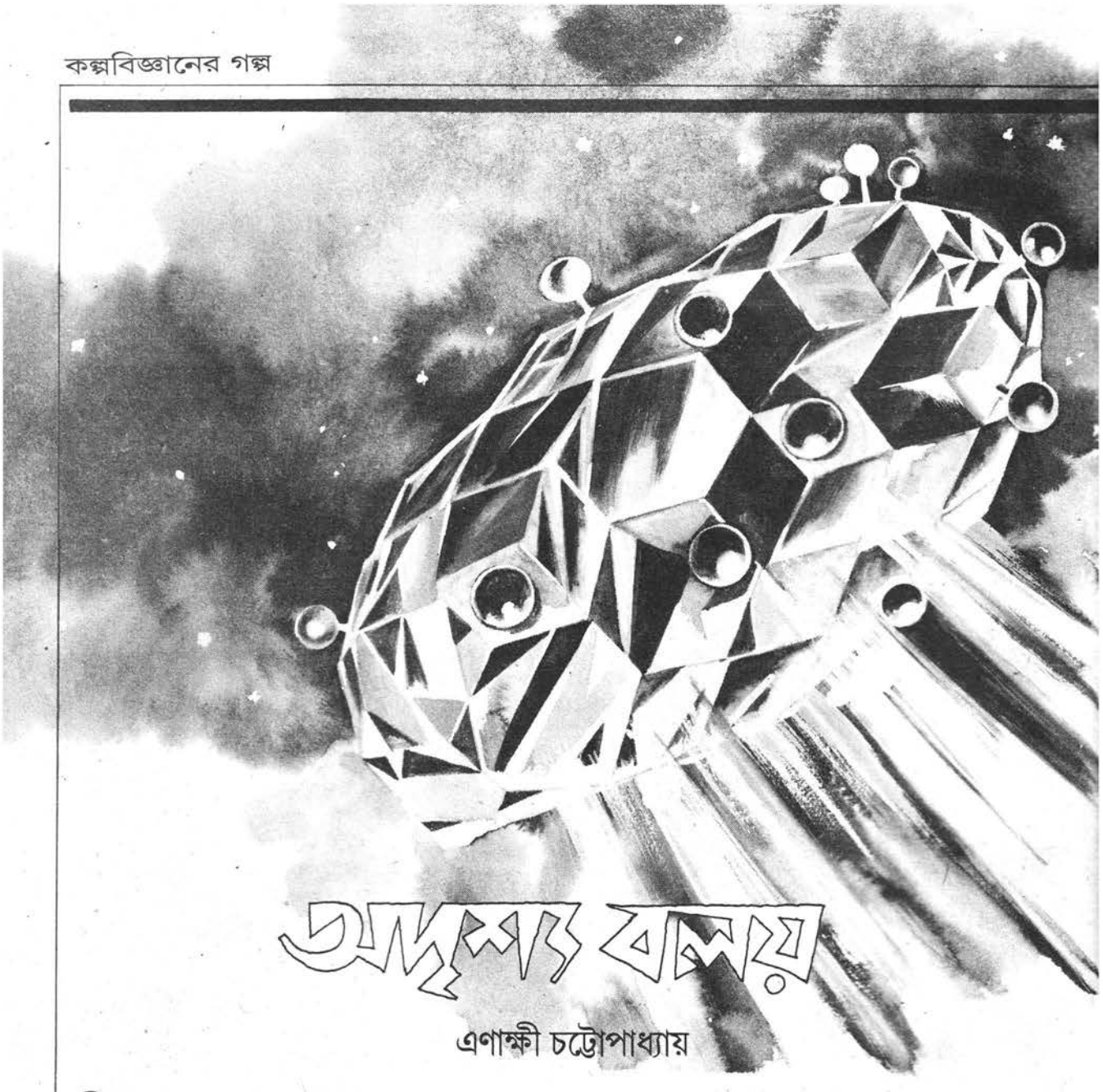

অদৃশ্য বলয়

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

বিকেলের রোদ নরম হয় এসেছে। রাস্তাটা পার হতে হতে বাগচি একবার অভ্যেস-বশে সামনে তাকালেন। বিশাল আটকোনা একটি তারা যেন হঠাৎ আকাশ থেকে খসে ইট পাথর-কাচে মোড়া চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। বলছে, 'আমায় দেখো। কী সুন্দর আমি।'

এই বাড়িটি, বাড়ি না বলে একে বাড়ির সমষ্টি বলাই উচিত—বাগচির মানস কন্যা। এর চিন্তা, নকশা থেকে শুরু করে প্রত্যেক ধাপে ধাপে তিনি ছিলেন জড়িত। যখন লোকে ষাট-সত্তর তলার বেশি যেতে ভয় পেত, মনে করত প্রগতির চূড়ান্ত হল একশো তলা, সমর বাগচি তখন মেটিরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সদ্য পিএইচ· ডি· করে নতুন উপাদান নিয়ে আশ্চর্য, অভিনব, ভবিষ্যৎমুখী সব পরিকল্পনা করছেন।

এইভাবে জেট ফাউন্ডেশনের উপর জন্ম নিল আকাশছোঁয়া ঘেঁষাঘেষি আটটি বাড়ি। একটি কেন্দ্র থেকে সাইকেলের স্পোকের মতো বেরিয়ে আছে। এখানে বাস করার ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে অফিস, কলেজ, বাজার, খেলার মাঠ, ক্যান্টিন, স্টেডিয়াম, কী নেই! এমনকী, একটি চিড়িয়াখানাও। বলতে গেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শহর। তাই কাজকর্মে যাবার জন্য কাউকে আর বাড়ি ছেড়ে বেরোতে হয় না।

এইসব প্রাসাদগুচ্ছ, এমনকী, শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারেও অন্য কারও মুখ চেয়ে নেই। সৌরশক্তি ও জৈব গ্যাস, এই দু'ভাবে এদের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা এরা নিজেরাই করেছে। কাজকর্মের জন্য কাউকে বাসে ঝুলে-ঝুলে দূরে যেতে হয় না। পথঘাট তাই ফাঁকা-ফাঁকাই থাকে। ব্যক্তিগত মালিকানায় গাড়ি নেই বললেই হয়। সরকারি গাড়ি অবশ্য আছে, তা ছাড়া আছে বড়-বড় কোম্পানিদেরও নিজস্ব গাড়ি। দূরে যাবার একান্ত দরকার হলে ট্রেন, বাস, পাতাল-রেল আছে। বাড়িগুলি উপরে উঠে যাওয়ায় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় অনেক খালি জায়গা পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আছে সবুজ মাঠ, পার্ক, ছোটখাটো জঙ্গল।

বাগচি চোখ নামিয়ে আবার হাঁটা দিলেন। মনটা খুব ভাল লাগছিল না। কংক্রিটের চত্বরে ইচ্ছে করে ফুটো করা আছে যাতে

ফাঁকে ফাঁকে ঘাস গজাতে পারে। ঘাস মাড়িয়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে মনে হল, কেউ তাঁর কাজে বাগড়া দেবার চেষ্টা করছে না তো! একেই তো চৌম্বক বলয়ের জন্য এক শ্রেণীর লোকে খুব চটেছে। আজ হঠাৎ তাঁর বেতার-টেলিফোন জ্যাম হয়ে গেল। অন্য শহরের এক কর্মীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন চৌম্বক বলয়ের আর একটি নতুন প্রয়োগ নিয়ে। ঠিকভাবে ডেভেলপ করতে পারলে ইস্পাতের প্রচুর সাশ্রয় হয়।

ভাবতে ভাবতে বাড়ির আরও কাছে পৌঁছে গেছেন বাগচি। এখন আর আটকোনা তারার মতো লাগছে না, মনে হচ্ছে দৈত্যাকার একটি মৌচাক। বিকেলের পড়ন্ত রোদ জানালার কাঁচে-কাঁচে ঝলসাচ্ছে। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তাঁর মুখ থেকে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এল, "বাঃ।" বলতে বলতেই পায়ে কিসের ঠোক্কর খেলেন, পড়ে যেতে-যেতে সামলে নিয়ে আছাড় খাওয়া থেকে বাঁচালেন নিজেকে। রোদ-ঝলসানো জানলাগুলো থেকে মাটির দিকে দৃষ্টি ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল। যখন ভাল করে নজর পড়ল, আঁতকে উঠে আবার স্বগতোক্তি করলেন, "বিষ্ণু!"

বিষ্ণু তাঁর ছোট ছেলে। তাকে নিয়ে বাগচি-পরিবারে মহা দুশ্চিন্তা। কারণ সে চায় এমন একটি পেশা, যা বহুদিন ভদ্রসমাজে ভাল চোখে দেখা হয় না। তাদের তেমন খাতিরও নেই। সে ছিল এককালে, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। এখন সব ছেলেই হতে চায় পেশাদার ফুটবলার। সেইরকম ট্রেনিং-এরও ব্যবস্থা আছে ছোটবেলা থেকেই। বিষ্ণু চায় ক্রিকেট খেলোয়াড় হতে, সুনীল গাওস্কর হতে, যার নাম জিজ্ঞেস করলে ওর বয়সের ছেলেরা মাথা চুলকে বলবে, 'কে জানে, শিবাজির কোনও সেনাপতি-টতি হবে হয়তো। বাগচির মাথার মধ্যে নিজের কাজ ছাড়াও এই দুর্ভাবনাটা তো জমা হয়ে ছিলই, এখন দপ করে মেজাজটা চড়ে গেল। কারণ, আর কিছু নয়, যে-বস্তুটি পায়ে লেগে তিনি চিতপটাং হচ্ছিলেন, সেটি একটি লাল গোলমতো জিনিস, এক সময় যা খুবই প্রসিদ্ধ ছিল ক্রিকেট-বল নামে।

এখনও অবশ্য একে ক্রিকেট-বলই বলে। যদিও এর গঠন ও উপাদানে কিছুটা বদল হয়েছে। একে নিয়ে ছেলেপিলেরা আর একদম মাতামাতি করে না। বলটা এখানে কোথা থেকে এল? যতই জিনিসটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে পরখ করতে থাকেন, ততই তাঁর ভুরু দুটো কাছাকাছি আসতে থাকে। বিষ্ণু আবার ক্রিকেটে হাত দিয়েছে বলে শুধু নয়, এই সব উঁচু বাড়িতে এখন ক্রিকেট খেলা আইন করে বারণ। প্রচণ্ড স্পিডে যে-সব খেলা হয়, যেমন হকি, টেনিস, তাও বারণ। তবে অন্য সব খেলার মাঠ এখন ছাদে। একশো আশি তলা থেকে ক্রিকেট বা হকির বল নীচে পড়লে কী হতে পারে তা চিন্তা না করাই ভাল। এখন এখানে ইনডোর কোর্ট ছাড়া খোলা ছাদে শুধু খেলা হয় ফুটবল। ফুটবল আটকাবার জন্য উঁচু রেলিং ছাড়াও আছে দুর্ভেদ্য চৌম্বক বলয়।

আজ একবার বিষ্ণুকে পেলে হয়। রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে বাগচি লিফটের দিকে এগিয়ে গেলেন লম্বা-লম্বা পা ফেলে। পাশাপাশি অনেকগুলো লিফট। কোনওটা উঠছে, কোনওটা নামছে। যেটা সবচেয়ে কাছে ছিল, সেখানে গিয়ে বোতামটা টিপলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই খাঁচাটা নেমে এল, দরজা খুলে যেতেই গোটা পাঁচ-ছয় বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এদিক-ওদিক ছিটিয়ে গেল, একজন ছাড়া। যে ছেলেটির বয়স আট-নয়, কোঁকড়া চুল, সপ্রতিভ চেহারা, সে বাগচিকে দেখে থমকে গিয়ে বলল, "মেসোমশাই!

"কী রে পিন্টু!" অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিয়েই বাগচি লিফটের ভেতরে ঢুকেছেন। লক্ষই করেননি যে, পিন্টুও পিছনে-পিছনে আবার ঢুকছে। "তিপ্পান্ন তলায় চলো," একটু রাগী-রাগী গলায় বলা সত্ত্বেও খাঁচা চুপ। এবারে স্পিকারের একটু বেশি কাছে মুখ নিয়ে আবার বললেন বাগচি, "কী, হল কী? তিপ্পান্ন তলা!" প্রায় হুমকির মতো শোনাল এবার। লিফট নট-নড়ন-চড়ন। তার দোষ কী। তার কমপিউটার মেমারিতে প্রত্যেকটি বাসিন্দার গলার প্যাটার্ন ধরা আছে। তার বাইরে কোনও গলার আদেশে লিফট চলতে পারেই না,, এমনই এর ব্যবস্থা। আজেবাজে লোক বাইরে থেকে যাতে ঢুকে না পড়ে, তাই এই ব্যবস্থা।

ক্রমশ মেজাজ চড়তে থাকে বাগচির। আজ কি সবাই মিলে তাঁর পিছনে লেগেছে! প্রথমে রেডিও টেলিফোনে বিভ্রাট, তারপর এই নিষিদ্ধ বল। এখন লিফট। রেগে প্রায় বেরিয়ে আসতে যাচ্ছেন, এমন সময় পিছন থেকে একটি সরু গলা বলল, "দাঁড়ান মেসোমশায়, আমি বলে দিচ্ছি। তিপ্পান্ন তলায় যাব আমরা।" গোঁগোঁ করে উঠতে লাগল খাঁচাটা।

বাগচি বুঝলেন, তাঁর গলা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, তাই প্যাটার্ন মিলছিল না। একটু হাসি-হাসি মুখে তিনি এবার পিন্টুর দিকে ফিরলেন। ছেলেটিকে তিনি খুবই স্নেহ করেন। চুয়ান্ন তলার হলেও সব সময় বিষ্ণুর সঙ্গে আঠার মতো লেপটে আছে। বিষ্ণুদার ফাই-ফরমাশ খাটতে পেলে পিন্টু যেন হাতে স্বর্গ পায়।

"এ কী, তুই আবার উঠছিস যে!" জিজ্ঞেস করলেন বাগচি।

"না, মানে, বিষ্ণুদা বলল," থেমে গেল পিন্টু। মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস না থাকলে যা হয়। তার মুখ দেখে মনে হল, প্রাণপণে সে কিছু একটা অজুহাত ভাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু লাগসই কিছু মনে আসছে না।

লাল ক্রিকেট-বলটা পকেট থেকে বার করে বাগচি বললেন, "এটার জন্যে তো?"

মুখ সাদা হয়ে গেল পিন্টুর। কী বলবে বুঝতে না পেরে পিন্টু বলল, "মানে, আমি ফিলডিং করছিলাম তো, এমন সময়…"

"এমন সময় কী?" বাগচি গলাটা গম্ভীর রাখার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুদাকে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা দেখে মজাও লাগছিল তাঁর।

কোনও উত্তর নেই।

"এমন সময় বলটা বেড়া টপকে নীচে চলে এল?"

বাগচি নিজের মুখেই এমন একটি অসম্ভব কথা বললেন, যার কোনও অর্থ হয় না। কারণ যে চৌম্বক বলয় দিয়ে সমস্ত ছাদের আকাশটা মোড়া আছে, তাকে ভেদ করে ধাতুর সামান্যতম ছোঁয়া আছে, এমন জিনিস বেরিয়ে আসতেই পারে না। এরই বাজারে চালু নাম বাগচি-বলয়। ছোটবেলায় পড়া একটি কল্পবিজ্ঞানের বই থেকে

গিন্নী বলেন
চায়ের সঙ্গে চলবে নাকি মারী ?
কর্তা বলেন লিলি হলে
জমবে সেটা ভারি।

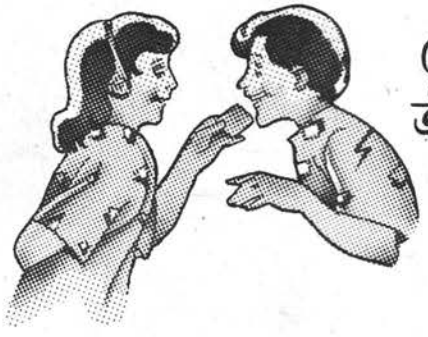

কেমন মজা কুড়মুড় মুড়
ক্রীমক্র্যাকারে জেলি
দারুণ মজা সন্দেহ নেই
হলে সেটা লিলি।

এসে গেছে লিলি বিস্কুট
টাটকা তাজা দারুণ মজা

লিলি বিস্কিট
LILY
BISCUITS

LB-6391

আইডিয়াটা পেয়েছিলেন তিনি, তার পরে এখনকার প্রযুক্তি ও মেটিরিয়াল বিজ্ঞানের ভেলকি যোগ করে তিনি এটিকে গ্রহণযোগ্য, কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন। এখন সমস্ত উঁচু বাড়ির ছাদে চৌম্বক বলয় থাকা বাধ্যতামূলক। তবে হ্যাঁ, তার জন্য নানারকম নিত্যব্যবহার্য উপকরণে কিছু বদল আনতে হয়েছে, যেমন খেলার ব্যাট, বল, ডাণ্ডা, সবকিছুতেই ভেতরদিকে সূক্ষ্মভাবে লোহার একটা আস্তর থাকে। খেলোয়াড়দের জুতো ও জামাকাপড়েও তাই। বলয়টি একেবারে নিখুঁত করার জন্য প্রতিহত করার ব্যবস্থাও আছে। তার কাছাকাছি কোনও লোহার সাঁড়াশি হাতে কেউ গেলে সাঁড়াশিটি **শাঁ** করে বলয়ের গায়ে ছুটে গিয়ে ঝুলতে থাকবে না। তবে কেউ সাঁড়াশিটি ছুঁড়ে ছাদ থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে, তা হলে ওই চৌম্বকক্ষেত্রে মৃদু শব্দ হবে, আর সাঁড়াশিটার গতি ওখানেই থেমে যাবে। সেটা পিছলে গড়িয়ে পড়বে ছাদের মেঝেতেই। এই বলয় ভেদ করে আজ অবধি কোনও ফুটবল মাটিতে পড়েনি, পড়লে সেটা হবে আপেল গাছ থেকে মাটিতে না-পড়ে আকাশে উড়ে যাওয়ার মতো অবিশ্বাস্য ঘটনা।

দুজনেই চুপ। পিণ্টু যতটা না চমকে গেছে, ভয় পেয়েছে তার চেয়ে বেশি। ছাদে ক্রিকেট খেলার জন্য না জানি বিষ্ণুদার কী শাস্তি আছে কপালে। আসলে সে মোটেই খেলছিল না, বিষ্ণুদাই তাকে ছক্কা মারার একটা কায়দা দেখাচ্ছিল। এমন সময় বলটা উড়ে বাইরে চলে গেল। ছাদে তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না। দুজনেই এই অসম্ভব ঘটনায় ভ্যাবাচ্যাকা। ছাদে তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও যখন পাওয়া গেল না, তখন বিষ্ণুদাকে বাঁচাবার জন্য সে ইচ্ছে করেই নীচে আসছিল। কে জানত যে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়।

বাগচি ভাবছিলেন অন্য কথা। চৌম্বকক্ষেত্রের দুর্ভেদ্য বর্মে কী করে ফাটল ধরল। অসম্ভব। তা হতেই পারে না। কিন্তু বলটা তা হলে...।

লিফ্‌ট ততক্ষণে তিপ্পান্ন তলায় পৌঁছে গেছে। তিনি একাই বেরিয়ে এলেন। করিডরে শুনলেন পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ঘোষণা হচ্ছে, 'দয়া করে সকলে শুনুন, সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যে, পূর্ব ও ঈশান ব্লকের মাঝখানের চত্বরে সরকারি দুগ্ধ-দফ্‌তরের ভ্যানটির মাথা কোনও অজানা উড়ন্ত বস্তুর আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে। ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা যে যেখানে থাকেন, অতি অবশ্য যেন কমিটি-রুমে চলে আসেন। এমার্জেন্সি মিটিং-এ ডাকা হয়েছে।

নিজের ফ্ল্যাট অবধি পৌঁছতে-পৌঁছতে বারকয়েক ঘোষণাটার পুনরাবৃত্তি হল। শেষবারে একটা বাড়তি খবর, 'গাড়িটির ভিতরে পাওয়া গেছে দোমড়ানো অবস্থায় একটি ফুটবল। সুতরাং এ-টিমের ক্যাপটেনকেও তলব করা হয়েছে কমিটি-রুমে।'

কোনও সন্দেহ নেই যে, অসম্ভব ঘটনাটাই সত্যি-সত্যি ঘটেছে। চৌম্বক বলয়ে ফাটল। মেঘের মতো থমথমে মুখে ফ্ল্যাটে ঢুকলেন বাগচি। সামনেই টেলিভিশনের চাবি টিপছে বিষ্ণু। তার মা কিংবা দিদি কেউ ধারে-কাছে নেই। ঘোষণা অবশ্য বাড়ির মধ্যেও শোনা যাচ্ছে, বসার ঘরের স্পিকার থেকে।

বাবাকে দেখে লাফিয়ে উঠল বিষ্ণু।

"কী হল ?" ক্লান্ত, নিরাসক্ত গলা তার বাবার।

"এ-টিমের ক্যাপটেনকে কমিটি রুমে ডাকছে ! শুনেছ ? বাগচি ভাবলেন, একেই বলে ছেলেমানুষ।

এ-টিম আর বি-টিমের রেষারেষি এদের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আজ যদি যুদ্ধ হয়ে সমস্ত শহর ধ্বংস হয়, ওরা হিসেব করতে বসবে বি-টিমের কজন মাটি-চাপা পড়েছে। গত ওলিম্পিকে ইস্ট জার্মান মেয়ে-ফুটবল-দল. আর্জেন্টিনার ছেলে-ফুটবল-টিমকে হারাবার পর থেকে মেয়েদের মনোবল একেবারে তুঙ্গে। এ-টিম ছেলেদের টিম। মেয়েরা যাকে আড়ালে বলে এলেবেলে টিম। ছেলেরাও নিজেদের মধ্যে মেয়েদের বি-টিমকে বলে বোকা টিম, কেউ বলে বিচ্ছিরি টিম। আজ এ-টিমের এই বিপদে সব ছেলেই উত্তেজিত, তাদের কাছে সেটা মান-সম্মানের প্রশ্ন। এতই উত্তেজিত বিষ্ণু যে, বাবাকে দেখে লুকিয়ে পড়ার বদলে সে দৌড়ে এসে জরুরি খবরটা শুনিয়ে দিল।

"হ্যাঁ, শুনলাম। কিন্তু হয়েছে কী ?"

"কমিটি মিটিং বসছে। নীচে কী অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, তাই। শোনোনি ? ইশ, দিদিটা যদি শুনে থাকে।"

"শুনবেই। সব জায়গায়ই তো আওয়াজ পৌঁছুবে।"

"ইশ !" মুখটা কাতর হয়ে গেল বিষ্ণুর।

ঘোষণাটা রেকর্ডের মতো চলছিল। বাগচি রিমোট বোতাম টিপে বন্ধ করলেন। তাঁর চিন্তা এখন বিষ্ণুর থেকে সম্পূর্ণ অন্য দিকে চলে গেছে। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে কপালে একবার হাত বুলোলেন। চশমাটা খুলে রাখলেন। বিষ্ণু তখনও টিভির চাবি নিয়ে ঘোরাচ্ছে।

"কী আছে দ্যাখ্‌ তো রান্নাঘরে। আর কফির জলটা চাপিয়ে দে।"

বিষ্ণু উঠে গেল। ফিরে এল এক প্লেট ঘুগনি আর কফি নিয়ে। মা

সব গুছিয়েই রেখে গিয়েছিলেন। ক্রিলের ঘুগনি আজকাল খুব চলছে। কুমেরু থেকে চালান আসছে। খেতে চিংড়ি মাছের মতো, দামেও শস্তা।

এক চামচ মুখে দিলেন বাগচি অন্যমনস্ক ভাবে। মনে হল, কাগজ খাচ্ছেন।

"বাবা, দ্যাখো তো টিভিতে কী হল ? কোনও আওয়াজ নেই, ছবিও আসছে না।"

"একটু চুপ করবি বিষ্ণু, আমি ভাবছি।"

"কী ভাবছ ?"

বাবার সঙ্গে এরকমভাবেই কথা বলে সে। এর জন্য মা'র কাছে বকুনিও কম খায় না। বাবা যে এই শহরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর মাথায় যে-সব চিন্তা-ভাবনা ঘোরে সেগুলো যে খুব দামি, বিষ্ণুর তাতে কিছু যায়-আসে না।

"ভাবছি, বলটা পড়ল কী করে ?"

"বল !" দারুণ চমকে গেল বিষ্ণু। "কোন্ বল ?" ঘোষণার শেষ অংশটা সে ভাল করে শোনেনি।

"ফুটবল। ভ্যানের ছাদ ফুটো করে গাড়ির মধ্যে পাওয়া গেছে। পড়ল কী করে বলটা।"

"বাবা !" উঠে দাঁড়াল বিষ্ণু, "একটা কথা বলব ?"

"জানি। তোমার ক্রিকেট-বল তো ?"

"ওটা কী করে উড়ে গেল, আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না। তারপর এখন এই টিভিতে গড়বড়। এরকম তো কখনও হয় না।"

আস্তে-আস্তে সোজা হয়ে বসলেন বাগচি। তারপর নিজের মনে বলে যেতে লাগলেন, যেন গল্প শোনাচ্ছেন কাউকে। "পিন্টু ফিলডিং করছে, বিষ্ণু লুফে নেবে বলে রেডি, কিন্তু হঠাৎ পাখির মতো বলয়ের জাল ছিঁড়ে বলটা উড়ে গেল। ভাগ্যিস তখন নীচে কেউ ছিল না। তবে একটু পরেই সেখান দিয়ে হেঁটে আসছিলাম আমি। বলটা আর কেউ দেখার আগেই তুলে নিই।"

চোখ দুটো গোল হয়ে যেতে থাকে বিষ্ণুর। সে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করে, আর কোনওদিন ক্রিকেট-ব্যাটে হাত দেবে না। আজ আর একটু হলেই তার বাবার মাথায় বলটা লাগতে পারত। উহ্, চোখ বন্ধ করে ফেলে সে।

বাগচি বলে চলেছেন, "ঠিক সেই সময় এ-টিমের ফুটবল প্র্যাকটিস চলছিল ঈশান ব্লকের ছাদে। একটা উঁচু ভলি, তারপর একই ঘটনা। জাল ফুটো করে, চৌম্বক টানকে কলা দেখিয়ে ফুটবল একশো আশি তলা থেকে দুধের ভ্যানের মাথায়। দুটো ঘটনা ঘটছে প্রায় একই সময়।"

বিষ্ণু বাবাকে এরকম ভাবে বিড়বিড় করতে দেখে কেমন ঘাবড়ে যাচ্ছিল। সে তাঁর মনটা অন্যদিকে করার জন্য বলল, "আর ঠিক একই সময়ে উপগ্রহ থেকে টিভি ট্রান্সমিশন বিগড়ে গেল !"

"আর আমার রেডিও টেলিফোন চলল না।"

"তার মানে কোনও চৌম্বক গোলমাল ?"

"চৌম্বক ঝড়।"

মুখের চেহারা বদলে গেল বাগচির। কোঁচকানো ভুরু সোজা, গোঁফের ফাঁকে হাসি। কফির কাপ প্রায় উল্টে ফেলে তিনি বিষ্ণুর হাত ধরে নাচতে লাগলেন, "মিল গিয়া, মিল গিয়া !"

ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে কোন্ ফাঁকে ঢুকে পড়েছে পিন্টু। ঘরে এরকম খুশির আবহাওয়া দেখে সে ভয়ে-ভয়ে বলল, "কী পেয়েছেন মেসোমশাই।"

মেসোমশাই তখন নেচে চলেছেন। সেই অবস্থায় তিনি বললেন, "উত্তর ! উত্তর !"

একটু পরে চেয়ারে বসে বাকি কফিটা এক চুমুকে শেষ করে তিনি বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বুঝেছিস ব্যাপারটা ? এর উৎস আছে আমাদের চেয়ে অনেক অনেক দূরে..."

বিষ্ণু বলল, "সোলার অ্যাকটিভিটির কথা বলছ ?"

"একদম ঠিক। সৌরোৎপাত। এই সময় পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে চৌম্বক ঝড় হয়, বা হতে পারে। শর্টওয়েভ রেডিও যোগাযোগ এই সময় ব্যাহত হতে পারে। এবং আরও কী কী হতে পারে, সেটা আমরা আজকেই দেখলাম।"

পিন্টু বেচারার মাথায় এসব কিছুই ঢুকছিল না। কেবল বিষ্ণুদা যে বাবার কাছে বকুনি খাচ্ছে না তাতেই সে খুশি।

ঠিক সেই সময় বন্ধ টিভি সেটটিতে শব্দ ফিরে এল, ফুটে উঠল ঘোষিকার মুখ।

'একটি বিশেষ ঘোষণা। আবহাওয়া-অফিস থেকে এই মাত্র জানানো হল যে, আজ ভারতীয় সময় বিকেল পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে পাঁচটা বেজে আটচল্লিশ মিনিট দশ সেকেন্ড অবধি সমস্ত পৃথিবীতে বেতার ও উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অত্যন্ত প্রবল চৌম্বক ঝড়ই এর কারণ বলে তাঁরা জানিয়েছেন। এ-বিষয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আজ রাত আটটায় প্রচারিত হবে...'

বাগচি পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন "এই যে পিন্টু, তোর জন্যে টফি।" কিন্তু হাত বার করতেই বেরিয়ে এল একটি ক্রিকেট-বল।

পিন্টু বোকার মতো হাসল। বাগচি দরাজ গলায় 'হাঃ হাঃ' করে উঠতেই বিষ্ণু কটমট করে তার ভক্তের দিকে তাকাল। বাগচি হেসে বললেন, "আরে, প্যাকেটটা গেল কোথায় ? আচ্ছা, ততক্ষণ তুই এটা ধর তো। আমি দেখি।"

এক ঝটকায় পিন্টুর কাছ থেকে বলটা ছিনিয়ে নিয়ে বিষ্ণু বলল, "বাবা, আমি আর..."

বাগচি বললেন, "ও ব্যাপারে পরে কথা হবে। এখন আমি কমিটি মিটিঙে যাচ্ছি।....এই নে পিন্টু।" ততক্ষণে হারানো টফির মোড়ক পাওয়া গেছে।

একটু পরের ঘটনা। কমিটি-রুমের উত্তেজনা একটু কমেছে। দু-একজন কিন্তু এখনও বাগচির ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন।

তিনতলার মৈত্র বললেন, "সবই তো বুঝলাম, মিঃ বাগচি। আপনি বলছেন এটা একটা দৈব-দুর্বিপাক। রেয়ার ঘটনা। প্রত্যেক দিন ঘটার নয়।"

বাগচি বললেন, "গত দুশো বছরে, মানে দুই শতাব্দীতে এই প্রথম। ১৮৪৫ সাল থেকে এশিয়াটিক সোসাইটিতে যা রেকর্ড আমরা পাচ্ছি, তার মধ্যে এ-রকম প্রবল চৌম্বক ঝড়ের উল্লেখ নেই।"

মৈত্র তবু তর্ক করে যান, "দুশো বছরে হয়নি। মানলাম। কিন্তু আবার যে হবে না তার গ্যারান্টি কে দেবে ? আপনি দেবেন ?"

ইতিমধ্যে সিকিউরিটি থেকে খবর এসে গেছে যে, ছেলেদের টিমকে সঙ্গে নিয়ে অকুস্থল পরিদর্শন করে দেখা গেছে, বাগচির অনুমানই ঠিক। বলয়ের ফাটল আবার জুড়ে গেছে।

হাসি-হাসি মুখে বাগচি বললেন, "দেখুন, বেঁচে থাকতে গেলে কিছু-কিছু ঝুঁকি নিয়ে আমাদের চলতেই হয়। মনে করুন, এটাও সেরকম।"

বাকিরা সমস্বরে বললেন, "যা বলেছেন !"

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

আপনার কেয়ো-কার্পিন চুল এই ভাবে বাঁধলে আপনাকে ভারী মিষ্টি দেখাবে!

শিখে নিন; কেয়ো-কার্পিন চুলে মিষ্টি দেখাতে হলে কি ভাবে বাঁধবেন

চুল মাঝখানে সিঁথি কেটে দুভাগে ভাগ করুন। এক একটি ভাগকে এবার চার ভাগ করে নিন। এবারে মাথার দুধারে চার গুছির বিনুনী বাঁধুন।

বিনুনীর নিচে রাবার ব্যাণ্ড লাগান। বাঁদিকের বিনুনী ডানদিকের বিনুনীর তলা দিয়ে টেনে মাথার উপর দিয়ে নিয়ে আসুন। ভালভাবে পিন লাগিয়ে আটকান।

ডানদিকের বিনুনী বাঁদিক দিয়ে একইভাবে ঘুরিয়ে আবার মাথার উপর দিয়ে টেনে আনুন। পিন লাগিয়ে আটকান।

এবার বিনুনীর ডগাদুটি ভিতরে গুঁজে আটকে দিন যাতে দেখা না যায়। প্রয়োজনে মাথার উপরে আরো কয়েকটি পিন লাগান।

চুলের সর্বাঙ্গীন যত্নের জন্যে প্রতিদিন ব্যবহার করুন মৃদু সুরভিত কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল।

চুলের পুষ্টি যোগাবে। চুল থাকবে সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল—অথচ তেলমাখা চটচটে ভাব একেবারেই থাকবে না।

এবার আপনি খোঁপা বাঁধুন, বিনুনী করুন, চুল খুলে রাখুন, কিংবা যা খুশী তাই করুন। আপনাকে ভারী সুন্দর লাগবে।

১০০ মি·লি· ও ৩০০ মি·লি· শিশিতে পাওয়া যায়।

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল।
চুল চটচটে করে না।

সুস্থ চুল। সুন্দর চুল। কেয়ো-কার্পিন চুল।

Dey's®

যাদের যত্নই আপনার আস্থা

CLARION C-DMHO-8

ভূতের ভবিষ্যৎ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বাসবনলিনী দেবী অটো নাড়ু মেশিনের তিনটে ফুটোয় নারকেল-কোরা, গুড় আর ক্ষীর ঢেলে লাল বোতামটা টিপে দিয়ে অঙ্কের খাতাটা খুলে বসলেন। এলেবেলে অঙ্ক নয়। বাসবনলিনী যে-সব আঁক কষেন, তার ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান অনেক ভেলকি দেখিয়েছে। আলোর প্রতিসরণের ওপর তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব মহাকাশবিজ্ঞানে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এই দু' হাজার একান্ন সালে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জে মানুষ যে যাতায়াত করতে পারছে, তার পিছনে বাসবনলিনীর অবদান বড় কম নয়।

যদি বয়সের প্রশ্ন ওঠে তো বলতেই হয় যে, বাসবনলিনীর বয়স হয়েছে। এই একশো একাশি বছর বয়সের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে মোট চারবার। ডাক্তাররা যাকে বলেন ক্লিনিক্যাল ডেথ্। তবে এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী বলে আধুনিক চিকিৎসা ও শল্যবিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। হৃদযন্ত্রটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় সেটা বদল করে একেবারে পাকাপাকি যান্ত্রিক হৃদ্‌যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো চোখই নতুন। কিডনিও পাল্টাতে হয়েছে। তা ছাড়া মস্তিষ্কের বার্ধক্য ঠেকাতে নিতে হয়েছে নানারকম থেরাপি। তিনি তিনবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নামডাকও প্রচণ্ড। কিন্তু বাসবনলিনী একেবারে আটপৌরে মানুষ। আঁক কষেন, বিজ্ঞানচর্চা করেন, আবার নাতিপুতি নিয়ে দিব্যি ঘর-সংসারও করেন।

বলতে কী, তাঁর নাতিরাও রীতিমত বুড়ো। তবে নাতিদের নাতিরা আছে, তস্য পুত্র-কন্যারা আছে। বাসবনলিনীর কি ঝামেলার অভাব ? এই তো পাঁচুটা তিন দিন ধরে "নাড়ু খাব, নাড়ু খাব" বলে জ্বালিয়ে মারছে। তাও অন্য কারও হাতের নাড়ু নয়, বাসবনলিনীর হাতের নাড়ু ছাড়া তার চলবে না। পাঁচুর বয়স এই সবে আট। বাসবনলিনীর মেজো ছেলের সেজো ছেলের বড় ছেলের ছোট ছেলের সেজো ছেলে। কে যে কোন্ ছেলের কোন্ ছেলের কোন্ ছেলে, বা কোন্ মেয়ের কোন্ মেয়ের কোন্ মেয়ের মেয়ে, বা কোন্ ছেলের কোন্ মেয়ের কোন্ ছেলের কোন্ মেয়ে, বা কোন্ ছেলের কোন্ ছেলের কোন্ মেয়ের কোন্ মেয়ে, সে-সব হিসেব রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। বাসবনলিনীর একটা গার্হস্থ্য কমপিউটার আছে, তাতে সব তথ্য ভরা আছে। কে পাঁচু, কে হরি, কে গোপাল, কে তাদের বাপ-মা ইত্যাদি সব খবরই বাসবনলিনী চোখের পলকে জেনে নিতে পারেন।

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!
Milk Bikis
BRITANNIA
Milk Bikis
সুস্বাদু পুষ্টিকর বিস্কুট
ব্রিটানিয়া
LINTAS BIN MB 9 2720 BG

কাজেই, অসুবিধে নেই। তা ছাড়া কে কোন্‌টা খেতে ভালবাসে, কোন্‌টা পরতে পছন্দ করে, কে একটু খুঁতখুঁতে, কে খোলামেলা, কে ভিতু, কে-ই বা দুর্বল, কে পেটুক, কে ঝগড়ুটে, সবই কমপিউটারের নখদর্পণে।

কে যেন বলে উঠল, "মা, নাড়ু হয়ে গেছে। গরম খোপে ঢুকিয়ে দেব ?"

কণ্ঠস্বরটি, বলাই বাহুল্য, মানুষের নয়। অটো নাড়ু মেশিনের।

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে মেশিনের দিকে চেয়ে বললেন, "তোর বুদ্ধির বলিহারি যাই মোক্ষদা, নাড়ু গরম খোপে রাখলে আঁট বাঁধবে কী করে শুনি !"

"ভুল হয়ে গেছে মা।"

"অত ভুল হলে চলে কী করে ? দেখছিস তো বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। কাজ করিস, কিন্তু বুদ্ধি খাটাস না। কেমন করলি নাড়ু, দেখি, দে তো একটা"

মেশিন থেকে একটা যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে এল। তাতে একটা নাড়ু। বাসবনলিনী তার গন্ধ শুঁকে বললেন, "খারাপ নয়, চলবে। স্টোরেজে রেখে দে। তারপর সুইচ অফ করে দিয়ে একটু জিরিয়ে নে।"

"আচ্ছা মা।" বলে মেশিন চুপ করে গেল।

খুক্ করে একটু কাসির শব্দ হওয়ায় বাসনলিনী তাকালেন। তাঁর স্বামী আশুবাবু সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজছেন।

বাসবনলিনী চড়া সুরে বললেন, "আবার এ-ঘরে ছোঁকছোঁক করছ কেন ? একটু আগেই তো এক বাটি রাবড়ি আর চারখানা মালপোয়া খেয়ে চাঁদে বেড়াতে গিয়েছিলে। ফিরে এলে কেন ?"

আশুবাবুর বয়স একশো একানব্বই বছর। একটু রোগা হলেও বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে অনেক রকম রোগ তাঁর শরীরে। একটু খাই-খাই বাতিক আছে। তাঁরও বার-পাঁচেক ক্লিনিক্যাল ডেথ্ হয়েছে। শরীরের অনেক যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়ায় বদলানো হয়েছে।

তিনি বিরস মুখে বললেন, "ছোঁকছোঁক করি কি আর সাধে ? নতুন যে গ্লাটন ট্যাবলেট খাচ্ছি, তাতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। চাঁদে গিয়ে একটু পায়চারি করতেই মার-মার করে ফের খিদে হল। সেখানে লড়াইয়ের চপ আর ফুলুরির কাউন্টারটা আজ আবার বন্ধ। আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যান্টিনে গিয়ে দেখি সিনথেটিক খাবার ছাড়া কিছু নেই। তাই ফিরে এলুম।"

বাসবনলিনীর করুণা হল। মোক্ষদাকে ডেকে বললেন, "ওরে, বাবুকে কয়েকখানা নাড়ু দে তো।"

নাড়ু পেয়ে আশুবাবু বিগলিত হাসি হাসলেন। দু'খানা দু'গালে পুরে চিবোতে চিবোতে আরামে চোখ বুজে এল। বললেন, "তোমার হাতের কলাইয়ের ডালের বড়ি কতকাল খাই না। আজ রাতে একটু বড়ির ঝাল হলে কেমন হয় ?"

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে আঁক কষতে কষতেই একটা হাঁক দিলেন, "ওরে ও খেঁদি, শুনতে পাচ্ছিস ?"

"যাই মা।" বলে সাড়া দিয়ে একটা কালো বেঁটেমতো কলের মানবী এসে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী বললেন, "বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে নাকি !"

"খুব বৃষ্টি হচ্ছে মা, সৃষ্টি ভাসিয়ে নিচ্ছে।"

"তা নিক। বুড়োকর্তা রাতে বড়ির ঝাল খাবেন। যা গিয়ে খানিকটা কলাইয়ের ডাল বেটে ভাল করে ফেটিয়ে রাখ। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

খেঁদি চলে গেল।

আশুবাবু নাড়ু খেয়ে এক গেলাস জল পান করলেন। তারপর পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "নাড়ুগুলো খাসা হয়েছে।"

বাসবনলিনী অঙ্কের খাতাটা বন্ধ করে উঠলেন। স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, "ঘরে বসে থাকলে কেবল খাই-খাই করবে। তার চেয়ে যাও না একটু দক্ষিণ মেরু থেকে বেড়িয়ে এসো।"

আশুবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "দক্ষিণ মেরুতে ভদ্রলোক যায় কখনও ?"

"কেন কী হয়েছে ?"

"সেখানে সামিট মিটিং হবে বলে ঝাড়পোঁছ হচ্ছে। লোকেরা ভারী ব্যস্ত। খুব গাছটাছ লাগানো হচ্ছে, মস্ত-মস্ত হোটেল উঠছে। অত ভিড় আমার সয় না। তার চেয়ে বরং আলাস্কায় গিয়ে একটু মাছ ধরে আনি।"

"তাই যাও। কিন্তু সন্ধে **সাতটার** মধ্যে ফিরে এসো। এখন কিন্তু দুপুর দেড়টা বাজছে।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, রাতে বড়ির ঝাল হবে, আমি কি আর দেরি করব ?"

আশুবাবু বেরিয়ে গেলেন। বাসবনলিনী গিয়ে খেঁদির কাজ দেখলেন। ডাল বেশ মিহি করে বেটে ফেনিয়ে রেখেছে খেঁদি। বাসনলিনী দেখে খুশি হয়ে বললেন, "এবার অটোবড়ি মেশিন দিয়ে বড়িগুলো ভাল করে দে। যেন বেশ ডুমো ডুমো হয় !"

"দিচ্ছি মা।"

বড়ি দেওয়া হতে লাগল। বাসবনলিনী জানালা খুলে দেখলেন, বাইরে সাঙ্ঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বাসবনলিনী ঘরের দেওয়ালের একটা স্লাইডিং ডোর খুলে কাঁচের ঢাকনাওলা বড়ি-বেলুনটা বের করলেন। এটা তাঁর নিজের আবিষ্কার। বড়ির ট্রেটা বেলুনের ঢাকনা খুলে তার মধ্যে বসিয়ে ফের ঢাকনা এঁটে দিলেন। তারপর দরজা খুলে চাকাওলা বড়ি-বেলুনটাকে বাইরে ঠেলে একটা হাতল টেনে দিলেন।

বড়ি-বেলুন দিব্যি গড়গড় করে গড়িয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে-ধীরে শূন্যে উঠে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল। মাইল-পাঁচেক ওপরে গিয়ে বড়ি-বেলুন স্থির হয়ে ভাসবে। ঢাকনা আপনা থেকে খুলে যাবে। চড়া রোদে বড়িগুলো দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে যাবে। না শুকোলে বড়ি-বেলুনের ম্যাগনিফায়ার রোদের তাপকে প্রয়োজনমতো দশ বা বিশ গুণ বাড়িয়ে দেবে। পাঁচ মাইল ওপরে কাকপক্ষীর উৎপাত নেই ঠিকই, তবে আন্তর্মহাদেশীয় নানা উড়ুক্কু যানের হামলা আছে। তাদের ধাক্কায় বড়ি-বেলুন বেশ কয়েকবার ঘায়েল হয়েছে। তাই এখন বড়ি-বেলুনে একটা পাহারাদার কমপিউটার বসিয়ে দিয়েছেন বাসবনলিনী। উড়ুক্কু যান দেখলেই বড়ি-বেলুন সাঁত করে প্রয়োজনমতো ডাইনে-বাঁয়ে বা ওপর-নীচে সরে যায়।

বৃষ্টিটা খুব তেজের সঙ্গেই হচ্ছে বটে। এরকম আবহাওয়ায় বাসবনলিনীর বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না। জানালার ধারে বসে কেবল অঙ্ক কষতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাজারে একটু না গেলেই নয়। অবশ্য ঘর থেকে অর্ডার দিলে বাড়িতেই সব পৌঁছে যাবে, কিন্তু বাসবনলিনী নিজের হাতে বেছেগুছে শাকপাতা কিনতে ভালবাসেন। নিজে না কিনলে পছন্দসই জিনিস পাওয়াও যায় না।

বেরোবার জন্য তৈরি হতে বাসবনলিনীর এক মিনিট লাগল। একটা বাব্‌ল শুধু পরে নিলেন। জিনিসটা কাঁচের মতোই স্বচ্ছ, তবে এত হালকা যে, গায়ে কিছু আছে বলে মনে হয় না। আসলে এই বাব্‌ল বা বুদ্বুদ গায়ের সঙ্গে সেঁটেও থাকে না। চারদিকে শুধু ডিমের খোলার মতো ঘিরে থাকে। গায়ে এক ফোঁটা জল বা বাতাসের ঝাপটা লাগতে দেয় না।

বুদ্বুদবন্দী হয়ে বাসবনলিনী বেরিয়ে পড়লেন। ইচ্ছে করলে গাড়ি নিতে পারতেন, তাঁর গ্যারাজে রকমারি গাড়ি আর উড়ুক্কু যান আছে। কিন্তু হাঁটতে ভালবাসেন বলে বাসবনলিনী কদাচিৎ গাড়ি নেন।

রাস্তায় অবশ্য যানবাহনের অভাব নেই। পেট্রল বা কয়লা বহুকাল আগেই ফুরিয়ে গেছে। তাই আজকাল গাড়ি চলে নানারকম শুকনো জ্বালানিতে। এসব জ্বালানি ছোট ছোট ট্যাবলেট যা বড়ির আকারে কিনতে পাওয়া যায়। কোনও ধোঁয়া বা গন্ধ নেই। শব্দও হয় না। যাতায়াতের জন্য আর আছে চলন্ত ফুটপাত। আজকাল এক রকম জুতো বেরিয়েছে যেগুলো পায়ে দিলে জুতো নিজেই হাঁটতে থাকে, যে পরেছে তাকে আর কষ্ট করে হাঁটতে হয় না।

তবে বাসবনলিনী এসব আধুনিক জিনিস পছন্দ করেন না। তিনি পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বাজারে এসে পৌঁছলেন।

বাজার বলতে বাগান। একটা বিশাল তাপনিয়ন্ত্রিত হলঘরে মাটিতে এবং শূন্যে হাজারো রকমের সবজির চাষ। ক্রেতারা গাছ থেকেই যে যার পছন্দমতো আলু-কুমড়ো- পটল তুলে নিচ্ছে। শূন্যে ঝুলন্ত র‍্যাকে আলুর গাছ। এসব আলুর জন্য মাটির দরকারই হয় না। শূন্যেই নানা প্রক্রিয়ায় গাছকে ফলন্ত করা হয়। গাছের নীচে চমৎকার আলু থোকা-থোকা ফলে আছে। বাসবনলিনী কিছু আলু নিলেন। বেগুন-পটল-ফুলকপিও নিলেন। আজকাল সব ঋতুতেই সবরকম সবজি হয়, কোনও বাধা নেই।

বাজারের ফটকেই ছোট-ছোট ট্রলি সাজানো আছে। তাতে বোঝা তুলে দিয়ে কনসোলের মধ্যে নাম আর ঠিকানাটা একবার বলে দিলেই ট্রলি আপনা থেকেই গিয়ে বাড়িতে জিনিস পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাসবনলিনীও বোঝাটা একটা ট্রলি মারফত বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মেঘের ওপর হেঁটে বেড়ানোর একটু ইচ্ছে হল তাঁর। কোনও অসুবিধে নেই। উড়ন্ত পিরিচ সব জায়গায় মজুত। তিনি সবজি-বাজারের বাইরে উড়ন্ত পিরিচের গ্যারাজে ঢুকে একটা পিরিচ ভাড়া নিলেন। পাঁচ ফুট ব্যাসার্ধের পিরিচটা খুবই মজবুত জিনিসে তৈরি। তাতে একখানা আরামদায়ক চেয়ার আছে, কিছু খাদ্য-পানীয়ের একখানা ছোট আলমারি আছে, আর আছে একজোড়া হাওয়াই-চপ্পল। এই চপ্পল পরে আকাশে দিব্যি হেঁটে বেড়ানো যায়।

বুদ্বুদসমেত বাসবনলিনী পিরিচে চেপে বসলেন। পিরিচ একটা দ্রুতগামী লিফটের মতোই ওপরে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন মেঘের স্তর ভেদ করে বাসবনলিনী রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে উঠে এলেন। চারদিকে কোপানো মাটির মতো মেঘ। আশেপাশে অনেক পিরিচ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাতে নানা ধরনের মানুষ। তা ছাড়া বড় বড় উড়ন্ত কার্পেটে দঙ্গল বেঁধে কোনও পরিবার পিকনিকও করছে। প্রচুর লোক। ওপরে-নীচে সর্বত্র। মেঘের ওপর ক্লাউড-স্কিও করছে কেউ-কেউ। হাওয়াই-বুট পরে শূন্যে ফুটবল খেলছে কিছু যুবক। কয়েকজন যুবতী ভাসমান ফুচকাওলার কাছ থেকে ফুচকা কিনে খাচ্ছে।

পিরিচটা নিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বাসবনলিনী তাঁর বড়ি-বেলুনের কাছে এলেন। বড়িগুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

হাওয়াই চপ্পল পরে নামতে যাবেন, এমন সময় ঠিক একটা কুমড়োর আকৃতির উড়ুক্কুগাড়ি তাঁর সামনে থেমে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে একটা ছোকরা হাসিমুখে বলে উঠল, "কী গো ঠাকুমা, এখানে কী হচ্ছে? বড়ি রোদে দিয়েছ নাকি?"

ছোকরা আর কেউ নয়, গদাধর ভশ্চাযের ডানপিটে ছেলে রেমো। রেমোর জ্বালায় বাসবনলিনীর এক সময়ে ঘুম ছিল না চোখে। গাছের আম জাম কাঁঠাল কিচ্ছু রাখা যেত না রেমোর জন্য। বিচ্ছুটা চুরিও করত নানা কায়দায়। একখানা লেজার গান দিয়ে টপাটপ পেড়ে ফেলত ফলপাকুড়, তারপর একটা খুদে পুতুলের মতো রোবটকে বাগানের দেওয়াল টপকে ঢুকিয়ে দিত। ফল কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসতে রোবটের কোনও অসুবিধেই হত না। এই বড়ি-বেলুনে রোদে-দেওয়া আচার আমসত্ত্বও বড় কম চুরি করেনি রেমো। তাই তাকে দেখে বাসবনলিনী একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, "আজ রাতে বড়ির ঝাল রাঁধব, তোকে একটু পাঠিয়ে দেব'খন।"

রেমো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "রাতের খাওয়া আজ যে কোথায় জুটবে কে জানে।"

"কেন রে, কী হল?"

"আর বলো কেন। গত একমাস ধরে বেস্পতির চারদিকে ঘুরপাক খেতে হয়েছে। আজ সবে ফিরছি। ফিরতে ফিরতেই রেডিওতে বদলির অর্ডার এল। আজই ইউরেনাসে রওনা হতে হবে। সেখানে রোবটরা নেমে মানুষের থাকার মতো ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল। শুনছি সেইসব রোবটদের কয়েকজন নাকি এখন ভারী বেয়াড়াপানা শুরু করেছে। মানুষের কথা শুনছে না। কয়েকটা রোবট পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবীর দল গড়েছে।"

বাসবনলিনী চোখ কপালে তুলে বললেন, "বলিস কী! এ তো সব্বোনেশে কাণ্ড।"

রেমো একটু হেসে বলল, "তোমরা পুরনো আমলের লোক ঠাকুমা, এ-যুগের কোনও খবরই রাখো না। তবে ভালর জন্যই বলে রাখি, রোবটদের ঘরের কাজে বেশি লাগিও না। খাবার-দাবারে বিষটিসও মিশিয়ে দিতে পারে। একদম বিশ্বাস নেই ওদের।"

শুনে বাসবনলিনীর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। হৃৎপিণ্ডটা কলের না হলে বুঝি বা হার্টফেলই করতেন। কোনওরকমে সামলে নিয়ে বললেন, "তা এইসব কাণ্ড হচ্ছে, কিন্তু কই মুখপোড়ারা খবরের কাগজে তো কিছু লেখে না।"

রেমো হেসে কুটিপাটি হয়ে বলল, "তুমি সত্যিই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি হয়ে গেছ ঠাকুমা। বলি, খবরের কাগজে খবর লেখে আর ছাপে কারা তা জানো? অটোমেশিনের পাল্লায় পড়ে সবই তো যন্ত্রমগজের কব্জায় চলে গেছে। তা তারা কি রোবটদের দুষ্টুমির কথা ছাপবে? সবই তো জ্ঞাতিভাই, তলায় তলায় সকলের সাঁট। এমনকী রোবটরা তো রোবটল্যান্ডও দাবি করে বসেছে। ধর্মঘট, আইন অমান্যের হুমকিও দিচ্ছে। এসব শোনোনি?"

"না বাছা, শুনিনি। আপন মনে বসে আঁক কষি, অতশত খবর তো কেউ বলেওনি।"

"যাই ঠাকুমা, মা-বাবার সঙ্গে একটু দেখা করে ইউরেনাসে রওনা দেব। সময় বেশি নেই।"

রেমো চলে যাওয়ার পর বাসবনলিনী হাওয়াই চপ্পল পরে একটু শূন্যে পায়চারি করলেন। বাতাস এখানে বড্ড পাতলা। শ্বাসের কষ্ট হয়। তাই বাসবনলিনী তাঁর অকসিজেন-রুমাল মাঝে-মাঝে নাকে চেপে ধরছিলেন। কোন দুষ্টু ছেলে যেন একটা কুকুরকে হাওয়াই-জুতো পরিয়ে আকাশে ছেড়ে দিয়েছে। সেটা ঘেউঘেউ করে পরিত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে কাছ দিয়েই ছুটে গেল। আজকাল আকাশেও খুব একটা শান্তি নেই।

কিন্তু রোবটদের কথায় বাসবনলিনীর দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। মনে স্বস্তি পাচ্ছেন না। মোক্ষদা, খেঁদি, পেঁচি, রোহিণী, মদনা, যামিনী এরকম অনেকগুলো রোবট-কাজের-লোক আছে বাসবনলিনীর। তার ওপর রোবট-গয়লা, রোবট-ধোপা, রোবট-নাপিত, রোবট-ফেরিঅলারও অভাব নেই। এদের যদি বিশ্বাস না করা চলে, তবে তো ভীষণ বিপদ। এর ওপর আছে রোবট-ডাক্তার,

রোবট-নার্স। বাসবনলিনী খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে পিরিচে উঠে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন।

এসে দেখেন আশুবাবু গঙ্গারামকে হিন্দিতে খুব বকাঝকা করছেন। গঙ্গারাম নাকি বাগান কোপানোর কাজে ফাঁকি দিয়ে বসে বসে বিড়ি টানছিল। আশুবাবু খুব তেজী গলায় বলছিলেন, "ফের কভি বিড়ি ফুঁকেগা তো কান পাকাড়কে এয়সা মোচড় দেগা যে, আক্কেল একদম গুড়ুম হো **যায়েগা**। বুঝেছিস?"

গঙ্গারাম একটু বোকাগোছের রোবট। তার কাজ বাগানের মাটি কুপিয়ে চৌকস করা। রোবটরা কখনও বিড়িটিড়ি খায় না। ওদের এতকাল কোনও নেশাটেশা ছিল না।

বাসবনলিনী আশুবাবুকে ইশারায় আড়ালে ডেকে বললেন, "শোনো, এখন চাকর-বাকরদের ওপর হম্বিতম্বি কোরো না। দিনকাল পাল্টে গেছে।"

আশুবাবু খুব রেগে গিয়ে বললেন, "কিন্তু আস্পদ্দা দ্যাখো, কাজে ফাঁকি দিয়ে বিড়ি খাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি কি সহ্য করা যায়?"

বাসবনলিনী চাপা গলায় বললেন, "আঃ, আস্তে বলো, শুনতে পাবে। বলি, রোবটরা যে সব দল বেঁধে বিপ্লবটিপ্লব কী সব শুরু **করেছে,** তা শুনেছ?"

আশুবাবু একটুও বিস্মিত না হয়ে বললেন, "শুনব না কেন? খুব শুনেছি। চতুর্দিকে স্যাবোটাজ শুরু করেছে ব্যাটারা। আশকারা পেয়ে পেয়ে এমন মাথায় উঠেছে যে, এখন রোবটল্যান্ড চাইছে। এর পর হয়তো আমাদের দিয়েই কাজের লোকেদের কাজ করাতে চাইবে।"

বাসবনলিনী ভিতু গলায় বললেন, "সব জেনেও গঙ্গারামের ওপর চোটপাট করছিলে? ও যদি ওর জাতভাইদের বলে দেয়, তা হলে কি তারা তোমাকে আস্ত রাখবে?"

আশুবাবু একগাল হাসলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন, "অত সোজা নয়। আমার কাছে ওষুধ আছে।"

বাসবনলিনী অবাক হয়ে বললেন, "কী ওষুধ?"

আশুবাবু খুব হেঁহেঁ করে হেসে বললেন, "আছে। আমার ডার্করুমে লুকিয়ে রেখেছি। রোবটরা যে দুষ্টুমি শুরু করবে একদিন, তা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যে গোপনে গোপনে বহুকাল ধরে ওষুধ বের করার চেষ্টা করেছি। এতদিনে ফল ফলেছে।"

"বলো কী! চলো তো তোমার ওষুধটা দেখব।"

"দেখাব, কিন্তু পাঁচ-কান করতে পারবে না তোমরা তো পেটে কথা রাখতে পারো না।"

"না গো না, বিশ্বাস করেই দ্যাখো।"

আশুবাবু বাসবনলিনীকে নিয়ে মাটির তলায় একটা গুপ্তকক্ষে এসে ঢুকলেন। ঘরে যন্ত্রপাতি কিছুই প্রায় নেই। শুধু একটা কালো বাক্স। একটা লাল আলোর ডুম জ্বলছে।

একটা টুল দেখিয়ে আশুবাবু বাসবনলিনীকে বললেন, "বোসো। যা দেখাব তা তোমার বিশ্বাস হবে না। তার চেয়েও বড় কথা, ভয়-টয় পেতে পারো।"

"জিনিসটা কী?"

"দেখলেই বুঝবে।"

এই বলে আশুবাবু কালো বাক্সটার গায়ে একটা হাতল ঘোরাতে লাগলেন। আর মুখে নানা কিম্ভূত শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন, "ওঁ ফট, ওঁ ফট, প্রেত প্রসীদ, প্রেতেণ পরিপূরিত জগৎ। জগৎসার প্রেতায়া···" ইত্যাদি।

বাসবনলিনী দেখলেন, কালো বাক্সটার গায়ে একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে কালো ধোঁয়ার মতো কী একটু বেরিয়ে এসে বাতাসে জমাট বাঁধতে লাগল। তারপর চোখের পলকে সেটা একটা ঝুলকালো, রোগা শুঁটকো মানুষের চেহারা ধরে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী আঁতকে উঠে বললেন, 'উঃ মা গো, এ আবার কে?"

আশুবাবু হেঁহেঁ করে হেসে বললেন, "এদের কথা আমরা এতকাল ভুলেই মেরে দিয়েছিলুম গো। বহুকাল আগে এদের নিয়ে চর্চা হত। আজকাল বিজ্ঞানের ঠেলায় সব আউট হয়ে গিয়েছিল।"

"কিন্তু লোকটা আসলে কে?"

এ-কথার জবাব কালো লোকটাই দিল। কান এঁটো-করা হাসি হেসে খোনা স্বরে বলল, "এজ্ঞে, আমি হলুম গে ভূত। একেবারে নির্জলা খাঁটি ভূত। বহুকাল ধরে দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা করছিলুম, হচ্ছিল না। তা এজ্ঞে, এবার এ-বাবুর দয়ায় হয়ে গেল।"

শুনে বাসবনলিনী গোঁগোঁ করে অজ্ঞান হলেন। তারপর জ্ঞান

ফিরে এলে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলেন। ভূতটা তখনও দাঁড়িয়ে।

আশুবাবু একখানা তালপাতার পাখায় বাসবনলিনীকে বাতাস দিতে দিতে বললেন, "আর ভয় নেই গিন্নি, ভূতেরা কথা দিয়েছে বিজ্ঞানের কুফল দূর করার জন্য জান লড়িয়ে দেবে। রোবটদেরও ঢিট করবে ওরাই।"

কেলে ভূতটা সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, "এজ্ঞে, একেবারে বাছাধনদের পেটের কথা টেনে বের করে আনব মাঠান, কোনও চিন্তা করবেন না।"

বাসবনলিনী এবার আর ভয় পেলেন না। খুব নিশ্চিন্ত হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বেঁচে থাকো বাবারা।"

ছবি : দেবাশিস দেব

এ যুগ কল্পবিজ্ঞানের

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

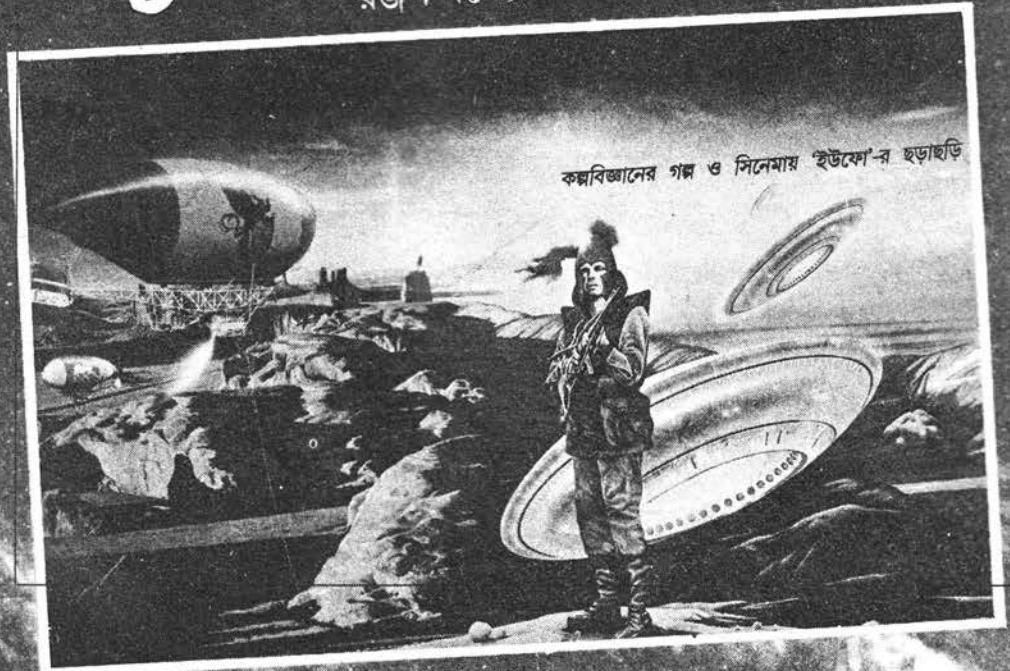

কল্পবিজ্ঞানের গল্প ও সিনেমায় 'ইউফো'-র ছড়াছড়ি

সায়েন্স এবং ফিকশন, এই দুটো শব্দের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে চিরদিনের ঝগড়া। সায়েন্স-এর আক্ষরিক অর্থ 'জ্ঞান'। অর্থাৎ, এক ধরনের সত্যসন্ধান। আর ফিক্‌শনের মধ্যে লুকিয়ে আছে বাস্তব জগতে যা ঘটে না কল্পনায় তা-ই ভেবে নেবার ব্যাপারটা। তার মানে এই নয় যে, ফিক্‌শনের সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশেল দিয়েই তৈরি হয় ফিক্‌শন।

সায়েন্স আর ফিক্‌শনের বিভেদ প্রথম মিটিয়েছিলেন হুগো গার্নস্‌ব্যাক নামের এক মার্কিন ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। ইংরেজি ভাষায় সায়েন্স ফিক্‌শন কথাটি তাঁরই অবদান। সেটা এই শতকের বিশের দশক। গার্নসব্যাক এই সময়েই 'অ্যামেজিং স্টোরিজ' লিখে সায়েন্স ফিক্‌শন নাম দেন। খ্যাতনামা মার্কিন চিত্রপরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গ সম্প্রতি টিভির জন্যে সায়েন্স ফিক্‌শনধর্মী ছবির একটি সিরিজ করছেন, যার নাম দিয়েছেন, 'অ্যামেজিং স্টোরিজ'। এর থেকেই বোঝা যায় সেই বিশের দশকের গার্নসব্যাক থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্য, সিনেমা ও কল্পবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের একটি ধারা চলে আসছে। তবে সত্যি কথা বলতে কী, জুলে ভার্ন কিংবা এইচ· জি· ওয়েল্‌সই কিন্তু সায়েন্স ফিকশনের পিতামহ নন। যদিও এঁদের 'টুয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগ্‌স আণ্ডার দ্য সি' এবং 'দ্য টাইম মেশিন' সায়েন্স ফিক্‌শনের নতুন যুগ শুরু করে দিয়েছিল।

প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ইজেকিয়েল আকাশের গায়ে জ্বলন্ত চাকির বর্ণনা দিয়েছেন। আমার তো মনে হয়, 'ইউফো' বা 'আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট', যা নিয়ে এ-যুগের কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক গল্পে এবং সিনেমায় এত

বাড়াবাড়ি, তার প্রথম দেখা আমরা ইজোকিয়েলের লেখার মধ্যেই পাই। গ্রিক লেখক লুসিয়েন-এর লেখার মধ্যেও সায়েন্স ফিক্‌শনের উপাদান যথেষ্ট রয়েছে। ষোড়শ শতকে র‍্যাবেলে সায়েন্স ফিক্‌শন লিখেছিলেন। এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখক ভোলতেয়ার-এর মধ্যেও এই ধারা প্রবাহিত। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে আমরা ক্রমশই বুঝতে পারছি কত অসম্ভবকে বিজ্ঞান সম্ভব করে তুলতে পারে। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়-এর মুখে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনা শুনেছিলেন। আর সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়েই যুদ্ধ দেখতে পাচ্ছিলেন। প্রশ্ন হতে পারে, সঞ্জয়ের সামনে কি টেলিভিশন ছিল ? নাকি এ শুধু কবির কল্পনা ? সেই অসম্ভব কল্পনাকেই কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সম্ভব করে তুলেছে।

বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য ক্ষমতাকে সায়েন্স ফিক্‌শনে এমনভাবে কাজে লাগানো হয়েছে, যাতে অবাস্তব অসম্ভব সব অবস্থাও বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। এইচ· জি· ওয়েলস তাঁর 'দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন' বইটিতে মানুষের চাঁদের দেশে যাওয়ার কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন।

পরে অবশ্য মানুষ সত্যিই চাঁদে পৌঁছেছে। এবং সেখানে গিয়ে দেখেছে মানুষ তো দূরের কথা, চাঁদে কোনও প্রাণীই নেই। তাই বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাসে লেখক যা কল্পনা করেন এবং বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত যা আবিষ্কার করে, তার মধ্যে ফারাক থেকে যায়। এই তফাতটুকু আছে বলেই সায়েন্স ফিক্‌শনের এত আকর্ষণ। তবে, সেই সঙ্গে এটাও বলা প্রয়োজন যে, মানুষ চাঁদে যাবার আগে আমরা যখন ছেলেবেলায় এইচ জি ওয়েলসের 'দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন' পড়েছিলাম, তখন যে ধরনের শিহরন অনুভব করতাম, এখন কিন্তু

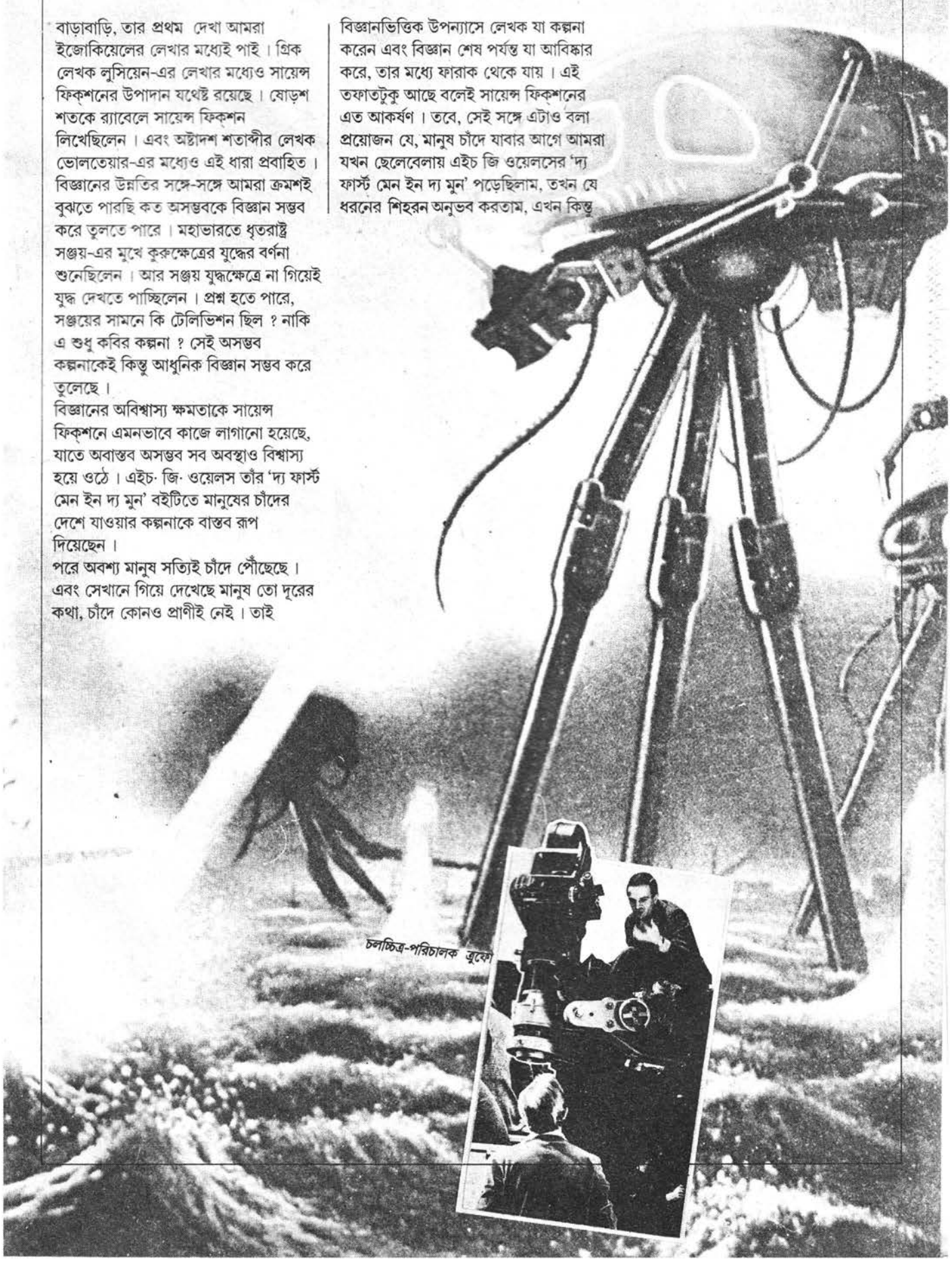

চলচ্চিত্র-পরিচালক ত্রুফো

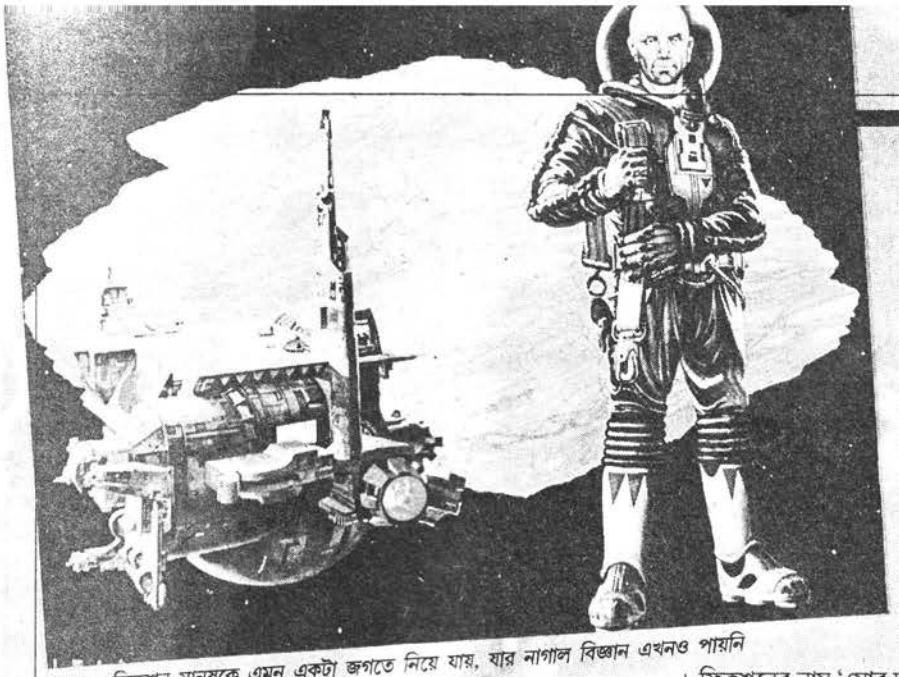

সায়েন্স ফিক্‌শন মানুষকে এমন একটা জগতে নিয়ে যায়, যার নাগাল বিজ্ঞান এখনও পায়নি

তা আর করি না । তার কারণ বিজ্ঞান চাঁদকে পুরোপুরি আবিষ্কার করে ফেলেছে । পাশাপাশি আর্থার ক্লার্ক, রে ব্রাডবেরি, আইজাক আসিমভ, কার্ল সাগান-এর সায়েন্স ফিক্‌শন পড়লে এখনও বিজ্ঞানের অনাবিষ্কৃত ক্ষমতার চমকটা পাওয়া যায় । তার কারণ, এঁরা মানুষকে এমন একটা জগতে নিয়ে যান, যার নাগাল বিজ্ঞান এখনও পায়নি, কিন্তু পাওয়াটা খুব একটা অসম্ভবও নয় । অর্থাৎ, এঁদের সায়েন্স ফিক্‌শনের গোড়ার কথাই হল, যদি এমন ঘটত তা হলে কী হত ? আসিমভ তো নিজেই বলেছেন, সায়েন্স ফিক্‌শন দাঁড়িয়ে আছে দুটো 'যদি'-র ওপর—'হোয়াট ইফ' এবং 'ইফ ওনলি' !

তবে এ-যুগের সায়েন্স ফিক্‌শনের সঙ্গে আগের যুগের সায়েন্স ফিক্‌শনের তফাত অনেক । এইচ· জি· ওয়েলসের 'টাইম-মেশিন' কিংবা 'দ্য ইনভিজিবল ম্যান' কিংবা জুলে ভের্ন-এর 'ফ্রম দ্য আর্থ টু দ্য মুন' পড়লে মনে হয় আসলে দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চারের গল্পই পড়ছি । সেখানে কাহিনীর টানটাই বড় ব্যাপার । এ-যুগের সায়েন্স ফিক্‌শনে বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিবরণ অনেক বেশি । ওয়েলসের 'চাঁদের মানুষ'-এ কিন্তু মানুষ চাঁদের মৃদু মাধ্যাকর্ষণের মোকাবিলা করে কীভাবে উড়ে-উড়ে হাঁটছে তার তেমন কোনও বর্ণনা নেই । কিংবা সেখানে কীভাবে মানুষ শ্বাস নিচ্ছে, সে সম্পর্কেও লেখক মাথা ঘামান না । তবে গল্পের টান এমন যে, তাতে কিছু যায় আসে না । পাশাপাশি যদি ক্লার্ক-এর 'দ্য সেন্টিনেল' উপন্যাসটা পড়ি, তা হলে দেখতে পাই বিজ্ঞানের কত সঠিক কিংবা সম্ভাব্য খুঁটিনাটি বিবরণ তিনি নিয়ে এসেছেন । এই উপন্যাস থেকেই কুব্রিক তৈরি করেছিলেন তাঁর '২০০১-স্পেস অডিসি' চলচ্চিত্রটি । আবার আসিমভের ক্রিস্টাল সিটির ভাবনার মধ্যেও পান থেকে চুন খসতে দেওয়া হয়নি । অর্থাৎ সব কিছু অসম্ভব হয়েও যেন গণিতের মতো নির্ভুল ।

এর ফলে আধুনিক বিজ্ঞান-সাহিত্যে কখনও-কখনও মনে হয় যেন প্রাণের বড় অভাব । মানুষের জায়গা নিয়েছে কম্পিউটার । চরিত্রগুলো সব স্বয়ংক্রিয় রোবটের মতো । এইজন্য সাহিত্যগুণে ওয়েলস কিংবা জুলে ভার্নের প্রতিযোগী হবার ক্ষমতা ব্রাডবেরি কিংবা হাইনলিন, কম্পটন কিংবা স্যামুয়েল ডিলেনির হয়তো নেই । থিওডর স্টার্জিয়ান-এর একটা সায়েন্স ফিক্‌শনের নাম 'মোর দ্যান হিউম্যান' । মানুষের চেয়ে বড় কিছু খুঁজতে গিয়েই সায়েন্স ফিক্‌শন হারিয়ে ফেলেছে মানবিক আবেদন । এ-যুগের ছেলেমেয়েদের অবশ্য সায়েন্স ফিক্‌শনের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় হয় কমিক্‌স-এর মাধ্যমে । ফ্ল্যাশ গর্ডন, সুপারম্যান, ম্যাজিশিয়ান ম্যানড্রেক প্রভৃতি কমিক্‌স তো আজকাল ছেলেমেয়েদের হাতে-হাতেই ঘোরে । এ ছাড়া সায়েন্স ফিক্‌শনকে জনপ্রিয় করেছে 'ওমনি'-র মতো বিজ্ঞান-পত্রিকায় প্রকাশিত নানারকম গল্প । সারা পৃথিবীতে এখন সায়েন্স ফিক্‌শনের জয়জয়কার । জাপান থেকে ফ্রান্স, ব্রিটেন থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সমস্ত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া জুড়ে শুরু হয়েছে সায়েন্স ফিক্‌শনের নতুন যুগ । এই নতুন যুগকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় 'দ্য ওয়ার্ল্ড সায়েন্স-ফিক্‌শন কনভেনশন' । ১৯৭০-এ প্রকাশিত নবোকভ-এর 'আর্ডা' এবং মাইকেল ক্রিক্‌টন-এর 'অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেন' এই নবযুগের সূচনা করেছিল বলা যায় ।

এই নতুন যুগের সায়েন্স ফিক্‌শনের প্রভাব পড়েছে সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে লেখা অসামান্য সব গল্পে । সত্যজিৎ রায়ের লেখা সায়েন্স ফিক্‌শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার মানবিক আবেদন । শুধু প্রোফেসর শঙ্কুই নয়, এমনকী, তাঁর তৈরি রোবট মানবিক গুণ ও হৃদয়বৃত্তির অধিকারী । কিন্তু সেইসঙ্গে অ্যানাইহিলিন-এর মতো উদ্ভট বন্দুকের কল্পনাও সত্যজিৎ রায় করতে পারেন । বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের চমৎকার সমন্বয়ে সত্যজিৎ কখনও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন না বলেই তাঁর লেখা পড়তে এত

ভাল লাগে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্পগুলিও উৎকৃষ্ট সায়েন্স ফিকশনের নিদর্শন।

এ-যুগের সায়েন্স ফিকশনের সঙ্গে সায়েন্স-ফিল্ম-এর ওতপ্রোত সম্পর্ক। এই সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছিল ১৮৯৭ সালে জর্জ মেলিয়ে-র 'দ্য ল্যাবরেটরি অব মেফিস্টোফিলিস' ছবিতে। জুল ভের্ন-এর 'টুয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগ্স আণ্ডার দ্য সি' নিয়েও খুব সুন্দর ছবি তৈরি হয়েছে। এ-যুগের একটি ক্লাসিক সায়েন্স-ফিল্ম তৈরি করেছেন ত্রুফো। ছবিটির নাম 'ফারেনহাইট-৪৫১'। এ ছাড়া রয়েছে গোদারের 'আলকাভিল'। বাংলা সিনেমায় সায়েন্স-ফিকশনের প্রভাব অবশ্য খুব বেশি পড়েনি। তবে তপন সিংহের 'এক যে ছিল দেশ' নিঃসন্দেহে সায়েন্স-ফিল্ম। সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে'-ও মগজ ধোলাইয়ের মেশিনের ভাবনায় সায়েন্স-ফিকশনের প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়। সত্যজিৎ রায়ের গোলাপীবাবুর গল্প নিয়ে সন্দীপ রায় যে ছবি করছেন, তাতেও তো স্পেসক্রাফট এবং অন্য গ্রহের প্রভাব নিয়ে নানা মজার ঘটনা রয়েছে। এক সময় সত্যজিৎ রায় 'এলিয়েন' নামে একটা সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম ইংরেজিতে করবেন বলে ভেবেছিলেন। সে ছবি হয়নি। তবে সত্যজিৎ রায়ের হাতে আঁকা এলিয়েন-এর ছবি অনেকেই দেখেছ মারি সিটনের বইয়ে। এলিয়েন-এর অন্য গ্রহের মানুষকে নিয়ে ছবি করেছেন স্পিলবার্গ। সেই ছবি তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। নাম 'ক্লোজ এনকাউন্টার অব দ্য থার্ড কাইণ্ড'। যেমন জুলে ভের্ন বা এইচ· জি· ওয়েলস সায়েন্স ফিকশনের সম্রাট, তেমনি সায়েন্স ফিকশনের ফিল্মের সম্রাট স্পিলবার্গ। সম্প্রতি তিনি একটা ছবি করেছেন যার নাম 'ব্যাক টু দ্য ফিউচার'। অর্থাৎ ভবিষ্যতের দিকে পিছন ফিরে তাকানো। এই অবাস্তব, উদ্ভট অঘটনকে তিনি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ছবিতে, তাতে আমাদের মনে পড়ে ওয়েলসের 'টাইম মেশিন' উপন্যাসটির কথা।

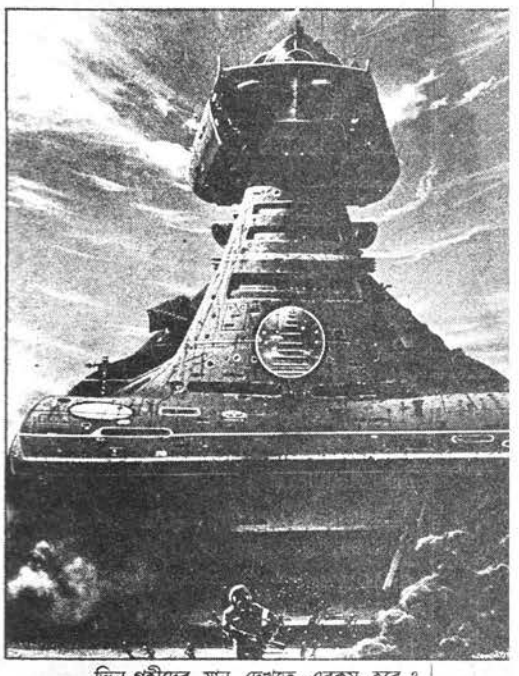

ভিন্-গ্রহীদের যান দেখতে এরকম হবে?

কল্পবিজ্ঞানের দুই অমর লেখক-

জুলে ভার্ন ওয়েলস

জুলে ভার্ন

এইচ. জি. ওয়েলস

চঞ্চল পাল

ফরাসি লেখক জুলে ভার্ন (জন্ম ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৮, মৃত্যু ২৪ মার্চ ১৯০৫) প্যারিসে আইন পড়তে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে নাটক করে বেড়াতেন। ক্রমশ নাট্যকার হিসেবে একটু খ্যাতিও লাভ করে ফেললেন ছাত্রমহলে। বাইশ বছর বয়সে (১৮৫০) তাঁর লেখা নাটক 'লে পেইল্লে রঁপুয়ে' (ব্রোকেন স্ট্র) মঞ্চস্থ হবার পর বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছিল। তা সত্ত্বেও পেট ভরাবার জন্য তাঁকে বেছে নিতে হল শেয়ার মার্কেটের দালালি (১৮৫৪)। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণে অবসর-সময়ে লিখে চলতেন

> জুলে ভার্নের অনেক কল্পনাই পরে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ওয়েল্সও নিছক কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন দূরদর্শী। এই দুই লেখকের গল্প-উপন্যাসের মূল্য তাই আজও এতটুকুও কমেনি।

গল্প আর নাটক। জীবনের পঁয়ত্রিশটা বছর এভাবে পার হবার পর হঠাৎ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল শিক্ষা এবং চিত্তবিনোদন-সংক্রান্ত একটি পত্রিকার সম্পাদক জুলে হ্যাজেল-এর সঙ্গে (১৮৬৩)। লিখলেন 'ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন'। পড়ে চমকে উঠলেন ফরাসি পাঠকরা। এখন কল্পবিজ্ঞানের রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়তে লাগল দেশের বাইরেও। ছ বছর যেতে-না-যেতেই উপন্যাসটির ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে গেল। ব্যস, সেই যে তিনি খ্যাতির শীর্ষে উঠলেন আর নামলেন না। এবার বেলুন থেকে নেমে

প্রবেশ করলেন পাতালে (এ জার্নি টু দি সেন্টার অব দি আর্থ, মূল ১৮৬৪, ইং ১৮৭৪), তারপর মহাকাশযানে চড়ে গেলেন চাঁদে (ফ্রম আর্থ টু দি মুন, মূল ১৮৬৫, ইং ১৮৭৩), নামলেন সাগরের অতলে (টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগ্‌স আণ্ডার দি সি, মূল ১৮৭০, ইং ১৮৭৩), যাত্রা করলেন রহস্যময় দ্বীপে (দি মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড, মূল ১৮৭৪, ইং ১৮৭৫)। তবে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে তাঁর উপন্যাস 'অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ' (মূল ও ইং ১৮৭৩)। যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'লে তেম্প্‌স' পত্রিকায়। কল্পবিজ্ঞান হলেও এসব লেখা নিছক কল্পনাবিলাস নয়, তার সঙ্গে মিশেছিল দূরদর্শিতা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির স্বচ্ছতা। সাবমেরিন, অ্যাকোয়ালাং, টেলিভিশন আর মহাকাশযাত্রার সম্ভাবনার কথা আজ থেকে শতাধিক বছর আগে তাঁর মনে কী করে ধরা পড়েছিল, তা ভেবে আজকের বিজ্ঞানীরাও অবাক হয়ে যান।

কল্পবিজ্ঞানের আর এক অমর লেখক হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস (জন্ম ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬ ; মৃত্যু ১৩ আগস্ট, ১৯৪৬) বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর টাইম মেশিন (১৮৯৫), দি ওয়াণ্ডারফুল ভিজিট (১৮৯৫), আইল্যাণ্ড অব ডঃ মোরো (১৮৯৬), দি ইনভিসিবল ম্যান (১৮৯৭), দি ওয়ার অব দি ওঅর্ল্ডস (১৮৯৮), ফার্স্ট মেন ইন দি মুন (১৯০১), দি ফুড অব দি গডস (১৯০৪), অ্যান ভেরোনিকা (১৯০৯), দি নিউ ম্যাকিয়াভেল্লি (১৯১১), মিঃ ব্রিট্‌লিং সিজ্ ইট থ্রু (১৯১৬) ইত্যাদি উপন্যাসের জন্য। অল্পবিত্তের পুত্র হয়েও, পড়াশুনায় ছিল তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ। এই ইচ্ছাশক্তির জোরেই তিনি লণ্ডনের নর্মাল স্কুল অব সায়েন্স থেকে বৃত্তিও পেলেন। কিন্তু প্রচণ্ড আর্থিক অনটন তাঁকে ডিগ্রি নিতে দিল না। উদ্বেগ ও অপুষ্টিতে তিনি যক্ষ্মা-রোগে পড়লেন। ওজন কমে দাঁড়াল ৯০ পাউণ্ডের কম। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস ও আগ্রহ তাঁকে কল্পবিজ্ঞানের পথে নিয়ে গেল। তবে প্রথম কটি লেখা দাঁড়াল নিছক অনুকরণ আর সাদামাঠা।

ইতিমধ্যে বিয়েও হয়ে গেল ইসাবেলের সঙ্গে। অশিক্ষিত আর ঝগড়াটে এই স্ত্রী তাঁর জীবনকে করে তুলল আরও বিষময়। কাকতালীয় যোগাযোগে ওয়েলসের এক ছাত্রী হয়তো তাঁর প্রতিভা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। তিনিই সব সময় প্রেরণা দিতে লাগলেন ওয়েলসকে। অবশেষে তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে ওয়েলস জন্ম দিলেন, 'দি টাইম মেশিন' বিয়ের এক বছরের মধ্যেই। বইটি প্রকাশ হবার সঙ্গে-সঙ্গে পালটে গেল তাঁর জীবন, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর খ্যাতি। আনন্দের ধাক্কায় সেই যে তাঁর লেখার গতি বাড়ল, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা থামেনি। বছরে একটা করে উপন্যাস তো লিখতে লাগলেনই, তার ওপর শুরু করলেন সাংবাদিকতা। ডিগ্রি পেলেন বিজ্ঞানে, গবেষণা করতে লাগলেন সমাজবিজ্ঞানের ওপর। তাঁর মননশীল প্রবন্ধগ্রন্থের কয়েকটি হচ্ছে 'দি আউটলাইন অব ওঅর্ল্ড হিস্ট্রি', 'দি সায়েন্স অব লাইফ' (১৯২৯), 'দি ওয়ার্ক ওয়েলথ অ্যাণ্ড হ্যাপিনেস অব ম্যানকাইণ্ড' (১৯৩২)।

জীবনের প্রথম বসন্তগুলো অশান্তিতে ভুগে বিশ্বশান্তির জন্যও তাঁর একটা ভূমিকা তৈরি হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময় স্ট্যালিন আর রুজভেল্টের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন মধ্যস্থতা করার জন্য, আত্মনিয়োগ করেছিলেন লিগ অব নেশন-এর শান্তিপ্রচারে আর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জন গলসওয়ার্দিকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লেখকদের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন—পেন। তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা ও জীবন - দর্শনভিত্তিক 'এক্সপেরিমেণ্ট ইন অটোবায়োগ্রাফি' ক্লাসিক পর্যায়ের সাহিত্য, যা মানুষকে প্রেরণা দেবে বহুকাল।

শিল্পীর কল্পনায় মহাকাশযান অবতরণ ক্ষেত্র। গ্রহ-গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার জন্য মহাকাশেই এই অবতরণ ক্ষেত্রগুলি স্থায়ীভাবে গড়া হবে ?

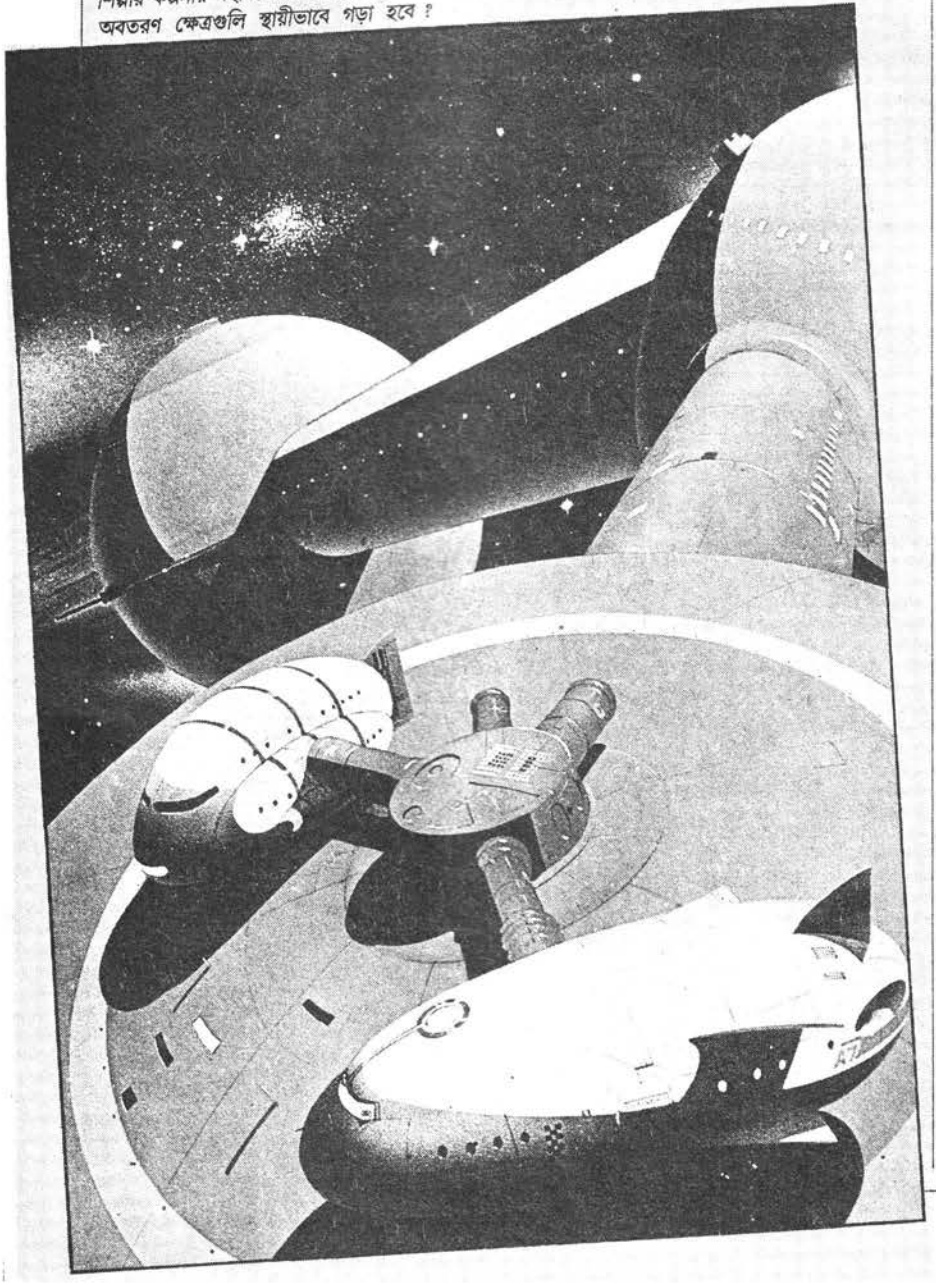

সকালটা শুরু হোক সুখে, তরতাজা স্বাদ নিয়ে মুখে

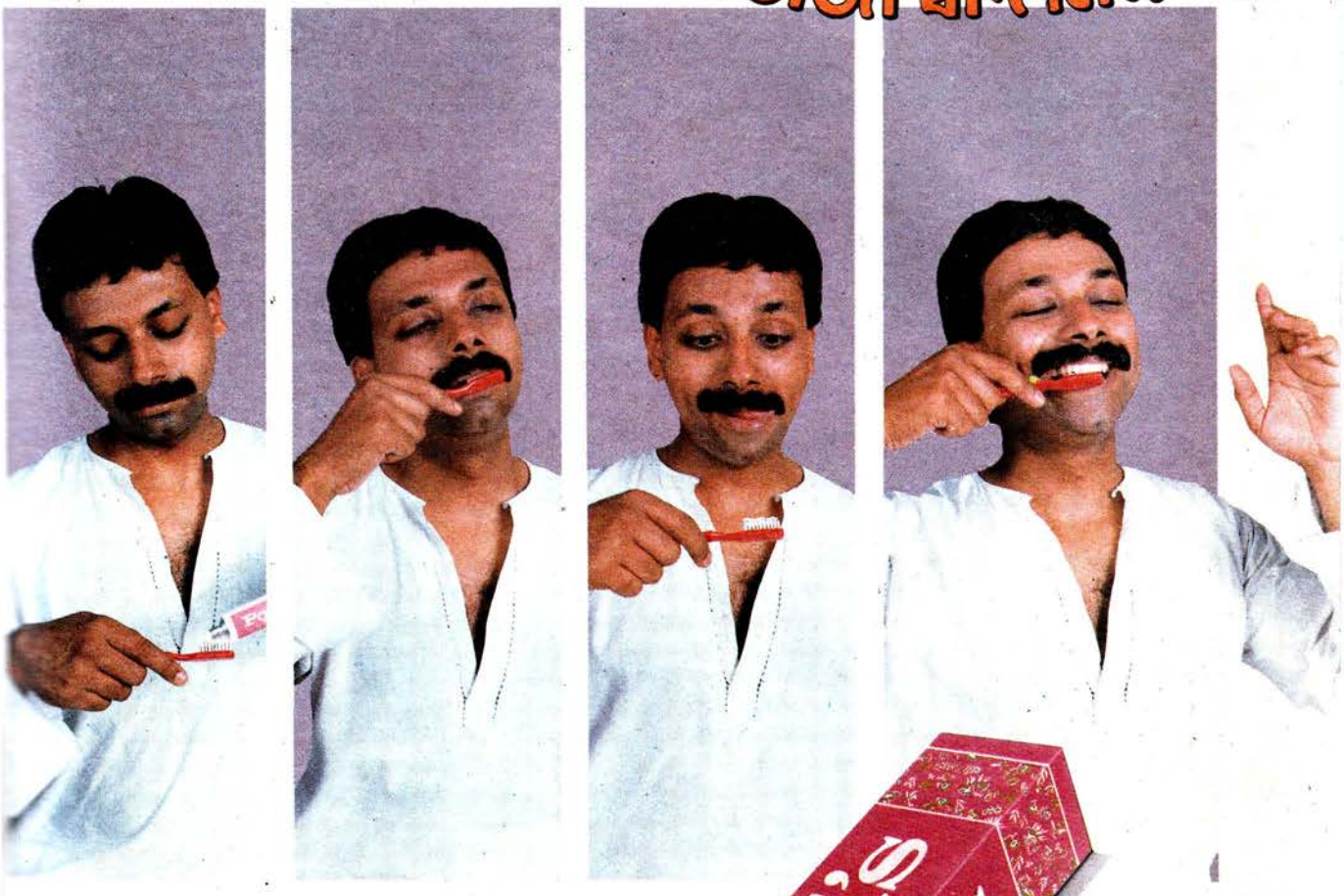

রমেন্ট ও স্পিয়ারমেন্ট
তরতাজা ঝরঝরে আমেজ।
ফর্মূলার দ্রুত-ছড়িয়ে পড়া
য় দাঁত ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার,
বাসে স্নিগ্ধ-সুগন্ধ।
পণ্ড'স টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত
তে বিরক্তি একেবারে নেই,
দারুণ মজা। দেখবেন,
র বাচ্চাদেরও এই টুথপেস্ট
দিয়ে দাঁত মাজতে খুব ভালো
লাগবে।

আজই নতুন পণ্ড'স
টুথপেস্ট কিনুন।
জীবনের প্রতিটি
সকাল হোক
সুন্দর,
সার্থক।

বিশেষ উপাদান থাকায় ফেনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। জোরালো ফেনায়...

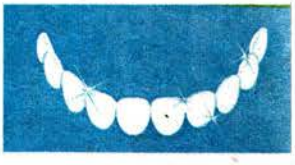

... খুব সহজেই দাঁতের ময়লা ও লুকোনো খাবারের টুক
সাফ করে দিয়ে দাঁতকে করে তোলে সুস্থ ও ঝলমলে।

নতুন
পন্ড'স
টুথপেস্ট

সুস্থ সবল করে দাঁত, সুরভিত তাজা নিঃশ্বাস

ঘনাদার চিংড়ি-বৃত্তান্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

"হয়তো !" হ্যাঁ, বাক্যটা ঘনাদার মুখ থেকেই উচ্চারিত হল। কিন্তু কেমন যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় ওই শব্দটুকু মুখ দিয়ে বার করেই গুম হয়ে গেলেন ঘনাদা। "কেন হয়তো ?"

কী হয়তো ? কেন হয়তো ? এমন অনেক প্রশ্নই তখন মনের মধ্যে তো বটেই, জিহ্বাগ্রেও যে এসেছিল, তা অস্বীকার করব না। কিন্তু ঘনাদার মুখ-চোখে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের ছায়া দেখে তা উচ্চারণ করতে আর সাহস করিনি।

ঘনাদার মুখ দেখে তাঁর মনের ভাব বুঝব, এত বড় ধুরন্ধর আমরা কেউ নই। তবু মনে হচ্ছিল একটা কী বিষয়ে তিনি যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে মনস্থির করতে পারছিলেন না।

তাঁর মনে যে অস্থিরতাটা, সেটা এক হিসেবে 'না' আর 'হ্যাঁ'-এর দ্বন্দ্বও হতে পারে।

'হয়তো' বলে তিনি যে একটা সম্ভাবনার আভাস দিচ্ছিলেন, সেটা আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি প্রকাশ করবেন কি না, এই নিয়েই তাঁর মনে বেশ প্রবল দ্বিধা ছিল বলে মনে হয়।

শেষ পর্যন্ত এ-দ্বিধার মীমাংসায় 'না'-র উপরে 'হ্যাঁ'-ই যে জয়ী হল, এ আমাদের ভাগ্য।

"হ্যাঁ।" মনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ঘনাদা তাঁর 'হয়তো'কে বিস্তারিত করে বললেন, "হয়তো সে ঠিক খবরই পাঠিয়েছিল। কিন্তু..."

'কিন্তু'র পর যে দীর্ঘ নীরবতা, সেটা প্রায় যন্ত্রণায় পৌঁছে দিয়ে ঘনাদা তাঁর বক্তব্যটা পেশ করলেন। বললেন, "কিন্তু 'কানুড়ি' থেকে ফাং-এ অনুবাদ করাতেই হয়তো ভুল হয়েছে। আর, তারপর 'হাউসা'য় তার 'কান'গুলো 'ধান' হয়ে সব এমন বরবাদ করে দিয়েছে যে, আমি সোজার বদলে উলটো খবরই পেয়েছি।"

মুখটা তাঁর পক্ষে যতখানি সম্ভব করুণ করে ঘনাদা চুপ করলেন।

কিন্তু আমরা যে তখন একেবারে অকূল পাথারে ! ঘনাদার প্রথম 'হয়তো'র পরেই যেটুকু ফাঁপরে পড়েছিলাম, 'ফাং' 'হাউসা' 'কানুড়ি'র জালে জড়িয়ে তা যে একেবারে গোলক-ধাঁধার ফাঁদ হয়ে উঠল।

কী বলছেন ঘনাদা ? মানে বলতে চাইছেন কী ?

সোজাসুজি সে-কথা যে জিজ্ঞেস করব, তার উপায় নেই। কারণ অমন বেয়াদপিতে উত্তর যা মিলবে, তাতে নখ কাটাতে গিয়ে আঙুল কাটিয়ে ফেলার ঝক্কি নেওয়া হবে।

তার চেয়ে ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করাই ভাল। নিজের পাকানো জট ঘনাদা সময়মতো নিজেই কি আর খুলবেন না ?

সেই ধৈর্য ধরেই থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অবুঝ গৌরটার জন্যে তা থাকা আর হল কই ?

"কী হাং-ফাং করছেন ?" ঘনাদাকে সে একটু গরম গলাতেই জিজ্ঞেস করে বসল, "হিং টিং ছটের মতো মন্তর-টন্তর নাকি ?"

"না, মন্তর-টন্তর নয় ?" ঘনাদার গলার ঝাঁঝটুকু আর লুকনো নেই এবার, "কিন্তু ওগুলো কী, বোঝাতে গেলে একটু ভূগোলের পরীক্ষা আগে নিতে হবে।"

"ভূগোলের পরীক্ষা ?" সভয়ে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, "কী পরীক্ষা ঘনাদা ?"

"না, এমন কিছু পরীক্ষা নয়," ঘনাদা আশ্বাস দিয়ে বললেন, "শুধু ক'টা অতি সোজা প্রশ্নের জবাব। যেমন, কোন্ দেশে একসঙ্গে আবলুস, সেগুন, মেহগনির সঙ্গে প্রচুর তাল-তমাল যেমন পাওয়া যায়, তেমনি প্রচুর পাওয়া যায় অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, টিন, বক্সাইড থেকে হিরে আর সোনা ?"

একটু থেমে আমাদের মুখের ভাবটা লক্ষ করে ঘনাদা এবার বললেন, "এসব যদি একটু কঠিন প্রশ্ন মনে হয়, তা হলে একটা মাত্র অতি সোজা প্রশ্ন করছি। যার উত্তর জানলে দেশটার নাম বলতে আর কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। প্রশ্নটা হল এই, কোন্ দেশে এই শতাব্দীর গোড়ায় ১৯০৯ আর ১৯২২-এ দু'বার এক আগ্নেয়গিরি থেকে দারুণ অগ্ন্যুদ্গার হয়েছে ?"

কী জবাব দেব এ-সব প্রশ্নের ?

ভ্যাবাচাকা ভাবটা কোনওরকমে লুকোবার চেষ্টা করে মাথা

চুলকোবার অভিনয়ই করছিলাম, তারই মধ্যে "শুনুন ঘনাদা," বলে গৌর হঠাৎ মুখ খোলায় সত্যিই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

ঘনাদা এমনিতেই খুব ভাল মেজাজে আছেন বলে মনে হচ্ছে না। তার ওপর বেয়াড়া কিছু বলে গৌর যদি তাঁকে গরম করে দেয়, তা হলে অন্তত আজকের দিনের মতো আমাদের বাহাত্তর নম্বরের মজলিস একেবারে মাটি।

কিন্তু ভয় যা করছিলাম, উলটোটাই তার হল।

জাতে পাগল হলেও গৌর যে তালে ঠিক, তা বোঝা গেল তার পরের কথায়!

বেয়াড়া কিছুর বদলে, গরম হওয়ার বদলে ঘনাদা তাতে গলে একেবারে জল।

কী এমন বললে গৌর, যাতে খোঁচানো সাপও ফণা তুলতে ভুলে যায়? কী সে মন্তর?

না, হাত কচলানো খোশামুদি গোছের কিছু নয়। বরং তাতে 'ফোঁস' করার ঝাঁঝই একটু আছে বলা যায়। কিন্তু কাজ হল ওই ফোঁসানির সুরেই।

মিষ্টি সুরে-টুরে নয়, গৌর ঘনাদার ওপর অভিমানেই নালিশ

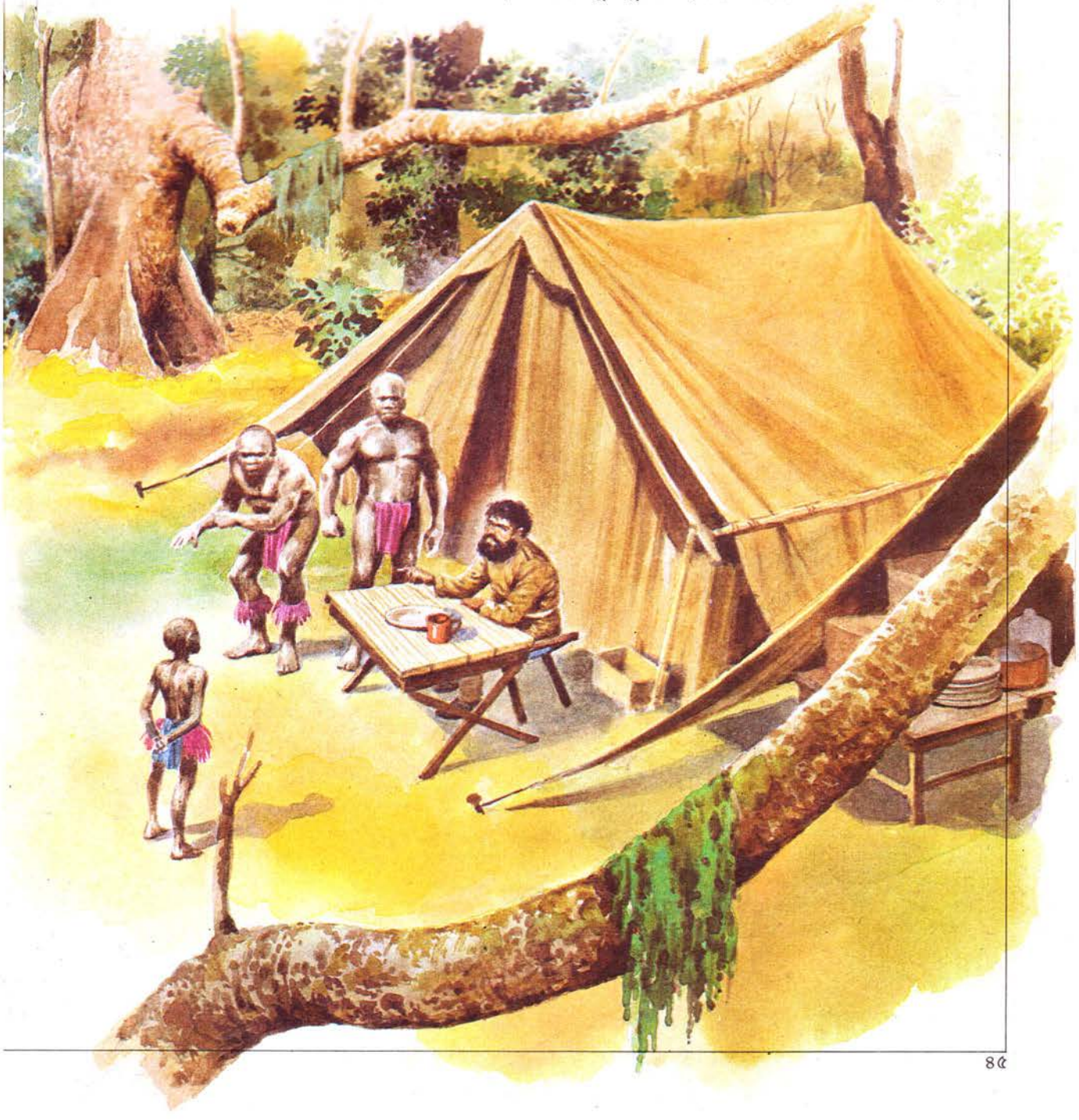

শিক্ষা থেকে জ্ঞান •••

আলো এল অবশেষে !

বিজলী বাতি আবিষ্কারের সঠিক কাল নির্ণয় অসম্ভব। অবিশ্যি আমাদের জানা আছে যে, ১৮৪৫ সালে সোয়ান নামে এক ইংরেজ যে পরীক্ষা শুরু করেন সেটাই বিজলী বাতির ইতিহাসের সূচনাপর্ব। সোয়ান নিজে মোটেই তা ধারণা করতে পারেননি। বাতির ভেতর থেকে বায়ু সম্পূর্ণ বার করে ফেলতে না পারলে আলো জ্বলবে না এই বদ্ধমূল ধারণার বশে তিনি পরীক্ষায় কিছুটা এগিয়ে ক্ষান্ত হলেন। অতঃপর ১৮৬৫ সালে জার্মান কেমিস্ট হার্মান স্পেংলার মার্কারি ভ্যাকুয়াম পাম্প আবিষ্কার করেন। এবার সোয়ান সমস্যার মধ্যে আশার আলো দেখলেন। এর ওপর ভিত্তি করে তিনি আবার পরীক্ষায় লেগে গেলেন এবং স্থূল গোছের এক বাতি উদ্ভাবনে সফল হলেন। ১৮৭৯ সালে সেটি প্রদর্শিত হল। এই ধরনের পরীক্ষায় কেবল ব্রতী হয়েছিলেন তা নয়, একেবারে নিরপেক্ষভাবে নিজস্ব ধরনের বাতি উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন টমাস এডিসন নামক এক আমেরিকান ১৮৭৮ সালে। দেখা গেল তাঁর উদ্ভাবিত ল্যাম্প সোয়ানের চেয়ে বেশি সফল, কেন না তাঁর বাতি জ্বলল ১৩$^{১}/_{২}$ ঘন্টা ধরে। ১৮৮১ সাল নাগাদ সোয়ান এবং এডিসন দুই বিজ্ঞানীই নিজ নিজ কারখানা খুললেন— একটি হল ইংলন্ডে অপরটি আমেরিকায়। ১৮৮৩ সালে অবশ্য দুজনে মিলে যুক্ত শক্তি লাগিয়ে **এডিসন অ্যান্ড সোয়ান ইলেকট্রিক লাইট কোম্পানি** গঠন করে বৃটেনে বাল্‌ব প্রস্তুত শুরু করলেন। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় গ্যাস ব্রাকেটের ওপর চড়ানো যে নতুন বাতি তৈরি হল তার সাফল্য হল বিপুল— প্রথম ১৫ মাসেই ৮০০০০ বাল্‌ব বিক্রি হয়েছিল।

এডিসনের আদ্যিকালের বাতি

আধুনিক কয়েলকরা কয়েল ল্যাম্প

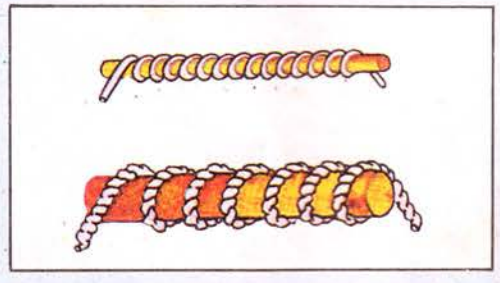

যাই হোক উন্নতির সম্ভাবনা সব সময়ই থেকে যায়। এরপর দরকার পড়ল আরো জোরালো সাদা আলোর বাল্‌বের। এটা তৈরি করতে হবে টাঙ্গস্টেন থেকে ; কিন্তু এই শক্ত পদার্থকে পাতলা ফিলামেন্টে রূপান্তরিত করা ছিল একটা দুরূহ ব্যাপার। ১৯০৮ সাল পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান হয়নি। অবশেষে ১৯০৮ সালে উইলিয়াম কুলিজ নামে এক আমেরিকান আবিষ্কার করলেন যে, টাঙ্গস্টেন পাউডার জমিয়ে বড় করা যায় এবং রডকে পিটিয়ে ফিলামেন্ট করা যায়। কিন্তু তাতেও সমস্যাটা থেকেই গেল। চড়া তাপে ফিলামেন্ট থেকে পরমাণু বাষ্প হয়ে গিয়ে বাল্‌বের দেওয়ালে জমতে লাগল, তাতে আলোর জোর কমে গেল। তা ছাড়া ক্রমাগত বাষ্প লাগার ফলে ফিলামেন্ট দুর্বল হয়ে পড়ল এবং খুব তাড়াতাড়ি জ্বলে যেতে লাগল। এরপর আরভিন ল্যাঙ্গমুর নামে আর একজন আমেরিকান কেমিস্ট আবিষ্কার করে দেখালেন যে, বাল্‌ব গ্যাস ভরে— প্রথমে নাইট্রোজেন, পরে আরগন ভরে এ কাজ চালানো যায়। ফলে বাষ্প ভরার পদ্ধতিতে ভাঁটা পড়ল। ওই বছরই তিনি নিয়ে এলেন কয়েল ফিলামেন্ট ল্যাম্প, কয়েলে জড়ানো টাঙ্গস্টেন। ১৯৩৪ সালে চূড়ান্ত উন্নয়নের দেখা পাওয়া গেল, আবিষ্কৃত হলো কয়েল ল্যাম্প— কয়েল নিজেই কয়েলকরার কাজ করতে শুরু করল।

ফ্লুওরেসেন্ট টিউব

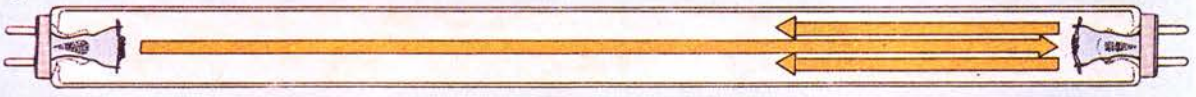

এদিকে জর্জ ক্লড নামে এক ফরাসী আলো জ্বালানোর জন্য যাতে আদৌ **ফিলামেন্টের দরকার হবে না** এমন উপায় বার করার সূক্ষ্মতর জটিল পদ্ধতি নিয়ে নাগাড়ে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। শেষে এক গ্যাসনিঅনের ভেতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত করে এই চেষ্টায় সফল হলেন— এতে আলো উজ্জ্বল লালে রূপ নিল। অন্যান্য গ্যাস অপরাপর রং ছড়াতে লাগল যথা মার্কারি বাষ্প নীলাভ আলো, সোডিয়াম বাষ্প হলুদ রং ইত্যাদি। মার্কারি বাষ্পের বাতিতে ফস্ফরাস নামক কেমিক্যালের প্রলেপ দিতে ব্যবহৃত ফস্ফরাসের রং ধারণ করে দৃষ্টি গোচর আলো আকার নিল। এখন, এই 'ফ্লুওরেসেন্ট বাতি' নামে পরিচিত এই বাতির সাহায্যে, **ইনক্যানডিসেন্ট লাইটের প্রায় চারগুণ আলো** সম্ভবপর হল। নতুন এই বর্ণ-বৈচিত্র্যময় আলোর জগতে উজ্জ্বল বিজ্ঞাপন এবং রাতে খেলাধুলোও দিব্যি চলছে। মানুষ এখন আলোক যুগের বাসিন্দা।

Crompton Greaves LIMITED — *তরুণ মন আলোকিত করতে ব্রতী*

জানিয়ে বললে, "অত ভূগোলের পরীক্ষা যদি দিতে হয়, তা হলে পি· আর· এস·, পিএইচ· ডি· ডিগ্রির পিছনেই তো ছুটলে পারি ! তার বদলে এই বাহাত্তর নম্বরে আপনার মুখ চেয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকব কেন ? মোড়ের দোকানে এক চেঙারি হিঙের কচুরির অর্ডার দিয়ে এসেছি। বনোয়ারি তা নিয়ে নীচের গেটের মুখেই বোধহয় পৌঁছে গেছে। রামভুজের সেগুলো প্লেটে-প্লেটে সাজিয়ে পাঠাতে যা দেরি। কিন্তু এখন আর কী হবে তাতে, সব ঘাস লাগবে মুখে, হ্যাঁ, ঘাস।"

গৌর চুপ করল এমন একটা হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে, আমাদেরই দু'চোখের পাতাগুলো কেমন যেন একটু ভিজে-ভিজে হয়েছে মনে হল।

ঘনাদারও তা-ই হল কি না জানি না। কিন্তু তাঁর গলায় এবার যে সুরটা শোনা গেল, সেটা স্পষ্টই সান্ত্বনার।

"আহা ! হিঙের কচুরি ঘাস হতে যাবে কেন ?" তিনি আশ্বাস দিলেন, "এই আমাদের মোড়ের জহর হালুইকরের হিঙের কচুরি তো ? ও আজ বিকেলে আনিয়ে কাল সকালে মুখে দিলেও মুচমুচে থাকে। তবে···"

ঘনাদার হিঙের কচুরির কৌলীন্য-বিচার আর হল না। বিরাট ট্রে'র ওপর কচুরি-সাজানো প্লেট নিয়ে বনোয়ারি তখন আড্ডা-ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকল। সে ঢোকার আগেই তার ট্রে'র ওপরকার প্লেটে সাজানো কচুরির গন্ধেই অবশ্য আড্ডা-ঘর মাত হয়ে গেছে।

॥ দুই ॥

বনোয়ারি তাঁর হাতেই প্রথম যে প্লেটটা তুলে দিল, তার ডবল সাইজের কচুরির তাক যে প্লেটের ওপর প্যাগোডার মতো, তা বোধহয় আর বলতে হবে না।

সেদিকে চেয়ে অন্তরের খুশিটা অকপট উচ্ছ্বাসে প্রকাশ করেই ঘনাদা বললেন, "হিঙের কচুরি কী হে, এ তো রাধা-চুরি ! মানে রাধাবল্লভী আর কচুরির দ্বন্দ্ব-সমাস। তা বড় বেশি দিলে যে ! এত কি আর এ-বয়সে শেষ করতে পারব ?"

"খুব পারবেন, খুব পারবেন," সবাই আমরা জোর গলায় আশ্বাস দিলাম, "বয়স আপনার আর কি, চল্লিশই তো পার হয়নি।"

"চল্লিশ···! বলো কী হে !" ঘনাদা বিষম খাওয়াটা কোনওরকমে সামলে বললেন, "আমার চল্লিশ···"

"মানে ?" চটপট বাধা দিয়ে বললাম, "চল্লিশে পৌঁছে ঠেকে গেছে আর কি ! পার হতে তো পারছে না ! তাই বলছি--"

তাই আর কিছু বলতে হল না। যে-কারণেই হোক, ঘনাদা একটু বেশিরকম খুশি হয়ে তাঁর প্লেটের রাধা-চুরি প্যাগোডার ওপর চুড়ো হিসেবে আরও দুটো শেষ করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে শিশিরের এগিয়ে ও জ্বালিয়ে দেওয়া সিগারেটটায় ক'টা সুখটান দিয়ে যেন ধাতস্থ হয়ে, প্রায় মেজাজের অসীম প্রসন্নতার পরিচয় দিয়ে নিজে থেকেই গোড়ায় ধরা প্রসঙ্গটা স্মরণ করে বললেন, "হ্যাঁ, ভূগোল শেখায় তোমাদের আপত্তি জানাচ্ছিলে, না ? কিন্তু ভূগোলের প্রশ্ন কেন তুলেছিলাম জানো ? তুলেছিলাম, যা বলতে যাচ্ছি, ভূগোল কিছুটা না-জানা থাকলে তার রহস্যটাই ঠিক বোঝানো যাবে না। ভূগোলের ক'টা সোজা প্রশ্ন মাত্র তোমাদের করেছি। প্রশ্ন আর-দুটো বেশি করলে হয়তো উত্তরটার আভাস তোমরাও পেতে। এই যেমন যে ক'টা প্রশ্ন করেছি তার ওপর যদি জানতে চাইতাম, কোন্ দেশে, কোথায় গোরিলাও যেমন, সিংহও তেমনি পাওয়া যায়, তা হলে তোমরা চটপট উত্তর দিতে—আফ্রিকা। কিন্তু আফ্রিকা তো একটা বিরাট মহাদেশ। শুধু আফ্রিকা বললেই তো হবে না, আফ্রিকার কোথায়, বোঝানো যাবে না। সুতরাং শুধু আফ্রিকা বললেই হবে না, আফ্রিকার কোথায়, সেটা সঠিক জানা চাই।

"সঠিক জায়গাটা এখনও হয়তো ধরতে পারোনি বলেই বলে দিচ্ছি জায়গাটা। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে এমন একটা অঞ্চল, যার বর্ণনা দেওয়া খুবই শক্ত। গাছপালা আর ধাতু-সম্পদের কথা আগে আমার প্রশ্নে যা বলেছি, তাতেই বোঝা যাবে যে, জায়গাটার বৈচিত্র্যের শেষ নেই। দেড়শো থেকে দু'শো ফুট উঁচু গাছের ঘন জঙ্গল যেমন আছে, তেমনি আছে শুধু কাঁটাঝোপের বিস্তীর্ণ আধা-মরু অঞ্চল। একদিকে গোরিলা শিম্পাঞ্জিদের যেমন দেখা মেলে, তেমনি দেখা যায় উটপাখির পাল।

"আর বেশি বর্ণনা দিতে গেলে রাত কেটে যাবে। তাই জায়গাটার নামটা বলেই ফেলি। নাম হল 'ক্যামেরুনস'। বর্ণনা আগে যেটুকু দিয়েছি, তার ওপরে বলতে পারি যে, যেমন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে তেমনি ইতিহাসের চমক দেওয়া কিছু ঘটনার বিশেষত্বে আফ্রিকার এই উত্তর-পশ্চিম কোণের ভূখণ্ডটির একটা নিজস্ব মূল্য আছে।

"ক্যামেরুনসের উত্তর-পশ্চিমে পোর্তুগিজরা প্রায় চারশো বছর আগে সমুদ্র-কূলে যেখানে নামে, সেখানকার একটি নদীকে তারা 'চিংড়ির নদী' নাম দিয়েছিল। ১৯১৯-এর এক শীতের মরসুমে একদিন সেখানে এক বুনো চেহারার সাহেবকে নিয়ে এই কাহিনী শুরু করতে হয়। সাহেবের চেহারাটা বুনো হলেও পোশাক-আশাক চালচলন সব একেবারে বাদশাহি মেজাজের। মাথায় ঝাঁকড়া চুলের একটা বোঝা, আর মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল বাদে মানুষটার সবকিছুই ভদ্র, ফিটফাট আর মানানসই। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল আর মাথায় জট-পাকানো চুলের ঝোপ। সেটা তাঁর মুখের কোনও কাটা ঘায়ের দাগ-টাগ ঢাকা দেওয়ার ফিকির হতে পারে।

"মানুষটা চিংড়ি নদীর ধারে একটা বড় গঞ্জের পাশে একটা মস্ত বাহারি তাঁবু পেতে সেখানে ডেরা বেঁধেছেন। এর মধ্যে ওখানকার কাফরি গাঁয়ের সর্দারকে নিজের তাঁবুতে নেমন্তন্ন করে খানাপিনায় আপ্যায়িতও করেছেন বারকয়েক।

"তাঁর মতলবও কিছু লুকোবার নেই। এখানে এসে ডেরা বাঁধবার পরেই তিনি এ-তল্লাটের যে দুই যমজ ঘটোৎকচের মতো দৈত্যাকার বাণ্টুকে তাঁর কাজে লাগিয়েছেন,- তারাই সাহেবের পরিচয় দিয়ে শতমুখে তার প্রশংসা করে তার এ-মুলুকে আসার উদ্দেশ্য সকলকে জানিয়েছে।

"তাদের কাছে জানা গিয়েছে, সাহেবের নিজের দেশ হল বিলেত। নাম তাঁর ডাঃ লক। অজানা দেশে পাড়ি দিয়ে

সেখানকার অজানা সব রহস্য খুঁজে বার করে তার যতটা সম্ভব খবরাখবর বার করাই তাঁর কাজ। এ-কাজে ডাঃ লক দুনিয়ার অনেক জায়গায় বহু বিপদের ঝক্কি মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর মাথা ও মুখের বুনো চেহারার আসল কারণ এমনি এক দারুণ আচমকা বিপদে পড়া। সে-বিপদে তাঁর মুখের ও মাথার চামড়া অনেকখানি পুড়ে সাদা হয়ে যায়। কোনওরকমে শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচলেও বীভৎস চেহারার লজ্জায় তিনি আর পোড়া মুখ কাউকে না দেখাবার জন্যে মুখ ও মাথায় অমন জঙ্গল বানিয়ে রেখেছেন।

"এখন এই চিংড়ি নদীর মোহানায় তাঁর আস্তানা পাতবার কারণ কিন্তু তাঁর সেই অজানা দেশের রহস্য জানবার নেশা। এই ক্যামেরুনসের ভেতরে এক জায়গায় যে এক দারুণ আগ্নেয়গিরি আছে, তা সবাই জানে! মাঝে-মাঝে বহু বছর অন্তর সেই আগ্নেয়গিরি খেপে উঠে আগুন উগরে তুলে ছড়ালেও তার সঠিক হদিস সভ্য জগতের কেউ এখনও জানে না। ডাঃ লক সেই রহস্য সন্ধানের অভিযানে যাবার জন্যে পথের দিশারি হবার মতো একজন ও অঞ্চলের সেথো চান। তাঁর দুই যমজ ঘটোৎকচের মতো পাহারাদারকে তিনি সেই খোঁজেই লাগিয়ে রেখেছেন। এই যমজ দানবদের পাহারাদারের কাজে নেওয়ার একটা বিশেষ কারণ আছে। ডাঃ লকের কে একজন নাকি পরম শত্রু তাঁর সুনামের হিংসায় বহুকাল থেকে তাঁর পেছনে লুকিয়ে লেগে থেকে হয় তাঁর আবিষ্কারের গৌরব চুরি করে নিজের বলে প্রচার করতে, নয় সেটা সম্ভব না হলে তাঁর বড় রকমের কোনও ক্ষতি করবার চেষ্টা করে আসছে। তার বিরুদ্ধে পাহারা দেবার জন্যেই ডাঃ লক এবার একজন নয়, গোধা আর লোধা নামে দুই যমজ ঘটোৎকচ ভাইকে নিজের কাজে লাগিয়েছেন।

"গোধা আর লোধা শুধু শরীরের ক্ষমতাতেই দুর্দান্ত দানব নয়, তারা কাজের লোকও বটে।

"লক-সাহেব চিংড়ি নদীর ধারে দিন-পাঁচেক তাঁবু ফেলবার পরেই তারা একজনকে জোগাড় করে আনে গঞ্জের এক বাজার থেকে।

তাকে দেখে ডাঃ লক হেসেই খুন।

"'আরে এ কাকে এনেছিস?' হাসতে হাসতে ডাঃ লক জিজ্ঞেস করেন গোধা-লোধাদের, 'এ চিমসে শুঁটকোটা তো তোদের চিংড়ি নদীর সত্যিকারের একটা কুচোচিংড়ি।'

"ডাঃ লকের কথায় লজ্জা পেলেও লোধা-গোধা নিজেদের একটু কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করে বলে, 'আজ্ঞে, আপনি মিছে ঠাট্টা করছেন কেন? ও চিমসে চিংড়ি হলে আমাদের লোকসানটা কী? ওকে তো আর কুস্তি লড়তে হবে না। শুধু আমাদের পথ দেখিয়ে যেখানে যেতে চান সেখানে নিয়ে যাবে।'

"লোধা-গোধার যুক্তিটা যে ঠিক, ডাঃ লককে এবার তা স্বীকার করতে হয়। তিনি তাই হাসি থামিয়ে একটু ভাবনার সঙ্গেই জিজ্ঞেস করেন, 'কিন্তু ওকে যা ঠাট্টা-অপমান করলাম, এর জন্যে ও আর আমার কাজ করতে চাইবে কি?'

"'খুব চাইবে, খুব চাইবে,' আশ্বাস দিয়ে বলে লোধা-গোধা, 'দেখতে পাচ্ছেন না, কেমন অবাক হয়ে হাঁ করে তাঁবুর সব জিনিসপত্র দেখছে। ও আমাদের কথা কিছু বুঝেছে কি যে, ঠাট্টা-অপমানে রাগ করবে?'

"'কিছু বোঝেনি মানে?' ডাঃ লক বেশ ভয় পেয়েই জানতে চান, 'ও কি বদ্ধ কালা-টালা নাকি? তা হলে...'

"'না, না, কালা হবে কেন?' লোধা-গোধা এবার বুঝিয়ে দেয় ডাঃ লককে, 'আমরা তো বান্টুতে কথা বলেছি, ও তার কী বুঝবে?'

"'বুঝবে না কী রকম?' ডাঃ লককে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতে হয়, 'ও কি বান্টু জানে না?'

"'এক বর্ণও না,' লোধা-গোধা জানায়, 'বান্টু কেন, ওর নিজের ভাষা কানুড়ি ছাড়া হাউসা, ফুলানি, ফাং কিছুই জানে না।'

"'ঠিক, ঠিক,' ডাঃ লক খুশি-মুখে এবার বলেন, 'নিজের ভাষা ছাড়া আর কিছু জানে না, এমন লোকই আমাদের সবচেয়ে দরকার। আজই ওকে কাজে নাও।'

"তাই নেওয়া হল সেই দিনই। কাজে নেবার সময় নামটা নিয়ে শুধু একটু গোল বেধেছিল।

"খাতায় লেখার জন্যে তো বটেই, তাকে ডাকবার জন্যেও একটা নাম তো দরকার। কিন্তু নিজের কোনও নামই সে বলতে পারে না। সে যেখানে থাকে সেখানে গোনাগুনতি ক'টা তার মতো জংলির মধ্যে ডাকাডাকির কোনও দরকারই নাকি হয় না। হলেও তারা 'এই' 'ওই' বলে ডেকেই তাদের কাজ সারে।

"কিন্তু সেখানকার নিয়ম এখানে চলে না। নাম তো একটা দরকার। শেষকালে জংলিটা নিজেই বললে, এই কার্মার্দে মানে চিংড়ি নদীর মোহানাতেই যখন সে প্রথম কাজ পেয়েছে তখন তার নাম চিংড়িই রাখা হোক।

"ডাঃ লক খুশি হয়ে বলেছেন, 'ঠিক ঠিক। ওর যা চিমসে কুচোচিংড়ির মতো চেহারা, তাতে ওই নামই ওর ভাল।' মানুষটা জংলি হলেও তার মাথাটা একেবারে নিরেট নয় দেখেও তিনি খুশি হয়েছেন।

"চিংড়িটাকে প্রথমে তার কাজ বুঝিয়ে দেওয়া একটু শক্ত হয়েছে। বুদ্ধিশুদ্ধি নিরেট না হলেও লোকটা একেবারে জংলি। সাহেবসুবো তো দূরের কথা, সাধারণ একটু ভাল অবস্থার গৃহস্থ বান্টু কি হাউসাদের ঘরদোরের খবরও জানে না।

"ডাঃ লকের তাঁবুতে বেশি কিছু দামি ও বিদেশী আসবাব না থাকলেও, তাঁর কাজের জন্যে যা দরকার সেরকম কিছু যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ছিল। তাঁর তাঁবু ঝাড়পোঁছ করবার সময় ডাঃ লক সেগুলো সম্বন্ধে তাকে হুঁশিয়ার হওয়ার নির্দেশ দিতে বলেছিলেন তাঁর খাস-পাহারাদার লোধা আর গোধাকে। তাই দিতে গিয়ে প্রায় কেলেঙ্কারি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

"জরিপ-টরিপের জন্য দরকারি যন্ত্রপাতি ছাড়া ডাঃ লক তাঁর কাজের সুবিধের জন্য একটা টেপরেকর্ডার তাঁর সঙ্গে রেখেছিলেন। তিনি যে-ধরনের অভিযানে এসেছেন, তার প্রাত্যহিক বিবরণ রাখা একান্ত দরকার। একালে সে-বিবরণ হাতে লেখার তো কথাই আসে না। টাইপ করার জন্যে সঙ্গে টাইপরাইটার রাখাও একটা বাড়তি বেয়াড়া বোঝা বওয়া। ডাঃ লক তাই একটা ছোট টেপরেকর্ডার সঙ্গে নিয়েছিলেন, যাতে তাঁর

অভিযানের প্রতিদিনের বিবরণ তিনি মুখে বলে টেপ-এ ধরে রাখতেন।

"সেই যন্ত্রটা নিয়েই গণ্ডগোল বেধেছিল প্রথমে। পরে সাফসুফ করার সময় ও যন্ত্রে হাত না দিতে বলার জন্যে রেকর্ডারটা একটু চালিয়ে দেখাতে যেতেই হাউমাউ করে চিৎকার করে পড়ি কি মরি অবস্থায় চিংড়ি তো তাঁবুর বাইরে দে ছুট। সে তখন এই ভুতুড়ে তাঁবুর কাজ ছেড়ে দিতে চায়। লোধা-গোধাকে তারপর অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে তাঁবুতে ফেরাতে হয়েছে।

"এরপর আর বিশেষ গোলমাল-টোলমাল হয়নি। যে-কাজের জন্যে তাকে নেওয়া, সে-কাজে চিংড়ি বাহাদুরিই দেখিয়েছে দিন কয়েকের মধ্যে। ক্যামেরুনসের এই অঞ্চল প্রায় অজানা জঙ্গল-পাহাড়, আবার আধা-মরুর দেশ। বুনো মোষ, হাতি, গণ্ডার, সিংহ থেকে হিংস্র জংলি আদিবাসীদের এড়িয়ে সেখানে প্রতি পদে প্রাণ হাতে নিয়ে টহল দিতে হয়। এ-কাজে চিংড়ি কিন্তু দারুণ বাহাদুর। ডাঃ লক ক্যামেরুনসের ভিতরের দিকে চাড হ্রদের কাছে এক আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি অঞ্চলেই যেতে চান। প্রায় চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু সেই আগ্নেয়গিরি নয়, তার কাছাকাছি 'নিশ' নামে এক হ্রদই তাঁর লক্ষ্য।

"পদে-পদে যেখানে বিপদ, সেই সম্পূর্ণ অজানা, অতি দুর্গম দেশে চিংড়ি কিন্তু কোন্ অদ্ভুত ক্ষমতায় সবচেয়ে নিরাপদে আর তাড়াতাড়ি লক্ষ্যের দিকে পৌঁছচ্ছে বোঝা গেল।

"এদিক দিয়ে পুরোপুরি খুশি হবার কারণ থাকলেও, ডাঃ লক তখন কিন্তু দারুণ ভয় আর দুর্ভাবনায় পড়েছেন। তাঁর যে দুশমনের ভয়ে লোধা-গোধার মতো দুই যমজ ঘটোৎকচকে তিনি পাহারায় নিয়েছেন, তার হাত থেকে তিনি যে রেহাই পাননি, তা তিনি এই অভিযানে চিংড়ি নদীর মোহানা থেকে রওনা হবার ক'দিন পরেই টের পেলেন।

"সে দুশমন যে তাঁর সঙ্গেই আছে তার প্রথম প্রমাণ যা পাওয়া গেল, তা খানিকটা যেন ঠাট্টার মতো ব্যাপার। অভিযানের বিবরণ টেপরেকর্ডারে তুলে রাখলেও পথের হদিস ধরে রাখবার জন্য ডাঃ লক খুব সংক্ষেপে একটা মানচিত্রের খসড়া লিখে আর এঁকে রাখতেন। সেই খসড়া ম্যাপের উপর একদিন হঠাৎ কিছু হিজিবিজি কাটা দেখা গেল।

"সেই হিজিবিজি কাটাকুটিতে ভাবনার খুব বেশি কিছু ছিল না। চিংড়িই হয়তো তাঁবুর ঝাড়পোঁছ করবার সময় অসাবধানে বা জংলি খেয়ালে তাতে অমন দাগ কেটে থাকতে পারত, কিন্তু সেই হিজিবিজির পাশে স্পষ্ট অক্ষরে যা লেখা, সেটাই তো অবিশ্বাস্য একটা রহস্য।

"হিজিবিজির আগে পাশে গোটা-গোটা হরফে স্প্যানিশে লেখা 'ট কোয়ে তাল আমিগো ?'

"ডাঃ লক স্প্যানিশ না জানলেও ও ক'টা কথার মানে জানেন। ও কথাগুলোর মানে হল, 'কেমন আছ বন্ধু ?'

"এই অজানা বিদেশে এক গোপন অভিযানে এতদূর আসবার পরে তাঁর দুই যমজ দানব আর এক জংলি নফরের পাহারা দেওয়া তাঁবুতে ঢুকে এ-কাজ কার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হতে পারে ?

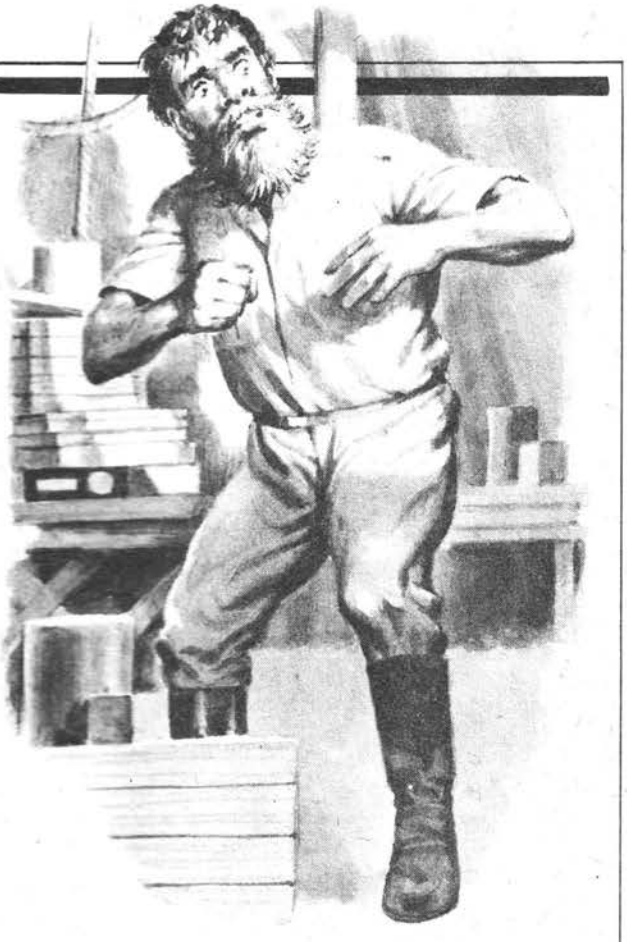

"সম্পূর্ণ ভৌতিক ছাড়া ব্যাপারটার তো আর কোনও ব্যাখ্যা হয় না।

"অত্যন্ত অস্থির হলেও ব্যাপারটা নিয়ে হইচই না করে ডাঃ লক রহস্যটা বুঝবার জন্যে কিছুদিন নিঃশব্দে সজাগ থাকবেন বলে ঠিক করলেন।

"কিন্তু তার ফল যা হল, তাতেই তাঁর হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম।"

॥ তিন ॥

গল্প বলতে-বলতে চুপ করে গেলেন ঘনাদা। কী হল ? কেন আর তিনি মুখ খুলছেন না ? কেন যে খুলছেন না, শেষ পর্যন্ত শিশিরই সেটা বুঝতে পেরে এগিয়ে দিল তার সিগারেটের টিন। ঘনাদা তার থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ফের শুরু করলেন তাঁর গল্প।

"যেমন তাঁর নিয়ম, তেমনি সেদিন সকালের খাওয়া-দাওয়ার পর ডাঃ লক তাঁর টেপরেকর্ডারটা নিয়ে তাঁর অভিযানের আগের দিনের বিবরণ রেকর্ড করবার ব্যবস্থা করছিলেন।

"কিন্তু যন্ত্রটা দেখেই তো তাঁর চক্ষুঃস্থির।

"তাঁর আগে কেউ যে সেটা ব্যবহার করেছে, তার স্পষ্ট চিহ্ন সেখানে রয়েছে।

"সেটা নিয়ে যে নাড়াচাড়া করা হয়েছে তা লুকোবার কোনও চেষ্টাই করা হয়নি। যেখানে যন্ত্রটা থাকে, তার বদলে টেবিলের অন্য একধারে অগোছালো কাগজপত্রের মধ্যে এমনভাবে সেটা

ফেলে রাখা হয়েছে, যাতে ওখানে যে অন্য কারও হাত পড়েছে, তা বুঝতে কোনও কষ্ট না হয়।

"এরপর যন্ত্রটা চালাতে যা শোনা গেল, তাতে ভাবনায়, আতঙ্কে হাত-পা ঠাণ্ডা হবার জোগাড়। স্পষ্ট জার্মান ভাষায় সেখান থেকে তখন শোনা যাচ্ছে, 'আমি তোমার সঙ্গে আছি ডাঃ লক। আর লক, তোমার আসল নাম যে ব্রুল, তা আমার জানা!'

"টেপরেকর্ডারের কথা ওইটুকুতেই শেষ হয়েছে। কিন্তু যেটুকু ওখানে আছে তাই শুনেই ডাঃ লক তখন চোখে অন্ধকার দেখছেন বলা চলে। প্রথমত, নিজের ঠিকমতো হুঁশ আছে কি না সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল। সত্যিই, নেহাত স্বপ্নে ছাড়া এরকম ব্যাপার ঘটা কি সম্ভব? মনের সংশয় কাটাবার জন্যে টেপরেকর্ডারটা একবারের জায়গায় ডাঃ লক বারবার, অন্তত দশবার, চালিয়ে দেখলেন।

"না, তাঁর মনের ভুল নয়। সত্যিই কে একজন স্পষ্ট চলিত জার্মান ভাষায় ওই ক'টা কথা সেখানে রেকর্ড করিয়ে রেখেছে।

"কিন্তু কার দ্বারা, কেমন করে তা সম্ভব? এ-কাজ যে করেছে, তার তো এই অভিযানের সঙ্গেই থাকা দরকার। যে দুর্গম অজানা সব অঞ্চলের ভিতর দিয়ে চিংড়ি তাঁদের নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কারও অজান্তে তাঁর দলের রাস্তা ধরেই লুকিয়ে সঙ্গে থাকা প্রায় অসম্ভব।

"আর তা-ও যদি সম্ভব হয়, তা হলেও তাঁবুর ভেতর কখন কীভাবে ঢুকে সে এ-কাজ করবে? তাঁবুর মধ্যে তিনি নিজে অধিকাংশ সময় থাকেনই। আর তা ছাড়া লোধা-গোধা দু'জনেই সারাক্ষণ থাকে কড়া পাহারায়। চিংড়ির কথা ধরবারই নয়। তবু তাকেও বাদ না দিয়ে ডাঃ লক লোধা-গোধার সঙ্গে তাকে ডেকে অত্যন্ত কড়া ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

"লোধা-গোধা দু'জনেই তো ডাঃ লকের জেরা শুনে একেবারে হতভম্ব। এই সফরে তাদের সঙ্গে লুকিয়ে আসা কেমন করে সম্ভব?

"আর যদিও লুকিয়েচুরিয়ে কেউ তাদের কাছাকাছি আসতে পেরে থাকে, এ-তাঁবুর ভিতরে ঢুকে সাহেবের যন্ত্রপাতি ছোঁবার সময়-সুযোগ সে পাবে কী করে?

"লোধা-গোধার কাছে এর চেয়ে এ-রহস্যের হদিস পাবার মতো উত্তর লক আশা করেননি। তবু তাদের তিনি হয়রান করে মেরেছেন। সম্ভব-অসম্ভব হাজার রকম প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই বিদায় দিতে হয়েছে তাদের।

"লোধা-গোধার পর এ-ব্যাপারে হদিস পেতে জংলি চিংড়িকে ডাকার কোনও মানে হয় না।

"তবু কোনও দিকে ত্রুটি রাখবেন না বলে লক লোধা-গোধাকে দিয়ে তাকেও ডাকিয়ে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে চিংড়ির ভাষা কানুড়িতে তাকে জেরার ব্যবস্থা করেছেন। সে-জেরায় প্রথম প্রশ্নের উত্তরে চিংড়ির কথা শুনে কিন্তু তিনি থ। লকের হুকুমে লোধা-গোধা চিংড়িকে কানুড়িতে জিজ্ঞেস করেছিল, সে এ-তাঁবুতে কাজ করবার সময় আর কাউকে কখনও দেখেছে কি না।

"চিংড়ি তাতে যা উত্তর দিয়েছে তা শুনে একেবারে থ হয়ে লোধা-গোধা সেটা অনুবাদ করে লক-সাহেবকে বুঝিয়ে দিতেই গেছে ভুলে।

"লক তাদের হতভম্ব ভাব দেখে ধমক দিয়ে ওঠার পর তারা থতমত খেয়ে চিংড়ি যা বলেছে তা জানিয়েছে।

"চিংড়ি যা জানিয়েছে, তাতে তাদের হতভম্ব হবারই কথা অবশ্য। চিংড়ি বলেছে, সে নাকি তাঁবুতে রোজই আর-একজনকে দ্যাখে।

"'রোজই আর-একজনকে দ্যাখে? কখন?' লক লোধা-গোধাকে দিয়ে জিজ্ঞেস করিয়েছেন।

"'কখন আবার?' চিংড়ি জানিয়েছে, যতক্ষণ সে এ-তাঁবুতে থাকে, সারাক্ষণই।

"'সারাক্ষণই?' লোধা-গোধার মারফত কথাটা শুনে কী মনে করবেন ভেবে না পেয়ে লক রাগে দাঁত খিচিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কোথায়? এ-তাঁবুর কোথায়, কোন্‌খানে?'

"লোধা-গোধার কাছে প্রশ্নটা শুনে নির্বিকারভাবে চিংড়ি যা দেখিয়ে দিয়েছে, তাতে হাসবেন না জ্বলে উঠবেন ডাঃ লক তা ঠিক করতে পারেননি।

"চিংড়ি যা দেখিয়ে দিয়েছে সেটা তাঁবুর এক ধারে লকের চুল আঁচড়ানো, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম রাখার জন্য টেবিলের ওপর ঝোলানো একটা আয়না।

"জংলিটাকে তখনকার মতো হাসতে-হাসতে তাঁবু থেকে দূর করে দিলেও ব্যাপারটা নিয়ে লকের দুর্ভাবনা ক্রমশ চরমে উঠেছে।

"চিংড়ির দেখিয়ে দেওয়া পথ ধরে তখন তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গেছেন।

"কাঁটাঝোপের আধা-মরু পাথুরে ডাঙা পার হয়ে যেতে-যেতে মাঝে-মাঝে ছোটখাটো হ্রদ আর শুকনো গভীর খাদ তাঁদের পথে পড়েছে। দূরে একটা আকাশ-ছোঁয়া যে পাহাড়ের চূড়া তাঁদের চোখে পড়েছে, সেটা ক্যামেরুনসের আগ্নেয়গিরি ছাড়া আর কিছু নয় বলে বুঝেছেন লক।

"কিন্তু এই সময়ে এমন কিছু হয়েছে, যাতে তাঁর মাথা ঠাণ্ডা রাখাই শক্ত হয়ে পড়েছে। ব্যাপার যা ঘটেছে তা লকের টেপরেকর্ডারটা সম্পর্কেই।

"প্রথম সেখানে অজানা ভুতুড়ে কণ্ঠ শোনার পর বেশ কিছুদিন আর কিছু হয়নি। ক্যামেরুনসের আগ্নেয়গিরি দেখার পরই একদিন সকালে টেপরেকর্ডারে আবার সেই ভুতুড়ে গলা হঠাৎ সোচ্চার হয়ে উঠেছে, 'শোনো, শোনো ব্রুল,' টেপরেকর্ডার থেকে পরিষ্কার জার্মান ভাষায় শোনা গেছে, 'যেখানে তুমি চেয়েছিলে সেখানে তুমি প্রায় পৌঁছে গেছ বললেই হয়। আর-একদিন কি একবেলা গেলেই নিয়ল হ্রদের কাছাকাছি তুমি পৌঁছে যাবে। কিন্তু নিয়ল হ্রদ কি ক্যামেরুনসের আগ্নেয়গিরি তো সত্যিই তোমার লক্ষ্য নয়। তোমার আসল লক্ষ্য, এই অঞ্চলের অসংখ্য সব অজানা গুহা-গহ্বর। এমন অদ্ভুত সন্ধানে কেন তুমি এসেছ, তা যে আমি জানি, তা বুঝতে পেরেছ কি? না পেরে থাকলে দুনিয়ার সবাই যা জানে সেই পুরনো ইতিহাস তোমায় একটু স্মরণ করিয়ে দেব। একটা দিন শুধু ধৈর্য ধরো।'

"টেপরেকর্ডার ওইখানেই চুপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ধৈর্য

ধরবেন কী, রাগে, ভয়ে, দুর্ভাবনায় প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন ডাঃ লক। টেপরেকর্ডারের কথায় যাঁর আসল নাম লক নয়, ব্রুল।

"ভেতরে ভেতরে খেপে গেলেও ব্রুল এবার চেঁচামেচি করে লোধা-গোধা কি চিংড়িকে ডাকাডাকি করেননি। তার বদলে, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা দিয়ে টেপরেকর্ডারের সঙ্গে এমন ক'টা বৈদ্যুতিক তার লাগানো কলের ফাঁদ পেতে রেখেছেন যে, রেকর্ডারে কেউ হাত দিলেই একটা হঠাৎ ঝিলিক দেওয়া আলোয় গুপ্ত একটা ক্যামেরায় তার ছবি উঠে যাবে।

"ছবি ঠিকই উঠল। তবে তা ব্রুলের নিজেরই ছবি। রেকর্ডারের সঙ্গে ক্যামেরার গুপ্ত সংযোগের কৌশলটা করে রেখে ব্রুল সেদিন কাছাকাছি অঞ্চলের একটু ভাসা-ভাসা জরিপের কাজ করেছেন। সেখানকার গুহা-গহ্বর, ছোটখাটো পাহাড় ঢিবি হ্রদ ছকে রাখবার জন্যে। এ-কাজে লোধা-গোধা আর চিংড়ি তাঁবুর পাহারা ঠিকই রেখেছে, আর তাঁকে তাঁর দরকার-মতো সাহায্য করেছে।

"সন্ধেবেলায় ক্লান্ত হয়ে তাঁবুতে ফিরে প্রথমেই টেপরেকর্ডারের দিকে গিয়ে তাঁর ক্যামেরার ফাঁদ কী রকম কাজ করেছে দেখার ইচ্ছে হলেও তিনি নিজের ওপর রাশ টেনে রেখেছেন।

"তারপর লোধা-গোধা আর চিংড়ি তাঁবুতে তাদের কাজ সেরে চলে যাবার পর অতি সাবধানে রেকর্ডারের কাছে গিয়ে সেটা চালাবার সুইচ টিপতেই আচমকা সেই অদ্ভুত ব্যাপার।

"তাঁর নিজের পাতা ক্যামেরার ফাঁদে হঠাৎ আলোর ঝিলিকে তাঁর নিজেরই ফ্ল্যাশ ছবি উঠে গেছে। আর সেইসঙ্গে চালু হওয়া টেপরেকর্ডারের অজানা ভুতুড়ে গলায় শোনা গেছে, 'বড় দুঃখিত ব্রুল, তোমার পাতা ফাঁদে তোমাকেই কাবু করতে হল। কিন্তু এখন বাজে কাজে আর কথায় নষ্ট করবার সময় নেই। আসল কথা যা তোমায় বলতে চাই, তার জন্যে দুনিয়ার সকলের যা জানা নেই, সেই পুরনো ইতিহাসটা তোমায় নতুন করে একটু আগে শুনিয়ে দিতে হবে। আজ যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমের এই অঞ্চলটা জার্মানদের অধিকারে ছিল। এখনকার জার্মানি নয়, আগেকার জার্মানি। প্রথম মহাযুদ্ধ হবার পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের অধীন জার্মান সাম্রাজ্যের অনেক কিছুর মধ্যে এইসব জায়গার অধিকারও ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের হাতে চলে গেছে।

"'পৃথিবীর নানা দেশ জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারে ইংরেজরাই ছিল ইউরোপের আর-সব দেশের চেয়ে এগিয়ে। তখনও উড়োজাহাজের দিন শুরু হয়নি। পৃথিবীর সমুদ্রে-সমুদ্রে যার যত বেশি রণতরীর প্রাধান্য, তার সাম্রাজ্যও তত বিরাট। সেদিক দিয়ে ইংল্যাণ্ডের পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্যের সূর্য কখনও অস্ত যেত না বলে ছিল ইংরেজদের গর্ব।

"'ইংরেজদের পরে এ-বিষয়ে দ্বিতীয় বৃহৎ বিশ্বসাম্রাজ্য ছিল ফরাসিদের। এই দুই জাতের পরে এদিকে দৃষ্টি দেয় বলে জার্মানির সাম্রাজ্য ছিল অনেক ছোট। কিন্তু পৃথিবীর যেটুকু জায়গা তারা অধিকার করেছিল, নানা দিকে তার উন্নতি বিধানের চেয়ে সেগুলি থেকে যতখানি সম্ভব সম্পদ সংগ্রহ করার ব্যাপারে তারা ছিল বুঝি সব দেশের চেয়ে অগ্রসর। এই অঞ্চলটাতেও তারা অনেক দিক দিয়ে অনেক কিছু বড় কাজ শুরু করেছিল। মহাযুদ্ধে হারের দুঃখ যেমন, তেমনি এইসব অধিকার হারাবার অপমান আর জ্বালা জার্মানদের অনেকেই ভুলতে পারেনি। আগের জার্মান সাম্রাজ্য লোপ পেলেও আবার নতুন করে পৃথিবী জয় করবার স্বপ্ন শুধু নয়, সে স্বপ্ন সফল করার সাধ্য-সাধনের জন্যে যারা গোপনে গোপনে তৈরি হচ্ছে, তাদের নেতার নাম অ্যাড্‌লফ হিটলার। হিটলার এখনও একটা জঙ্গি দলের সর্দার মাত্র। দেশপ্রেমের নামে পৃথিবীর আর সব দেশকে পায়ের তলায় চেপে শুধু হিংসা-ঘৃণা-স্বার্থপরতাই যেখানে মানুষের ধর্ম, বিশ্বের সঙ্গে শুধু প্রভু আর ক্রীতদাসের সম্বন্ধে বাঁধা এমন এক দানবীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাই গড়ে তুলতে চাইছে সে।

"'এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইউরোপের অন্য দেশের তুলনায় জার্মানি যে বিজ্ঞানে কিছুটা বেশি অগ্রসর, তার প্রমাণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আকাশযান হিসেবে তার জেপেলিন তৈরি, সুদূর জার্মানি থেকে প্যারিসে গোলাবর্ষণ ইত্যাদির মতো ব্যাপারেই কিছুটা পাওয়া গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেরে গেলেও সেই বিজ্ঞান-উদ্ভাবন দিয়েই হিটলারের দল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে তা জিতবার স্বপ্ন দেখছে।

"'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যুদ্ধে-নামা ইউরোপের সব দেশই পয়জন গ্যাস অর্থাৎ বিষ-বাষ্প ব্যবহার করার কথা ভেবেছিল। নানারকম বিষ-বাষ্প উৎপাদন করে তা জমা করে একটু-একটু

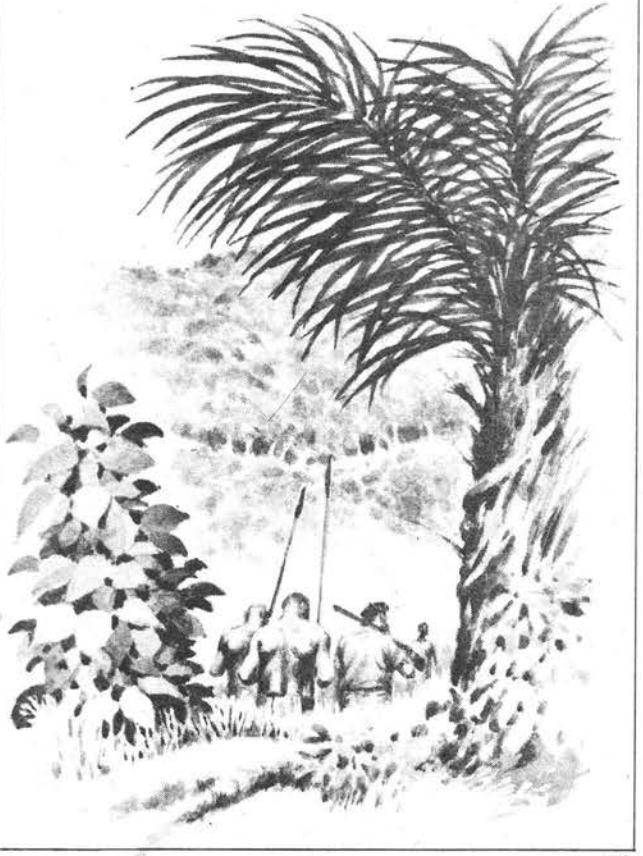

ব্যবহারের পর বিষ-বাষ্প যে আর ব্যবহার করা হয়নি, তার কারণ, ঢিলের বদলে পাটকেল খাবার ভয়। তখন যারা বিষ-বাষ্প তৈরি করেছিল, সে-সব দেশই তারপর সে-সব গ্যাস সাবধানে নানা জায়গায় জমা করে লুকিয়ে রাখে।

"'প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কাজে না লাগালেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তা যে ব্যবহার হবে না, সে-কথা কে বলতে পারে! হিটলারের জার্মানি তাই অস্ত্র হিসেবে বিষ-বাষ্প জমা করে রাখতে চায়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে হেরে তার হাত-পা অনেক দিক দিয়ে বাঁধা। পয়জন গ্যাস বানাতে গেলে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাদের চোখে তা ধরা পড়বারই কথা। পড়লে সব মতলব ভেস্তে যাবে। এ-সঙ্কট কাটাবার উপায় বার করবার জন্যেই 'ডাঃ লক' নাম নিয়ে তোমার মতো গুপ্ত নাৎসির আসরে নামা। জার্মানি বিষ-বাষ্প খোলাখুলি এমনকী লুকিয়েও তৈরি করতে গেলে বিপদ আছে। তা থাক, বিষ-বাষ্প উৎপাদনের বদলে কোনও অজানা জায়গায় মজুত গ্যাস জোগাড় করবার ব্যবস্থা করলে তো সেভাবে ধরা পড়বার ভয় নেই।

"'কোথায় কোন্ অজানা জায়গায় সেরকম মজুত লুকনো গ্যাসের সঞ্চয় আছে? কোথায় আছে, তা আর কেউ না জানুক, জানে 'ব্রুল' নামে এক জার্মান ভবঘুরে আধা-বৈজ্ঞানিক। দুর্গম অজানা সব দেশে টহল দিয়ে নানারকম অদ্ভুত খবর সংগ্রহই যার নেশা।

"'সেই ব্রুল, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির হার হওয়ার পর যুদ্ধের সময় জার্মানির হয়ে গুপ্তচরগিরি করার অপরাধে মিত্রশক্তির গোয়েন্দা-পুলিশের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে যে নানা জায়গায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল।

"'জার্মানিতে হিটলারের অধীনে নতুন নাৎসি দল গড়ে ওঠে, আবার জার্মানির বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু হবার পর। আগের যুদ্ধের মজুত করা পয়জনগ্যাস কাজে লাগতে পারে ভাবার সঙ্গে-সঙ্গে ব্রুলের মনে পড়ে আগেকার এক আবিষ্কারের কথা। সে নতুন করে তা খুঁজে বার করবার কথা ভাবে।

"'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে তার ভবঘুরে টহলদারির সময় সে ক্যামেরুনসের আগ্নেয়গিরির চারধারে ছোট-ছোট হ্রদের অঞ্চলে অনেক অনেক গুপ্ত হ্রদের গহ্বর দেখেছিল, যার ভেতর থেকে মাঝে-মাঝে বিষ-বাষ্প বেরিয়ে আশপাশের জংলিদের বসতিতে মড়ক লাগাত। সে তখনই বুঝেছিল যে, এইসব গুপ্ত হ্রদের গহ্বরের তলায় এমন প্রচুর বিষ-বাষ্পের সঞ্চয় আছে, যা বাইরে ছাড়া পেলে সারা দেশে মড়ক বাধিয়ে দিতে পারে। জার্মানির হারের পর সেখানকার অনেক পুরনো পাপী নাম ভাঁড়িয়ে যথাসম্ভব চেহারা পালটে ভিন্ দেশে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল। সে-চেষ্টায় সফল তারা সবাই হয়নি। আসল পাপীরা অধিকাংশই ধরা পড়ে, তাদের উচিত-শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। শুধু পাকা শয়তানদের তালিকা দেওয়া খাতায় তোমার নাম ছিল না বলে নয়, জার্মানির ভাগ্যের আকাশ যে অন্ধকার হয়ে আসছে, তা একটু আগে থাকতে বুঝে ইউরোপ ছেড়ে এই আফ্রিকায় এসে লুকোবার জন্যেও তুমি এ-যাত্রায় বেঁচে গেছ।

"'এই জংলা প্রবাসে কখনও খেয়ালি ভবঘুরে, কখনও টহলদার খ্রিস্টান সাধু সেজে তুমি ক্যামেরুন-আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে নিয়ল হ্রদের আশেপাশে গুপ্ত সব বিষ-বাষ্পের যেমন সন্ধান পেয়েছ, তেমনি জার্মানিতে কে এক অ্যাডলফ হিটলারের অধীনে জার্মানিকে আবার বিশ্বজয়ী করে তুলবার জন্যে এক নাৎসি দলের অভ্যুত্থানের কথাও শুনেছ।

"'এরপর লুকিয়ে বার-কয়েক ইউরোপ গিয়ে হিটলারের চেলা-চামুণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করে তুমি তোমার আবিষ্কার-করা পয়জন-গ্যাসের সঞ্চয়ের কথা জানিয়ে তার সঠিক-হদিস-জরিপ-করে-দেওয়া মানচিত্র প্রস্তুত করে রাখবার জন্য আবার এই ক্যামেরুনসে রিও দে কার্মার্দে মানে চিংড়ি নদীর মোহানায় এসে নিয়ল হ্রদের অঞ্চলে যাবার সবচেয়ে সোজা আর নিরাপদ রাস্তা দেখাতে এই এক জংলি চিংড়িকে কাজে লাগিয়েছ।'"

ঘনাদা যে ফের মুখ বন্ধ করেছেন, তার কারণ অবশ্য আর কিছুই নয়, ইতিমধ্যে আর-এক প্রস্থ চা এসে গিয়েছিল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে, শিশিরের টিন থেকে সিগারেট ধরিয়ে, তিনি আবার গল্পের খেই ধরলেন।

"দাঁতে দাঁত চেপে টেপরেকর্ডারের কথা শুনতে শুনতে ব্রুল হঠাৎ চমকে উঠে টের পায়, যে-কথাগুলো সে শুনেছে, সেগুলো টেপরেকর্ডার থেকে নয় তাঁবুর মধ্যে এইমাত্র ঢোকা সেই জংলি চিংড়িটার মুখ দিয়েই বার হচ্ছে।

"জংলিটা কয়েক সেকেণ্ড আগে যেরকম বেপরোয়াভাবে তাঁবুর ভেতর এসে টেপরেকর্ডারটা বন্ধ করে দিয়ে নিজেই কথা বলতে শুরু করেছিল তাতে হতভম্ব বিহ্বল হয়ে ব্রুল তো তখন প্রায় তোতলা।

"'তু-তু-তু, মানে আপ-আপ-আপ, মানে আপনি,' বলে আড়ষ্ট জিভটায় সাড় ফেরাবার চেষ্টায় তার মুখটা তখন লাল হয়ে উঠেছে।

"'থাক, থাক!' বলে বেশ একটু ঠাণ্ডা গলায় তাকে থামিয়ে চিংড়ি বললে, 'আমার মতো জংলির মুখে সামান্য একটু জার্মান শুনে 'তুই' থেকে অমন 'আপনি'তে উঠতে হবে না। তার বদলে শির-ছেঁড়া সন্ন্যাস-রোগ থেকে নিজেকে বাঁচাতে একটু ঠাণ্ডা হয়ে আমার কথাগুলো শোনো।'

"কিন্তু ব্রুল তখন রাগে অপমানে একেবারে আগ্নেয়গিরির ক্রেটার। 'তুই, তুই' বলে মুখ দিয়ে যেন লাভা ওগরাতে ওগরাতে তাঁবুর ভেতর হঠাৎ যমজ ঘটোৎকচের এক ভাই গোধাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বললে, 'কী করিস তোরা? কী জন্যে এত টাকা দিয়ে তোদের পাহারায় রেখেছি? কী বলে ওই চিংড়িটার মতো শয়তানকে আমাদের কাজে নিয়েছিস? আমি তোদের সকলকে গুলি করে মারব। হ্যাঁ, গুলি করে···। তার আগে এই চিমসে চিংড়ি চামচিকেটাকে তাঁবু থেকে বার করে নিয়ে···বার করে নিয়ে, হ্যাঁ, ওই নিয়ল হ্রদের ধারে একটা বিষাক্ত গ্যাসের গহ্বরে, হ্যাঁ, ওই গহ্বরেই ফেলে দিয়ে আয়।'

"ব্রুল সাহেবের এ-মূর্তি গোধা কখনও দ্যাখেনি। সে একটু থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'গর্তে ফেলে দেব? ওই বিষাক্ত

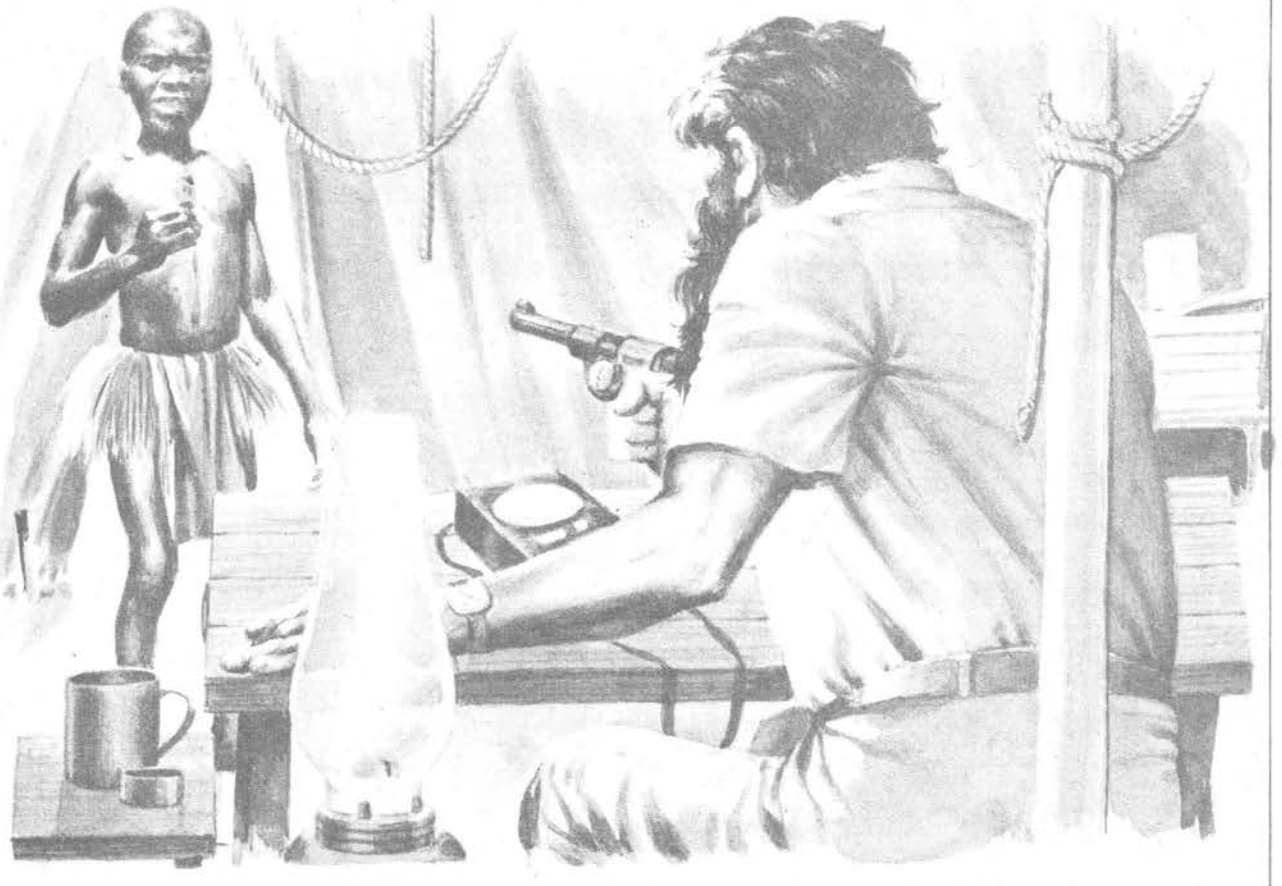

গ্যাসের গহ্বরে ?'

"'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা-ই ফেলবি,' ব্রুল গর্জন করে উঠল, 'ছোটখাটো নয়, সবচেয়ে গভীর যে গহ্বর, সেইটাতে। কী করেছে এই চিমসে চিংড়িটা তা জানিস ? জানিস ওকে··· ?'

"কিন্তু সেসব কথা শোনার জন্যে গোধা আর তখন সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। চিংড়িকে দু' হাতে শূন্যে তুলে ধরে সে তখন তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে।

"তারপর কতক্ষণ বা আর, পাঁচ, বড়জোর সাত মিনিট, কী করবে ঠিক করতে না পেরে ব্রুল তখন তার তাঁবুর ভেতর খাঁচায় ভরা বাঘের মতো এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করছে।

"'সেলাম সাহেব !' তার অস্থির পায়চারির মধ্যে ডাকটা শুনে ব্রুল চমকে ফিরে তাকিয়ে অবাক।

"তাকে তাঁবুর দরজার পর্দা সরিয়ে ডাকছে লোধা কি গোধা নয়, ডাকছে চিমসে চিংড়িটা।

"'অ্যাঁ, তুই !' ব্রুলের গলায় বিস্ময়ের সঙ্গে বেশ একটু ভয় মেশানো, 'গোধা' কোথায় গেল ?'

"'কোথাও যায়নি,' চিংড়ি যেন আশ্বাস দিয়ে বোঝাল, 'তবে একটু ভাল ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর আপাতত একটু টিংচার আয়োডিন।'

"'টিংচার আয়োডিন ?' ব্রুল যেন রাগে-দুঃখে চিৎকার করে উঠল, 'এমন অবস্থা হয়েছে যে, টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দরকার ? লোধা, লোধা, লোধা কোথায় ?'

"'না না, তার তেমন কিছু হয়নি,' চিংড়ি আশ্বাস দিলে, 'সে-ই তো দাদা গোধাকে বয়ে আনছে। তেমন জখম হলে কি পারত ?'

"'জখম হয়েও সে-ই দাদাকে বয়ে নিয়ে আসছে ?' ব্রুলের গলায় যেন রাগ-দুঃখ মেশানো আর্তনাদ ঠেলে উঠছে, 'এখন আমি কী করব বলতে পারো কেউ ?'

"'আমি পারি,' চিংড়ি সান্ত্বনা দিয়ে বললে। তাতে ব্রুল আবার জ্বলে উঠল। হঠাৎ একটা ড্রয়ার থেকে তার রিভলভারটা বার করে চিংড়ির দিকে সেটা উঁচিয়ে ধরে সে গর্জন করে বললে, 'তোকে আমি গুলি করে মারব। যা তোর নাম, সে-ই চিংড়ি কি ইঁদুরের মতো।'

"রিভলভারের সামনে দাঁড়িয়েও চিংড়ি কি নির্বিকার ? 'না,' রীতিমত যেন ভয় পেয়ে সে বললে, 'থামো, থামো ব্রুল, হুট করে এমন যা-তা করে ফেলো না। ও রিভলভারে আমাকে মারলে কী হবে তা একটু ভেবে দেখেছ ? আমায় গুলি করে মারা মানে তোমার কী ভয়ানক বিপদ ?'

"'তোকে মারলে আমার বিপদ ?' ব্রুল জ্বলে উঠে বললে, 'তোর মতো একটা ছুঁচোকে মারলে···'

"'থামো, থামো,' চিংড়ি যেন কাতর মিনতি করে বললে, 'নেহাত যদি মারতেই চাও তো আমার পরিচয়টা তার আগে

একবার ঠিক করে জেনে যাও। আমায় একবার বলছ ইঁদুর, তারপরে আবার চিংড়ি, তারপর আবার বললে ছুঁচো। আমি তোমার চোখে ঠিক কোন্‌টা সেইটা মরার আগে-আগে জেনে যেতে চাই। সেই সঙ্গে এটুকু শুধু নিবেদন করতে চাই যে, চিংড়ি, ইঁদুর কি ছুঁচোকে কেউ গুলি করে মারে না। তাদের…'

"'তুই…তুই…,' রাগে প্রায় তোতলা হয়ে ব্রুল গর্জন করে বলবার চেষ্টা করলে, 'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে রসিকতা করছিস ? এত বড় তোর সাহস ? ভাবছিস, তোকে আমি গুলি করে মারতে পারি না ? তোর মতো একটা ছুঁচো, একটা চামচিকে…'

"'থামো, থামো,' চিংড়ি এবার ঠাণ্ডা গলায় ব্রুলকে যেন শান্ত করতে চাইলে, 'ছুঁচো, চামচিকে, ইঁদুর, চিংড়ি—যা-ই আমি হই না কেন, আমায় গুলি করে নিশ্চয়ই তুমি মারতে পারো, কিন্তু মারলে কী হবে তা একটু ভেবে দেখেছ ?'

"'কী ভেবে দেখব ?' ব্রুল চিৎকার করে বললে, 'তোকে মারলে কোন্ আইনে কে আমাকে এখানে ধরবে ? তোকে এই রিভলভারের গুলিতে ঝাঁঝরা করে লাশটা শুধু ওই একটা বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহায় ফেলে দেব।'

"'হ্যাঁ, তা দিতে পারো,' চিংড়ি যেন তা স্বীকার করে নিয়ে বললে, 'কিন্তু তারপর ?'

"'তারপর মানে ?' ব্রুল দাঁত খিচিয়ে বললে, 'তারপর আবার কী ?'

"'তারপরই যত গণ্ডগোল,' যেন দুঃখের সঙ্গে জানালে চিংড়ি।

"'তারপরে গণ্ডগোল ? তোর মতো একটা…তোর মতো একটা…'

"ব্রুলকে তার তোতলামির মধ্যে থামিয়ে দিয়ে চিংড়ি বললে, 'হ্যাঁ, আমার মতো ছুঁচো, ইঁদুর, চামচিকে, চিংড়ি, যা-ই বলো, তাকে মারার পর কত গণ্ডগোল শুরু, তা বুঝতে পারছ না ? শোনো, বুঝিয়ে বলি। আমার মতো একটা ইঁদুর, চামচিকে, চিংড়ি যা-ই বলো, তাকে তোমার রিভলভারে ঝাঁঝরা করে একটা বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহায় না-হয় ফেলে দিলে। কিন্তু তারপর তুমি নিজেই যে একেবারে অথৈ গাড্ডায় পড়বে, তা বুঝতে পারছ কি ?'

"'তোকে পাতাল-গুহায় ফেলে আমি অথৈ গাড্ডায় পড়ব ?' কথাগুলো রাগে গর্জন করে বলবার চেষ্টা করলেও ব্রুল তার হতভম্ব ভাবটা ঠিক লুকোতে তখন পারছে না। সে-ভাবটা যথাসাধ্য চাপা দিয়ে তবু দাঁত খিচিয়েই বললে, 'কেন ? তুই ভূত হয়ে আমায় গাড্ডায় ঠেলে দিবি ?'

"'না না, ভূত হতে হবে কেন আমাকে ?' চিংড়ি বোঝাবার চেষ্টা করলে, 'আমি গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে কোনও পাতাল-গুহায় তলিয়ে গেলে তোমার কী অবস্থা হবে তা একটুও বুঝতে পারছ না ? বুঝতে পারছ না যে, আমি না থাকলে তুমি তোমার ওই লোধা-গোধাকে নিয়েও কী অসহায়। ভুলে যাচ্ছ কেন যে, এই অজানা মরু-পাহাড়-জঙ্গলের দেশে আমি পথ দেখিয়ে তোমাদের নিয়ে এসেছি। আমি না থাকলে সারা জীবন খুঁজে-খুঁজেও এখান থেকে উদ্ধার পাবার পথের হদিস পাবে না। সুতরাং আমার লাশ যদি বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহায় পড়ে থাকে, তা হলে তোমার লাশও এখানকার মরু-পাহাড়-জঙ্গলে কোথাও রোদে-বৃষ্টিতে শুকোবে কি পচবে, কিংবা এখানকার সিংহ-চিতা-নেকড়ের মতো হিংস্র প্রাণীদের পেটেও যেতে পারবে। তাই বলছি, আমায় মারার মতো অমন ভুল করার চেষ্টাও কোরো না।'

"একটু থেমে চিংড়ি আবার বললে, 'গুলি করেও কোনও লাভ নেই অবশ্য। তোমার ওই রিভলভার আমি আগে দেখিনি মনে করছ ? এর মধ্যে আমায় মারবার মতো একটি গুলিও আমি কি রেখেছি ? সুতরাং শান্ত হয়ে আমার কথা শোনো। শোনো, দেশকে ভালবাসো বলে নাৎসিদের দলে একসময় ভিড়েছিলে বটে, কিন্তু নীচ নোংরা কাজ কখনও করোনি। তা ছাড়া এককালে খ্রিস্টান সাধু হয়ে আফ্রিকার এই ক্যামেরুনস অঞ্চলের হতভাগ্য অধিবাসীদের মধ্যে থেকে তাদের সেবায় জীবন কাটিয়ে তাদের উন্নতির জন্যে যা দরকার, তা করবার ইচ্ছে তোমার ছিল। আজ আবার সেই সুযোগই তোমার এসেছে। এই আগ্নেয়গিরির অজানা অঞ্চলে অসংখ্য বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহা আছে। সেইসব গোপন গুহা থেকে বিষাক্ত গ্যাস মাঝে-মাঝে বেরিয়ে আদিবাসীদের সব বসতি ধ্বংস করে হাজার-হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। তাদের রক্ষা করবার ব্রত নিয়ে তুমি এই অঞ্চলে নিশ্চয়ই একটি মঠ গড়ে তুলতে পারো। সেই মঠ ধর্মের জন্যেও যেমন, বিজ্ঞানের গবেষণাতেও তেমনি তন্ময় হয়ে থাকবে। অন্যসব কাজের মধ্যে এখনকার বিষ-বাষ্প জমানো গুপ্ত গুহার খবর রাখাই হবে তোমার মঠের প্রধান দায়িত্ব। এখানে সেরকম কিছু বেয়াড়া ব্যাপারের আভাস পেলেই তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো তোমার জংলি আদিবাসী ভক্তদের দিয়েই রাজধানীতে না পারো অন্য কোনও ব্যবসার ঘাঁটিতে খবর পাঠাবে। সময়ে খবর পেলে এ বিষ-বাষ্পের সর্বনাশা ক্ষতি হয়তো ঠেকানো যাবে।'

"চিংড়ির কথা শুনে ব্রুল সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে ওই নিয়ল হ্রদের কাছেই তার মঠ স্থাপনা করেছিল। অন্তত করেছিল বলেই আমার ধারণা। গুপ্ত সব গুহা থেকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে যে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ এবার হয়ে গেল, তার আভাস পেয়ে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্রুল তা জানাবার জন্যে তার আদিবাসী দূতকে নানা জায়গায় পাঠিয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ওই ফাং থেকে ফুলানি থেকে হাউসায় কথা চালাচালি করায় কোথাও-না-কোথাও ভুল হওয়ার জন্যেই সে-খবর আমাদের সভ্য জগতে পৌঁছয়নি। কিংবা…"

"কিংবা কী ঘনাদা," আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"কিংবা…" ঘনাদা একটু ধীরে-ধীরে বললেন, "সেই চিংড়ির সঠিক পরিচয় জানার কৌতূহলটা তার কাছে এত বড় হয়েছে যে, সেই সন্ধানে বেরিয়ে আর তার আফ্রিকায় ফিরে মঠ গড়া হয়নি।"

"সত্যিই দুঃখের কথা," সহানুভূতি জানিয়ে আমরা বললাম, "কিন্তু ও চিংড়ি সত্যিই কে বলুন তো ঘনাদা ?"

বনোয়ারির হাতে খাবারের প্লেট সাজানো ট্রে তখন এসে পড়েছে। ঘনাদার কাছে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

ছবি : বিমল দাস

সুখপুরে অ-সুখের হানা
কাহিনী ও চিত্রনাট্য: চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য
চিত্রাঙ্কন: সঞ্জিৎ সাহা (দ্বাদশ শ্রেণী)
সুখপুর গ্রামে শুধুই সুখ। স্কুল, বাজার, হাট, হাসপাতাল, ক্ষেতের ফসল।
সারাদিন প্রত্যেকে নিজস্ব কর্ম করে। পালাপার্বন নাটক এই নিয়ে কেটে যায় দিন।
রক্ষা কর! রক্ষা কর!
হা:, হা:, হা:!
কেরে কেরে। সীতাকে হরন করে নিয়ে যাচ্ছে।
টাইমেক্সের প্রতিনিধি বিজয় আর প্রীতম সুখপুরে এলো।
আমরা খামা আছি। আমাদের অভাব নেই। আমরা সঞ্চয় করবো কিসের জন্য?
ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য।
তার জন্য আমাদের টাকা অন্যকে দেব কেন? আমরাই রাখতে পারি।
যদি সে টাকা চুরি যায়? যদি কোন বছর চাষবাস খারাপ হয়?
আমাদের গ্রামে চোর নেই। আর আমাদের গোলায় সব সময় উদ্বৃত্ত শস্য থাকে।
আপনারা অতিথি। কয়েকদিন থাকুন। খাওয়া দাওয়া করুন। কিন্তু আপনাদের কোম্পানিতে টাকা রাখতে পারবো না।
সেইদিন রাত্রেই হঠাৎ মোটর-বাইকের শব্দে সবাই সচকিত। সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ। আর্তনাদ।
দুড়ুম বম-ম!
ডাকাত পড়েছে! পালাও পালাও!
হঠাৎ মাইকের ঘোষনা গমগম করে উঠলো।
'ভয়াল ভয়ঙ্কর' দল থেকে বলছি। যদি প্রানে বাঁচতে চাও তো গ্রামের স্ত্রীপুরুষ সবাই এই মাঠে এসে জড়ো হও, না হলে পুরো গ্রাম উড়িয়ে দেব!
ভয়াল ভয়ঙ্কর! এবার তাহলে আমরা শেষ!
আমাদের তিনচার জনকে ওরা খুন করেছে!
আমাদের ঘের করে দিয়ে ওরা বাড়ী লুঠ করছে!

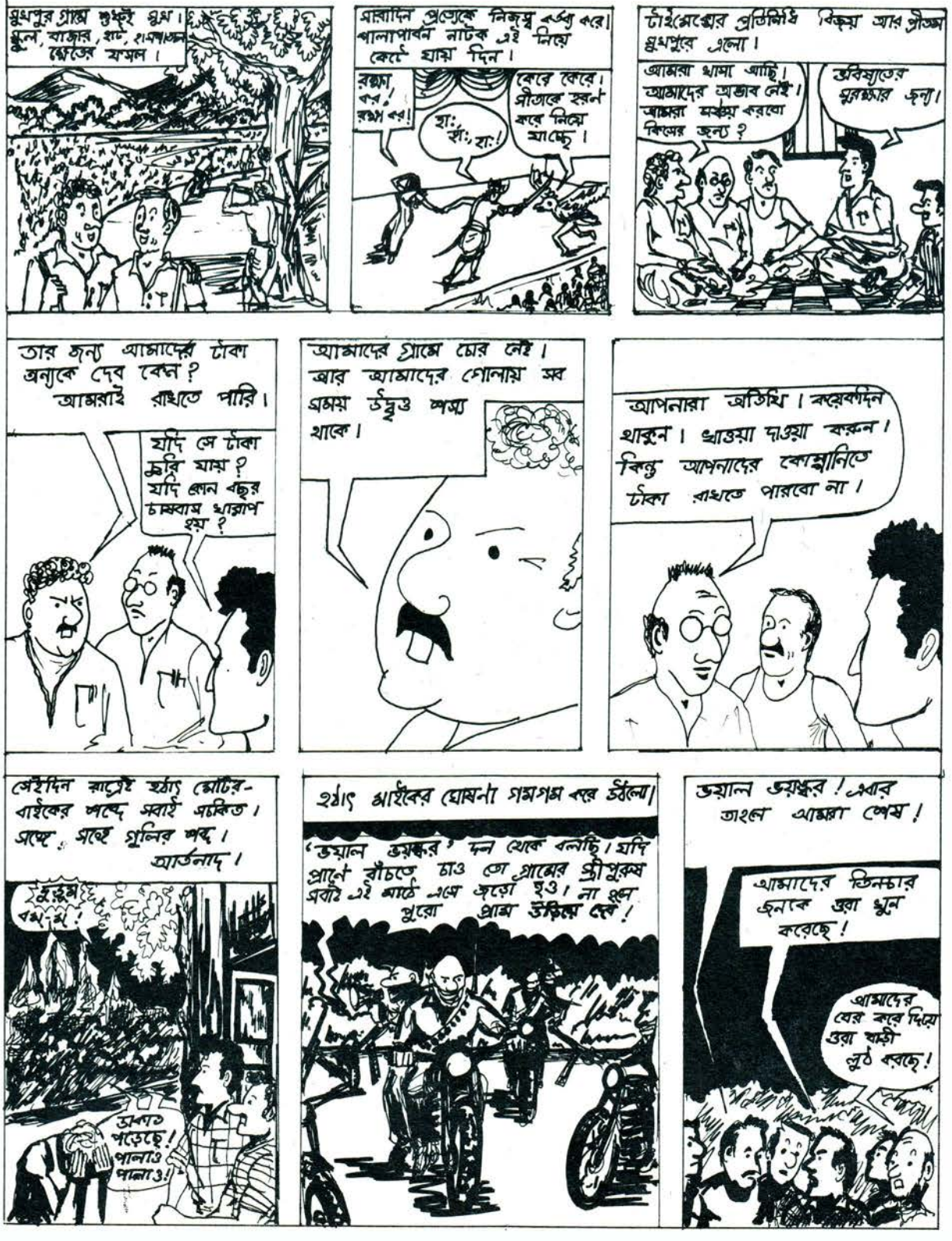

খিড়কির দরজার বাইরে বিজয়, প্রীতম এবং গ্রামপ্রধান।
ওরা কোন দিক দিয়ে এসেছে?
আসা যাওয়ার একই পথ। দক্ষিণের পাহাড়!
আমি ওদিকে চললাম। দেখি কি করতে পারি।
এসো প্রীতম।
ফিরতে গেলে ভয়াল ভয়ঙ্করের দলকে এই পথ দিয়েই ফিরতে হবে। প্রীতম!
বল গুরু!
আমরা এই-খানে পাথর জড়ো করি। আর এই বড় পাথরটা গড়িয়ে নীচে ফেলে বেরোবার পথটা বন্ধ করা যেতে পারে।
হেঁইও হেঁইও!
অনেক চেষ্টায় বিরাট পাথর গড়িয়ে পড়লো। নীচে পালাবার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ।
এইবার যত ছোট বড় পাথর এইখানে জড়ো কর।
আমরাও হাত লাগাচ্ছি।
তোমরা?!

আমাদের বিপদে তোমরা ঝুঁকি নিচ্ছ। আমরা কি বসে বসে দেখবো?
বস্‌। ওরা আসছে
রেডি হও। ওরা নিচে এলেই পাথর গড়িয়ে দেবে।
বাপরে! পালাও!!
উঃ!!
ধড়াস!
আঃ!
চীফ! সামনে পথ বন্ধ!
পাহাড়ে ওঠো!
ওঃ!
সর্বনাশ! উপর থেকেও পাথর পড়ছে যে!
আঃ!
বিজয়ের হাত পায়ের খেল যেন রাশিয়ান সার্কাস।
আঃ!
বাবাগো!
নীচের দস্যু-দের বেঁধে ফেলেছি। আর মোটর বাইক গুলো পুকুরে ডুবিয়ে দিয়েছি।
পুলিশে খবর দিন
লোক চলে গেছে।

বিজ্ঞাপন

টাইমেক্স

ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

১৯৫৬ ভারতীয় কোম্পানী আইনে নথিভুক্ত একটি

নন-ব্যাংকিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান

৫২, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৪

রেজিস্টার্ড নং—৩২৩০৪, স্থাপিত : ১৯৭৯

পাশের বাড়ির বন্ধু

অনীশ দেব

একদিন ভোরবেলা জানলা দিয়ে নজর পড়তেই পাপু অবাক হয়ে গেল। পাশের বাড়িটায় লোকজন এসেছে। এতদিন ধরে বাড়িটা খালিই পড়ে ছিল। অনেকটা পোড়ো বাড়ির মতো। আর চেহারাটাও ভারী অদ্ভুত। প্রায় পাঁচতলা উঁচু গির্জার মতো। ছুঁচলো মাথাটা সোজা আকাশমুখো উঠে গেছে।

কিন্তু চেহারায় বড়সড় হলে হবে কী, বাড়িটার চারদিক আগাছার জঙ্গলে ভরে গেছে। সারা গায়ের পলস্তরা খসে গেছে। জানলাগুলোর হালও সেইরকম। রাত্তিরে দেখলে গা-ছমছম করে পাপুর। অন্ধকারে কালো-কুচকুচে দেখায় বাড়িটা। একটা তালঢ্যাঙা ভূত যেন টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিনের বেলা দেখলে অবশ্য অতটা ভয় করে না। তবে ইস্কুল যাবার পথে পাপু রোজই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে। চার পাশে মরচেধরা লোহার রেলিং। বিশাল লোহার গেট। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বাড়িটার ভারী সদর দরজা। বন্ধ। আর নীচের দিকটা ঢাকা পড়ে গেছে আগাছায়।

বাড়িটা যে কবে কে তৈরি করেছে তা কেউ জানে না। বাবাও না। পাপু বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল। তাতে বাবা বলেছেন, 'এদিকে সবই তো নতুন ফ্যাক্টরি-কোয়ার্টার। কী করে একটা পোড়ো বাড়ি

মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কে জানে ! হবে হয়তো কোনও সাহেবসুবোর ফেলে যাওয়া বাড়ি।'

উত্তরটা পাপুর মনে ধরেছিল। কারণ সত্যিই এ-অঞ্চলের প্রায় সব বাড়িই নতুন। বছর দশেক হল কয়েকটা বড়-বড় কলকারখানা চালু হওয়ায় নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। হয়েছে ইস্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, দোকানপাট সবকিছু, অথচ একই সঙ্গে রয়েছে সবুজ মাঠ, ফুলের বাগান, গাছপালা। আর তারই মাঝে-মাঝে সুন্দর-সুন্দর ছোট-ছোট নতুন বাড়ি। ব্যতিক্রম শুধু আগাছায় ভরা ফাঁকা জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল পোড়ো বাড়িটা।

সেই বাড়িতেই নতুন লোক এসেছে।

পাপু তাড়াতাড়ি বাবাকে ডেকে নিয়ে এল জানলার কাছে। বলল, "ওই বাড়িটায় নতুন লোক এসেছে, বাবা।"

বাবা ফ্যাক্টরিতে বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। পাপুর কথায় উঁকিঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "না, দেখতে পাচ্ছি না। যাকগে, পরে নিশ্চয়ই আলাপ হয়ে যাবে।"

বাবা অফিসে বেরিয়ে যাবার পর মা'কে ধরে নিয়ে এল পাপু। বলল, "মা, ওই দ্যাখো ! ও বাড়িটায় লোক এসেছে।"

মা ভাল করে তাকিয়ে রইলেন পোড়ো বাড়িটার ভাঙা জানলার দিকে। কিন্তু না, কোনও মানুষজনই নজরে পড়ল না। তখন মা বললেন, "ঠিক আছে, এখন রান্না বসাই গিয়ে, পরে আবার দেখব। তুমি পড়তে বোসো। এখন দেরি করলে পরে আবার ইস্কুলের দেরি হয়ে যাবে।"

মা চলে গেলেন। পাপু বুঝল, মা কিংবা বাবা, দু'জনের কেউই ওর কথাকে বিশেষ আমল দেননি। নেহাতই কথার পিঠে দুটো কথা বলে চলে গেছেন। পাপুর একটু রাগও হল। বড়রা সব সময়েই এইরকম। ছোটদের গ্রাহ্যই করতে চান না। পাপু বই নিয়ে পড়তে বসল বটে, কিন্তু ওর চোখ বরাবরই ছুটে যেতে লাগল ওই পোড়ো বাড়ির জানলাগুলোর দিকে। এতদিনের পুরনো ভাঙাচোরা বাড়িটা হঠাৎই কারা ভাড়া নিল, নাকি কিনে নিল ? পাপুর বেশ অবাক লাগছিল।

ইস্কুলে রওনা হওয়ার ঠিক আগেই আশ্চর্য ঘটনাটা ওর চোখে পড়ল।

যে জানলা দিয়ে পাপু নজর রাখছিল, তার কিছুটা অংশ একটা নিমগাছের ডাল-পালা-পাতায় ঢাকা। তা ছাড়া পোড়ো বাড়িটার তেতলার জানলাটা খুব একটা যে কাছে তাও নয়। কিন্তু তবুও পাপুর দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

তেতলার জানলা দিয়ে একটা ছোট বাক্সমতো কী যেন পড়ে গেল নীচের আগাছার জঙ্গলে। আর তার ঠিক পরেই একজন লোক গরাদভাঙা জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি মারল। নীচে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কী সব দেখল। আশপাশে একবার চোখ বুলিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর 'স্পাইডারম্যান' কমিকস-এর পিটার পার্কারের মতো পোড়ো বাড়িটার দেওয়াল বেয়ে তরতর করে হেঁটে নেমে এল নীচে। বাক্সটা খুঁজে নিয়ে আবার একইভাবে তেতলায় উঠে জানলা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

বলতে গেলে পাপুর দম আটকে আসছিল। ও একছুটে গিয়ে নতুন আনন্দমেলা পত্রিকাটা নিয়ে 'স্পাইডারম্যান' কমিকস্-এর পাতা খুলে বসল। পিটার পার্কারের ছবিটা একদৃষ্টে দেখতে লাগল। তা হলে কি পাশের বাড়িতে কোনও মাকড়সা-পরিবার এসে উঠেছে ? পার্কারের গল্প তা হলে গল্প নয় ! পাপু ভাবল মা'কে ডেকে এক্ষুনি এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা জানায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, মা'কে বলে লাভ নেই, মা পাপুর কথা একটুও বিশ্বাস করবেন না। বলবেন, 'ও তোমার চোখের ভুল। আর রাজ্যের গল্পের বই পড়ার নেশাটা একটু কমাও তো !'

সুতরাং এই দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার কথা অতিকষ্টে বুকে চেপে পাপু ইস্কুলে চলে গেল।

কিন্তু সেখানে গিয়ে আর গোপন রাখতে পারল না। প্রাণের বন্ধু বিজনকে সব খুলে বলল ও। বিজন কাছাকাছিই একটা কোয়ার্টারে থাকে। রোজ বিকেলে আরও সব বন্ধুবান্ধব মিলে ওরা পাপুদের বাড়ির কাছে মাঠে খেলা করে। বিজন বলল, "চল্, বিকেলে খেলার সময় বাড়িটার দিকে নজর রাখব।"

যে কথা, সেই কাজ।

বিকেলে খেলতে বেরিয়ে পাপু, বিজন, আর ওদের অন্য বন্ধুরা বাড়িটার দিকে নজর রাখতে লাগল। চট করে কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না বাড়িটায় কেউ আছে। খেলাধুলো ছেড়ে যখন ওরা গোয়েন্দাগিরিতে নামবে বলে মতলব আঁটছে, ঠিক তখনই বাড়ির দরজাটা খুলে গেল।

আর বেরিয়ে এল ওদেরই বয়েসি একটি ছেলে। ফুটফুটে, হাসিখুশি মুখ।

বড় লোহার গেটটা খুলে সে সোজা এগিয়ে এল পাপুদের কাছে। বলল, "আমার নাম রনি। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব। তোমাদের নাম কী ?"

পাপু, বিজন, সবাই যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তোতলানো স্বরে আলাপ সেরে নিল নতুন বন্ধুর সঙ্গে।

কথায়-কথায় জানা গেল, রনিরা আজ খুব ভোরে এসেছে। এ-বাড়িটা ওদেরই ছিল। তবে এদিকে আসা হয়নি। হঠাৎ দরকার পড়ায় বাবা-মা-রনি হঠাৎ করে চলে এসেছে।

তখনও বেশ দিনের আলো ছিল। ওরা দল করে টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলতে লাগল।

খেলা শুরু হলেও পাপুর বার বার সকালের ঘটনার কথা মনে পড়ছিল। দেওয়াল বেয়ে নেমে-আসা ওই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই রনির বাবা। রনিকে জিজ্ঞেস করবে সে-কথা ? নাকি....

পাপু একপাশে বসে স্কোর লিখছিল আর এলোমেলো ভাবছিল। এখন রনি ব্যাট করছে, বিজন বল করছে। অন্য প্রান্তে রয়েছে ওদেরই আর-এক বন্ধু তাতন। কেউ একজন আউট হলেই পাপু নামবে ব্যাট হাতে। কিন্তু হঠাৎই রনি বলটাকে ওপরের দিকে মারল। মারতে গিয়ে খুব যে একটা জোর খাটিয়েছে, তা মনে হল না। কিন্তু বলটা সেই যে সোজা ওপরের দিকে উঠে গেল আর নীচে পড়ল না।

রনি মুখে অপরাধী ভাব ফুটিয়ে বলল, "কিছু মনে কোরো না। মারটা একটু জোরে হয়ে গেছে।"

বিজন অবাক হয়ে একবার আকাশের দিকে, আর একবার রনির দিকে দেখতে লাগল। ঘটনাটা ওদের বন্ধুরা কেউই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

মাঝপথে খেলা পণ্ড। সুতরাং ওরা গল্প করতে করতে যে-যার বাড়ির দিকে চলল। পাপু রনিকে বলল, "আমি পাশের বাড়িতেই থাকি।"

রনি সেটা শুনে বলল, "আমাদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে এসো। মা-বাবা তোমাকে দেখলে ভীষণ খুশি হবে। কাল আসবে নাকি ?

পাপু বলল, "ঠিক আছে। মা যদি বারণ না করে তা হলে আসব।"

ওদের বাড়িটা সম্পর্কে পাপুর ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। কৌতূহল হচ্ছিল রনি আর তার বাবা-মা সম্পর্কেও।

রনি হাত নেড়ে লোহার গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল। তারপর···পাপু স্পষ্ট দেখল, মরচেধরা লোহার গেটটা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। অথচ রনি একটিবারও পিছন ফিরে তাকায়নি। ও তখন সদর-দরজা ঠেলে বাড়িতে ঢুকছে।

সদর-দরজাটাও একই ভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

যদিও তখন সন্ধের আঁধার নেমে আসছে, তবুও পাপুর যে দেখতে এতটুকু ভুল হয়নি তা ও হলফ করে বলতে পারে।

বাড়িতে ঢোকার মুখে ও আবার দেখল, রনিদের বাড়ির সব ক'টা জানলায় একসঙ্গে দপ করে আলো জ্বলে উঠল। আলোগুলোর রঙ কেমন যেন অদ্ভুত। এরকম আলো পাপু আগে কখনও দ্যাখেনি। তা ছাড়া ওই বাড়িতে এত আলোর ব্যবস্থা ছিল!

পাপু ঠিক করল, বিশ্বাস করুক আর না করুক, আজ ও মা-বাবাকে সব খুলে বলবে। আর কাল বিকেলে ও রনিদের বাড়িতে বেড়াতে যাবে।

অদ্ভুত সব চিন্তা মাথার ভেতরে ঘুরপাক খাওয়ার দরুন পড়াশোনায় ঠিকমতো মন বসল না পাপুর। শেষে রাতে খাওয়ার সময় ও মা'কে আর বাবাকে রনিদের কথা বলল। কোনও কথাই বাদ দিল না।

ওর কথা শুনে বাবা তো গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। "এসব তোমার কমিক্স্ পড়ার ফল। ভাল করে রাত্তিরে ঘুমোও, দেখবে কাল সকালেই সব ঠিক হয়ে গেছে।"

পাপু বলল, "না বাবা, সব সত্যি। আমি নিজের চোখে দেখেছি। বিশ্বাস করো।"

তখন মা বললেন, "ঠিক আছে, কাল বিকেলে তোমাকে নিয়ে আমরা রনিদের বাড়িতে বেড়াতে যাব। তোমার বাবাও যাবে আলাপ করতে। দেখবে, তখন তোমার ভুল ভেঙে যাবে।"

পাপু আর কী করে, চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়ল।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে ওর মনে হল, ওইসব উদ্ভট ব্যাপারগুলো ঠিক-ঠিক ও দেখেছিল তো! নাকি ····

সে-রাতে পাপু স্পাইডারম্যান কমিক্স্-এর পিটার পার্কারকে স্বপ্ন দেখল।

পরদিন সকালে উঠে শুধু পাপু নয়, মা-বাবাও একেবারে তাজ্জব। ভেলকিবাজি, ভানুমতীর খেল্, নাকি ময়দানবের কীর্তি? সবাই দু'চোখ কচলে বারবার দেখতে লাগল আশ্চর্য ঘটনাটা।

রনিদের বাড়িটা সূর্যের আলোয় যেন ঝকঝক করছে। কোনওদিন যে সেটা পোড়ো বাড়ি ছিল সেটা বিশ্বাস করাই এখন মুশকিল।

পাপু মা-বাবার গোল-গোল চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী, এখন বিশ্বাস হল তো আমার কথা! দেখলে তো রনিরা কী রকম সব আশ্চর্য কাণ্ড করতে পারে!"

মা কোনওরকমে থেমে-থেমে বললেন, "এ যে একেবারে নতুন বাড়ি!"

বাবা বাড়ির চারপাশের আগাছার জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "শুধু ওই জঙ্গল আর মরচেধরা লোহার রেলিংগুলো না থাকলে বাড়িটা আর চেনাই যেত না।"

পাপু আগ্রহভরা গলায় বলল, "রনিকে একবার ডেকে জিজ্ঞেস করব বাবা?"

মা তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন, "না, না, তার দরকার নেই। শেষ পর্যন্ত কী থেকে কী হবে···"

বাবা সাবধানী সুরে পাপুকে বললেন, "তুমি যেন একা-একা ওদের বাড়িতে যেও না।"

পাপু ঘাড় নাড়ল। তারপর হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসল।

বাবা ফ্যাক্টরিতে বেরোনোর পর থেকেই পাপু জানলার কাছে সর্বক্ষণ খাড়া হয়ে রইল। তীক্ষ্ণ নজর চালিয়ে রনিদের বাড়ির ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু কোনও লাভ হল না। রনি, ওর বাবা কিংবা মা, কাউকেই দেখা গেল না। পাপু অবাক হয়ে ভাবছিল, কোন্ শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় বাড়িটা রাতারাতি ভোল পালটে ফেলল।

উত্তরটা ও পেল ইস্কুলে যাবার সময়।

পাপু একা-একাই ইস্কুলে যায়-আসে। এদিককার রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়া কম। শুধু একটু যা সাইকেলের ভিড় রয়েছে। ও সবে রনিদের বাড়িটা ছাড়িয়ে এগিয়েছে, এমন সময় ওর ঠিক সামনে হাজির হল রনি। যেন বাতাস থেকেই ফুটে উঠল ওর নতুন বন্ধুর চেহারা।

"কোথায় যাচ্ছ, ইস্কুলে?" রনি জিজ্ঞেস করল।

পাপু নিজেকে সামলে নিয়ে কিছুটা ভয়ে-ভয়েই বলল, "হ্যাঁ।" তারপর একটু থেমে আবার বলল, "তুমি ইস্কুলে ভর্তি হবে না ?"

রনি হাসল। হেসে বলল, "না। আমি তো দেশের বাড়িতে ইস্কুলে পড়ি। তোমাদের এখানে ইস্কুল-কলেজে যা শেখায়, সব আমার জানা। আমাদের ইস্কুলে পড়া খুব কঠিন। তুমি বুঝবে না।"

পাপু কিছুটা অপমান বোধ করল। বলল, "তোমার দেশের বাড়ি কোথায় ?"

রনি হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "সে অনেক দূর। জায়গার নাম বললে তুমি চিনবে না।"

পাপু কথা বলতে বলতে এগোচ্ছিল। রনিও ওর পাশে-পাশে হাঁটছিল। ইস্কুলের কাছাকাছি এসে পাপু বলল, "আচ্ছা, তোমাদের বাড়িটা রাতারাতি কে মেরামত করল বলো তো ?"

রনি স্বাভাবিক গলায় বলল, "কে আবার ! বাবা।"

"একা ?"

"হ্যাঁ, একা। কেন ?"

"তোমার বাবা দেওয়াল বেয়ে হাঁটতে পারেন ?"

পাপু রনিকে খোঁচা দিয়ে অপমানের শোধ নিতে চাইছিল, কিন্তু ওর কথায় রনি আগের মতোই স্বাভাবিক ভাবে জবাব দিল, "শুধু বাবা কেন ? মা'ও পারে, আমিও পারি। দেখবে ?" বলেই রনি একছুটে সামনের একটা কোয়ার্টারের দেওয়াল বেয়ে দোতলায় উঠে গেল, তারপর একই ভাবে আবার নেমে এল।

পাপু হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে রনি বলল, "শুধু আমি কেন, আমাদের দেশের সবাই পারে। তুমি বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসো, তোমাকে আরও সব অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস দেখাব। খুব মজা পাবে তুমি।"

পাপুর সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। কী ভেবে ও কোনওরকমে বলল, "সন্ধেবেলা যাব। আমার মা-বাবাকে নিয়ে যাব। নইলে একা-একা আমাকে ছাড়বে না।"

রনি হেসে বলল, "নিয়ে এসো ওঁদের। আলাপ হলে আমার মা-বাবাও খুব খুশি হবে। আমাদের দেশের বাড়ির দারুণ-দারুণ সব গল্প শোনাব। আচ্ছা, ওই যে তোমার ইস্কুল এসে গেছে, আমি এখন যাই। সন্ধেবেলা আবার দেখা হবে।"

পাপুর চোখের সামনে রনি আবার যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল।

ইস্কুলে বিজনকে সব ঘটনা জানাতেই ও বলল, "সন্ধেবেলা যাবি যা, তবে সাবধানে থাকিস।"

পাপু গম্ভীর হয়ে ভাবছিল। ক্লাসের পড়া ওর মাথায় ঢুকছিল না।

ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আর খেলতে বেরোল না পাপু। শুধু মায়ের কাছে বসে জেদ ধরল রনিদের বাড়িতে ওকে নিয়ে যেতে হবেই। কারণ রনি কত মজার-মজার খেলা দেখাতে পারে, পড়াশোনায় কত ভাল, ও পাপুকে নিশ্চয়ই সব শিখিয়ে দেবে। তা ছাড়া রনির কাছে ওর দেশের গল্প শুনবে পাপু। রনি বলেছে দারুণ-দারুণ সব গল্প শোনাবে।

বাবা অফিস থেকে ফিরেই রাজি হয়ে গেলেন এক কথায়। মনে মনে তাঁরও বোধহয় খুব কৌতূহল হচ্ছিল। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনজন তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে।

বিকেল পেরিয়ে তখন সন্ধে হয়ে গেছে। রনিদের তালঢ্যাঙা বাড়ির ছোট-ছোট জানলায় গতকালের মতোই অদ্ভুত আলো জ্বলছে। মা-বাবার হাত ধরে লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল পাপু। তারপর আগাছা মাড়িয়ে সদর-দরজা। দরজা খুলে ভেতরে।

ভেতরে ঢুকতেই মেঝেটা নিঃশব্দে ওপরে উঠতে লাগল। ঠিক যেন অটোমেটিক লিফট। তারপরই রনি আর ওর মা-বাবার দেখা পাওয়া গেল। বিশাল ঘর। অনেকগুলো টিভির পর্দায় নানান রঙিন লেখা। তাদের সামনে অসংখ্য রঙিন বোতাম। কম্পিউটার নাকি ? পাপু কম্পিউটারের ছবি বইতে দেখেছে।

রনির বাবা দ্রুত হাতে নানান বোতাম টেপাটেপি করছিলেন, ওদের দেখেই হেসে অভ্যর্থনা জানালেন। রনির মা সুন্দর-সুন্দর খাবার সাজিয়ে দিলেন প্লেটে। ওরা আনন্দে গল্প করতে লাগল। রনিদের দেশের হরেকরকম অদ্ভুত গল্প পাপুদের অবাক করে দিচ্ছিল। রনির বাবা বারবার করে বললেন, "চলুন না, আমাদের দেশে ক'দিন বেড়িয়ে আসবেন। কোনও অসুবিধে হবে না। আজ রওনা হলে ধরুন কাল পৌঁছে যাবেন। আর যদি বলেন তো পরশু আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। চলুন, চলুন। গেলে খুব ভল লাগবে। তা ছাড়া আমাদেরও ক'টা দিন বেশ ফুর্তিতে কাটবে।"

পাপু আর রনি ছুটোছুটি করে খেলছিল। পাপু নেমন্তন্নের কথা শুনে বাবাকে আর মা'কে রাজি করানোর জন্য বারবার করে আর্জি পেশ করতে লাগল। সকলের অনুরোধে ওঁরা শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন।

তখন রনির বাবা হেসে বললেন, "তা হলে আর দেরি নয়, এখনই রওনা হওয়া যাক।" বলে তিনি কম্পিউটারের কাছে গিয়ে পরপর কয়েকটা বোতাম টিপলেন।

একটা গুড়গুড় শব্দ শুরু হল। তারপর ভোঁ-ভোঁ। শেষে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রনিদের গোটা বাড়িটা শূন্যে উঠতে লাগল রকেটের মতো।

পাপুর মা চিৎকার করে উঠলেন।

বাবা বললেন, "এসব কী হচ্ছে !"

রনির বাবা হেসে বললেন, "কোনও ভয় নেই। আমরা আপনাদের এপসিলন এরিড্যানির সতেরো নম্বর গ্রহে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানেই আমাদের দেশ। পৃথিবী থেকে সাড়ে দশ আলোকবর্ষ দূরে। যেটাকে আপনারা আমাদের বাড়ি ভাবছেন, সেটা আসলে একটা মহাকাশযান। অনেকদিন আগে পৃথিবীতে এসে বিকল হয়ে পড়েছিল। অন্য একটা মহাকাশযান আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে এই মহাকাশযানটাকে মেরামত করে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই এখন নিয়ে যাচ্ছি।"

রনির মা বললেন, "আমরা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টাতেই বারবার এই গ্রহে যাতায়াত করি। এবারে আপনাদের পাপুর সঙ্গে আমাদের রনির যা ভাব হয়েছে তাতে আমরা খুব খুশি। তা ছাড়া আপনাদের সঙ্গেও আলাপ করে খুব ভাল লেগেছে। মিছিমিছি ভয় পাবেন না। মনে করুন না, ছুটিতে ক'দিন কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন ! মাত্র কয়েকটা তো দিন, তার বেশি তো নয়।"

পাপুর মা-বাবার ভয় আস্তে-আস্তে কেটে যাচ্ছিল। রকেটযান তখন সাঙ্ঘাতিক গতিতে ছুটে চলেছে। সামনের টিভি-পর্দাগুলোয় অসংখ্য তারা দেখা যাচ্ছে।

রনি ঘরের দেওয়ালে ছাদে ইচ্ছেমতো ছুটোছুটি করছিল। খেলা করছিল পাপুর সঙ্গে। পাপু কিন্তু এতটুকু ভয় পায়নি। সেও খেলা করতে করতে লাফিয়ে-লাফিয়ে রনিকে ছুঁতে চেষ্টা করছিল।

সেদিকে তাকিয়ে পাপুর বাবা রনির বাবাকে বললেন, "বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন চলুন, কিন্তু দেওয়ালে হাঁটাহাঁটি করাটা আমাকে অবশ্যই শিখিয়ে দিতে হবে।"

পাপুর মা বললেন রনির মা'কে, "আমাকে নতুন-নতুন কয়েকটা রান্না শিখিয়ে দেবেন, দিদি।"

কথা শেষ হতে সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

স্টার ওয়ারস

লেখা : আর্চি গুডউইন
ছবি : আল উইলিয়ামসন

স্টার ওয়ারস

লেখা : আর্চি গুডউইন
ছবি : আল উইলিয়ামসন

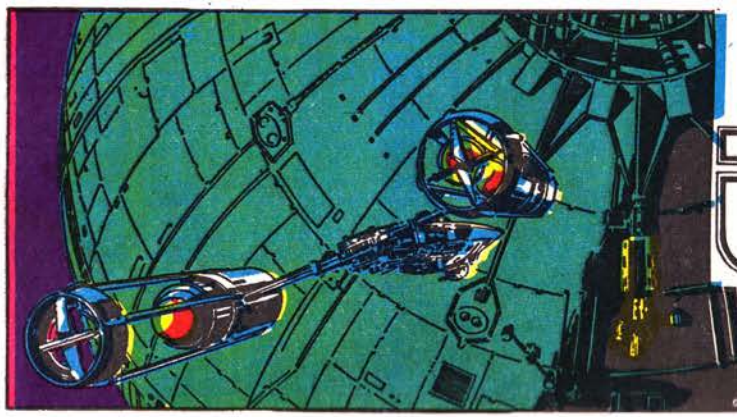

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ক্যাপ্টেন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

হাতের তাস শাফল করতে-করতে ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাস্, তা হলে এই কথাই রইল। আমি ডিল্ করছি। সবচেয়ে কম দরের তাস যার ভাগ্যে উঠবে, তাকেই ছুটে বেরিয়ে যেতে হবে এই গুহা থেকে। সে নিজে হয়তো মারা পড়বে, কিন্তু তারই জন্যে যে বাদবাকিরা বেঁচে যাবে, এটাই হচ্ছে বড় কথা।"

মাত্রই ঘণ্টাখানেক আগে বার্বেরিস গ্রহের এই চাঁদের পিঠে পাঁচ অভিযাত্রী এসে নেমেছিল। মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইদি ওকাবু, পিটার জ্যাকসন, রোবের সুস্তেল আর মালাকানু বিকিলা। তারা ভেবেছিল, এখানে একটি রিলে-স্টেশন তৈরি করে তোলা যাবে। তার প্রাথমিক

কাজ শুরুও করেছিল তারা। কিন্তু ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে এখন তারা এই গুহার মধ্যে বসে আছে।

গুহার বাইরে, এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে জমির উপরে ছড়িয়ে আছে হাল্কা বেগ্‌নি রঙের রোদ্দুর। সেই সূর্যের রোদ্দুর, পৃথিবীর মানুষরা যাকে 'পরাশর' বলে চেনে। রোদ্দুর অবশ্য গুহার ভিতরে বিশেষ ঢুকতে পারছে না, কেননা, গুহার ঠিক মুখেই দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন পৃথিবীর সেই ডাইনোসরের মতোই বিশাল একটি প্রাণী। বার্বেরিসের যে চাঁদকে তারা সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ একটা উপগ্রহ বলে ধরে নিয়েছিল, জমি জরিপ করতে নেমে সেখানে যে একেবারে অতর্কিতে এই হিংস্র জন্তুর মুখের সামনে পড়তে হবে, তা তারা ভাবতেও পারেনি। ন্যাড়া একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেই জন্তুটি তাদের তাড়া করে। ঠিক তক্ষুনি যদি না এই গুহার মধ্যে তারা ঢুকে পড়ত, তা হলে আর তাদের বাঁচতে হত না।

বাঁচবার আশা অবশ্য এখনও বিশেষ নেই। কেননা, টাইটান মহাকাশযান থেকে ছোট্ট-মাপের যে শাট্‌লে করে তারা এখানে নেমেছে, তারই মধ্যে পড়ে রয়েছে তাদের লেসার-পিস্তল। দরকার হবে না ভেবেই সেগুলো আর তারা নামায়নি। ফলে, এখন তারা পুরোপুরি নিরস্ত্র। বাইরে, বেগ্‌নি রঙের রোদ্দুরের মধ্যে, দাঁড়িয়ে আছে তাদের শাট্‌ল-যান। কিন্তু এই গুহা থেকে বেরিয়ে সেখানে পৌঁছবার কোনও উপায়ই তারা খুঁজে পাচ্ছে না।

কী করে পাবে ? গুহার মুখেই দাঁড়িয়ে আছে সেই জন্তু। রাগে গজরাচ্ছে, পাথুরে জমির উপরে ঘন-ঘন লেজ আছড়াচ্ছে। গুহার মুখটা তার শরীরের তুলনায় এতই ছোট যে, কিছুতেই সে ভিতরে ঢুকতে পারছে না। কিন্তু যেভাবে সে তার থাবা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে গুহার মুখের পাথরের চাঁইটাকে, যে-কোনও মুহূর্তে সেটা আল্‌গা হয়ে খসে পড়া কিছু বিচিত্র নয়। কী হবে তখন ?

ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদের নেতা। দেখে যুবক বলে ভ্রম হয়, কিন্তু তাঁর বয়স এখন পঞ্চাশ। কথা ছিল, রিলে-স্টেশনের জরিপের কাজ

শেষ করেই তিনি অবসর নেবেন। হাইবারনেশন-ক্যাপসুলে পুরে তাঁকে আবার পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হবে, এবং সেইখানেই তিনি কাটাবেন তাঁর অবসরজীবন। কিন্তু এই শেষ মিশনেই যে তাঁর অনুসন্ধানী দলটিকে নিয়ে এমন বিপদে পড়তে হবে, তা কি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন ?

সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকালেন মিলিন্দ। তাঁরই উপরে নির্ভর করছে এদের জীবন-মৃত্যু। আপন হাতে এদের তিনি তৈরি করে তুলেছেন। সাফল্যের মুহূর্তে যেমন মুক্তকণ্ঠে 'শাবাশ' দিয়েছেন, তেমনি বিপদের মুহূর্তে জুগিয়েছেন সাহস। বয়সে এরা প্রত্যেকেই তাঁর চেয়ে অনেক ছোট। সবচেয়ে ছোট আফ্রিকার ওই কালো মেয়ে মালাকানু, যাকে তিনি আদর করে 'মালা' বলে ডাকেন। মালার বয়স বাইশ বছর। মাত্রই দু'বছর আগে মালা তাঁর অনুসন্ধানী দলে এসে যোগ দিয়েছে, কিন্তু বয়স এত কম হওয়া সত্ত্বেও সাহসে, সহিষ্ণুতায়, বুদ্ধিতে আর উদ্‌ভাবনী কৌশলে সে কারও থেকে কিছুমাত্র পিছিয়ে নেই। ইদি, পিটার আর রোবেরও সে-কথা খোলাখুলি স্বীকার করে। একবার তো ঘোর বিপদের মুহূর্তে এই মালার বুদ্ধিতেই বেঁচে গিয়েছিল পিটার জ্যাকসন। পিটার সে-কথা ভুলে যায়নি।

মালাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসেন মিলিন্দ। তাঁর মেয়ে নেই। থাকবার মধ্যে আছে একটি ছেলে। কিন্তু ছেলেটিও কাছে নেই। পৃথিবীতে সে তার কাজের মধ্যে ডুবে আছে। দিল্লিতে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই সে এখন মহাকাশবিজ্ঞান-বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নামজাদা অধ্যাপক। এখন অবশ্য সেই ছেলের কথাও মিলিন্দ ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন তাঁর সহকর্মীদের কথা। ভাবছিলেন যে, যেমন তাঁর নিজের, তেমনি তাঁর সহকর্মীদের জীবনেরও আজ শেষ দিন।

সকলেরই শেষ দিন ? মিলিন্দের মাথার মধ্যে একেবারে হঠাৎই একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে গেল। আছে, পাঁচজনকে না হোক, অন্তত চারজনকে বঁচাবার একটা উপায় হয়তো আছে। দলের পাঁচজনের মধ্যে যে-কোনও একজন যদি ছুটে বেরিয়ে যায় এই গুহা থেকে, তা হলে ওই জন্তুটা নিশ্চয় তাকে তাড়া করবে, আর সেই ফাঁকে বাকি চারজন হয়তো উলটো পথে দৌড়ে গিয়ে শাট্‌ল-এ উঠে পড়তে পারবে। অর্থাৎ, একজনের প্রাণের বিনিময়ে বেঁচে যাবে বাকি চারজন।

কিন্তু কে হবে সেই একজন, দলের চারজনকে বাঁচাবার জন্যে মিলিন্দ যাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন ?

সহকর্মীদের মুখের দিকে তাকালেন মিলিন্দ। তিনি জানেন, নেতার নির্দেশ ওরা কেউই অমান্য করবে না। যাকে আদেশ করবেন, সে-ই ছুটে বেরিয়ে যাবে এই গুহা থেকে। বেরিয়ে গিয়ে শাট্‌ল-এর বিপরীত দিকে দৌড়তে থাকবে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ক্ষুধার্ত জন্তুটার দৃষ্টিকে সে তার দিকে আকর্ষণ করতে একটুও দ্বিধা করবে না।

কিন্তু কাকে সে-কাজ করতে বলবেন মিলিন্দ ? জেনেশুনে কাকে তিনি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন ? ইদি ওকাবুকে, যাকে তিনি আত্মহত্যার পথ থেকে একদিন ফিরিয়ে এনেছিলেন ? পিটার জ্যাকসনকে ? জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে এনে যাকে তিনি মানুষের কল্যাণের কাজে লাগিয়েছেন ? রোবের সুস্তেলকে ? তাঁরই কথায় যে কিনা বিলাসের জীবন হাসিমুখে ছেড়ে এসেছে ? নাকি মালাকে, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যে-মেয়েটিকে তিনি তাঁর নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসেন ?

সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্তও দেরি হল না ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁরই হাতে জীবনের দায়িত্ব তুলে দিয়ে যারা নিশ্চিন্ত, তাদের কাউকেই তিনি এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে বলতে পারবেন না। তার চেয়ে বরং ব্যাপারটাকে তিনি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেবেন।

হাতে যখন কাজকর্ম থাকে না, মিলিন্দ তখন 'পেশেন্স' খেলেন। এ-খেলার সুবিধে এই যে, একা-একাই খেলা যায়, শুধু এক প্যাকেট তাস থাকলেই হল। পকেটে তাই সবসময়েই এক প্যাকেট তাস রাখেন মিলিন্দ। ট্রাউজার্সের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেই তাসের প্যাকেটটাকে তিনি বার করে আনলেন।

তাস শাফ্‌ল করতে-করতে মিলিন্দ বললেন, "ব্যাপারটা তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আমাদেরই মধ্যে একজনকে এই গুহা থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে হবে, যাতে শাট্‌ল-এর বিপরীত দিকে জন্তুটা তাকে তাড়া করে যায়, আর সেই ফাঁকে বাকি চারজন যাতে শাট্‌ল-এ গিয়ে উঠতে পারে। কে সেই দায়িত্ব নেবে, সেটা আমি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি, কেমন ?"

সঙ্গীদের কেউই কোনও কথা বলল না। কারও দৃষ্টিতে লেশমাত্র ভয় নেই। সকলেই মিটিমিটি হাসছে। মিলিন্দ বললেন, "বাস্, তা

হলে ওই কথাই রইল। আমি ডিল্ করছি। সবচেয়ে কম দরের তাস যার ভাগ্যে উঠবে, তাকেই ছুটে বেরিয়ে যেতে হবে এই গুহা থেকে। সে নিজে হয়তো মারা পড়বে, কিন্তু তারই জন্যে যে বাদবাকিরা বেঁচে যাবে, এটাই হচ্ছে বড় কথা।"

পিটার জ্যাকসনই প্রথম তার তাস তুলল। রুহিতনের সাহেব। পিটার বলল, "মনে হচ্ছে, আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে না।"

ইদি ওকাবু বলল, "আমি পেয়েছি হরতনের দশ। মনে হচ্ছে, আমিও এ-যাত্রা বেঁচে গেলুম।"

রোবের সুস্তেল বলল, "আমি পেয়েছি হরতনের বিবি। ক্যাপ্টেন, দেখা যাচ্ছে, আমার মৃত্যুও আপাতত মুলতুবি রইল।"

মালাকানু বলল, "আমি পেয়েছি ইস্কাবনের পাঁচ। সঙ্গীদের বাঁচাবার দায়িত্ব দেখছি আমাকেই নিতে হবে।"

সবশেষে তাস তুললেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর, তাসখানাকে ভাল করে দেখে নিয়ে পকেটে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, "না মালা, সম্মানটা তোমার কপালে জুটল না। তোমাদের বাঁচাবার দায়িত্ব দেখছি আমাকেই নিতে হল। আমি পেয়েছি চিড়িতনের তিরি।"

কথাটা বলেই মিলিন্দ চটপট উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "রোদ্দুর

পড়ে আসছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। তোমরা উঠে পড়ো। আমি পাহাড়ের দিকে ছুটব। জন্তুটা নিশ্চয় তাড়া করবে আমাকে। তোমরাও তৎক্ষণাৎ উলটো দিকে দৌড় লাগিয়ে শাট্‌ল-এ উঠে পড়বে। বিদায়।"

হিংস্র জন্তুটার পেটের তলা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর জন্তুটা তাঁকে তাড়া করতেই বাদবাকি চারজনও গুহা থেকে বেরিয়ে এসে উলটো-পথে শাট্‌ল-এর দিকে ছুট লাগাল।

শাট্‌ল-এ উঠেই স্টিয়ারিং হুইল হাতে নিল মালাকানু। তারপর, ছোট্ট মহাকাশযানটিকে মাটি থেকে ফুট-কুড়ি উপরে তুলে, কমিউনিকেশন চ্যানেলে মুখ রেখে তার তিন সঙ্গীকে বলল, "দলের নেতাকে ফেলে রেখে এক্ষুনি আমরা টাইটান মহাকাশযানে ফিরে যাব না। ক্যাপ্টেন যেভাবে ওই জন্তুটার থাবা এড়িয়ে ছুটছে, তাতে হয়তো বেঁচে যেতেও পারে। যদি বেঁচে যায়, তা হলে যেমন করেই হোক, এই শাট্‌ল-এ ওকে তুলে নিতে হবে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে মিলিন্দর পিঠের উপরে এসে পড়ল জন্তুটার থাবা। একটা ঝট্‌কা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু পারলেন না। মিলিন্দ বুঝতে পারলেন, জন্তুটার নখ তাঁর পিঠের চামড়ায় বসে যায়নি বটে, কিন্তু তাঁর পোশাকটা তার বাঁকানো নখে আটকে গেছে। পরক্ষণেই জন্তুটার থাবা তাঁকে মাটি থেকে অন্তত দশ ফুট উপরে তুলে ফেলল।

পিটার বলল, "জন্তুটা ক্যাপ্টেনকে নিয়ে খাদের ধার দিয়ে ছুটছে।"

রোবের বলল, "ক্যাপ্টেন ওর থাবা থেকে যেন একটা ন্যাকড়ার পুতুলের মতো ঝুলছে।"

ইদি বলল, "মালাকানু, পাহাড়টাকে চক্কর মেরে আমাদের শাট্‌লটাকে ওই খাদের দিকে নিয়ে চলো।"

পিটার বলল, "এখন তো আমরা নিরস্ত্র নই। শাট্‌লটাকে ওই জন্তুর মুখোমুখি করে দিয়ে শূন্যে একেবারে স্থির করে ভাসিয়ে রাখো। আমি আমার লেসার-গান চালাব।"

মালাকানু বলল, "শাট্‌লটাকে আমি ওর মুখোমুখি নিয়ে ভাসিয়ে রাখছি। কিন্তু পিটার, তুমি কিংবা রোবের লেসার-গান চালিও না। ইদির মাথা তোমাদের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা, টিপও তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল। ওকেই লেসার-গান চালাতে দাও।"

শাট্‌ল ততক্ষণে পাহাড়টাকে চক্কর দিয়ে খাদের ধারে জন্তুটার মুখোমুখি এসে পড়েছে। স্পিড কমাবার হাতলটাকে একেবারে জিরোর দিকে ঠেলে দিয়ে মালা সেটাকে পুরোপুরি স্থির করে শূন্যে ভাসিয়ে রাখল। এক সেকেণ্ড, দু' সেকেণ্ড, তিন সেকেণ্ড। তারপরেই ইদি ওকাবু টিপে দিল তার লেসার-গানের বোতাম।

বিশাল সেই জন্তুর শরীর তৎক্ষণাৎ ভীষণভাবে কেঁপে উঠল একবার। তারপরেই সে আছড়ে পড়ে গেল বার্বেরিসের চাঁদের এবড়ো-খেবড়ো জমির উপরে। আর ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঠিক সেই মুহূর্তেই তার থাবার থেকে ছিটকে বেরিয়ে খাদের মধ্যে পড়ে গেলেন। পড়তে-পড়তেই দু'হাত বাড়িয়ে একটা পাথরের চাঁইকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তিনি, তা নইলে আর মালাকানুর ঝুলিয়ে-দেওয়া দড়িটা ধরে তিনি শাট্‌ল-এ উঠে আসতে পারতেন না।

শাট্‌ল তার খানিক বাদেই টাইটান মহাকাশযানে ফিরে আসে। ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে অর্ধচেতন-অবস্থায় টাইটানের সিক-রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। এ হল কয়েক দিন আগের কথা। ইতিমধ্যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আজ তাঁকে সিক-রুম থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তার আগে টাইটান মহাকাশযানের কম্যাণ্ডার নোগিচো মাশাতাসি তাঁর সঙ্গে দরকারি দু-একটা কথা বলতে চান।

মাশাতাসি বললেন, "মিলিন্দ, কথাটা আর কিছুই নয়। তোমার বয়েস হয়েছে, তাই ঠিক হয়েছিল যে, কাজ থেকে অবসর নিয়ে তুমি এবারে পৃথিবীতে ফিরে যাবে। তুমি জানো, যে-ধরনের বিপজ্জনক কাজ আমাদের অনুসন্ধানী দলগুলিকে করতে হয়, পঞ্চাশের পরে আর তার দায়িত্ব কাউকে দেওয়া চলে না। কিন্তু তোমার টিমে যে নেক্সট ইন্ কম্যাণ্ড, সেই পিটার জ্যাকসন টাইটানে ফিরে যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে বুঝতে পারছি, বয়স যা-ই হোক, এক্ষুনি তোমাকে রিটায়ার করতে দেওয়া ঠিক হবে না। তোমার টিমও তোমাকে ছাড়তে আদৌ রাজি নয়। তাই আমাদের ইচ্ছে, আরও অন্তত কয়েকটা বছর তুমি কাজ চালিয়ে যাও।"

কম্যাণ্ডার মাশাতাসি বেরিয়ে গেলেন। ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার একটু পরেই বেরিয়ে এলেন সিক-রুম থেকে। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে পার হয়ে এলেন লম্বা করিডর। তারপর ৫০৩ নম্বর ঘরে এসে ঢুকলেন। টাইটান মহাকাশযানে এটাই তাঁর নিজের ঘর।

ভেবেছিলেন, ঘরে কেউ থাকবে না। তাই মিলিন্দ একটু অবাক হয়ে গেলেন, যখন দেখলেন যে, ইদি, পিটার, রোবের আর মালা তাঁর ঘরে বসে গুলতানি করছে। তাদের সামনে, টেবিলের উপরে, এক প্যাকেট তাস ছড়ানো।

মিলিন্দকে দেখে তারা আনন্দে হই-হই করে উঠল। মিলিন্দ কিন্তু একটুও হাসলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, "তাস খেলছ কেন? টাইটানে যে তাস খেলা নিষিদ্ধ, তা তোমরা জানো না?"

শুনে মুচকি হাসল সবাই। পিটার কী যেন বলতে যাচ্ছিল, মালা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "ক্যাপ্টেন, একান্নটা তাস দিয়ে কি খেলা যায়? প্যাকেটে মোট বাহান্নটা তাস থাকবার কথা, কিন্তু এই প্যাকেটে দেখছি একান্নটা রয়েছে। বাকি তাসটা তোমার পকেট থেকে তুমি বার করে দেবে?"

মিলিন্দ বললেন, "তার মানে?"

"মানে আর কিছুই নয়," মালা বলল, "যে-তাসটা এখানে পাচ্ছি না, সেটা হল ইস্কাবনের টেক্কা। সবচেয়ে বেশি দামের তাস। গুহার মধ্যে যখন তাস বাঁটা হয়, তখন এটাই তুমি পেয়েছিলে। কিন্তু এটাকে তুমি পকেটে ঢুকিয়ে রেখে অম্লানবদনে বলেছিলে যে, চিড়িতনের তিরি পেয়েছ। কেন বলেছিলে, তাও আমরা জানি। আমি পেয়েছিলুম ইস্কাবনের পাঁচ। তাই গুহা থেকে বেরিয়ে আমারই মৃত্যুবরণ করবার কথা। কিন্তু তুমি··· শুধু আমাকে কেন, দলের কাউকেই তুমি মৃত্যুবরণ করতে দিতে চাওনি। আর তাই··· মিথ্যে কথা বলে সবাইকে ধোঁকা দিয়ে তুমি নিজেই সেদিন মৃত্যুবরণ করবার জন্যে গুহা থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলে। তাই না? দাও, ক্যাপ্টেন, পকেট থেকে এবার ইস্কাবনের টেক্কাটা বার করে দাও।"

মিলিন্দ চুপ করে রইলেন। অবসর নিয়ে পৃথিবীতে ফেরা হয়নি বলে এখন আর তাঁর সত্যিই খুব দুঃখ হচ্ছিল না। কোথায় ফিরবেন তিনি? ছেলের কাছে? ইদি, পিটার, রোবের আর মালার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হচ্ছিল, এই এরাই তাঁর ছেলেমেয়ে।

★ *বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লেখা।*

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

রং বদলায়

সঙ্কর্ষণ রায়

জিপে জয়ন্তী পাহাড়ের জোয়াই শহর থেকে শিলচরের দিকে যাচ্ছি। চড়াই বেয়ে ওঠার পরে উতরাই দিয়ে নেমে যেতে শুরু করেছি। শিলং থেকে জোয়াই পর্যন্ত পাইনবনের মধ্য দিয়ে এসেছি। জোয়াই থেকে শিলচরের পথে এই উতরাইয়ের মধ্যে বনের চেহারা বদলাতে শুরু করেছে। পাইনগাছের জায়গা নিয়েছে বড় আকারের লাম্পাতি ও পানিসাজ। তাদের ফাঁকে-ফাঁকে আছে বাঁশগাছ, ফার্ন ও অর্কিড।

একটি সরু উপত্যকার মধ্যে এই বন যেখানে খুব ঘন হয়ে উঠেছে, সেখানে একজন খাসিয়া বুড়ি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে আমার জিপ থামাল। গাড়ি থেকে নেমে আমি বুড়িকে প্রশ্ন করি, "কী ব্যাপার, আমার জিপ থামালে কেন? কী চাও তুমি?"

"আমার ছেলেকে চাই," বুড়ি ব্যাকুল স্বরে বলল, "এই বনের মধ্যে আমার ছেলে হারিয়ে গিয়েছে। দু'দিন আগে ওই ঝরনার ধারে গিয়েছিল সে, সেখান থেকে সে উধাও হয়ে গিয়েছে।"

বলে সে তার ডান হাতটা তুলে রাস্তার ধারের ঝরনাটিকে দেখাল।

"তোমরা থাকো কোথায়?" আমি প্রশ্ন করি।

"এখানেই," বুড়ি জবাব দিল, "এখানে এই বনের মধ্যে আমার ছেলের সঙ্গে ক্যাম্প করে আছি। এখানে আমার ছেলে জড়িবুটি, শ্যাওলা, আগাছা ইত্যাদির নমুনা তুলছে। পিলিংয়ে ওদের ল্যাবরেটরি আছে, এইসব নমুনা সেখানে নিয়ে গিয়ে সে পরীক্ষা করবে।"

"এমনও তো হতে পারে যে, তোমার ছেলে নমুনাগুলো নিয়ে সোজা শিলং চলে গিয়েছে···।"

"না-না, কক্ষনো না। আমাকে না বলে সে কোথাও যাবে না। তা ছাড়া যেখানেই যাক, তার স্কুটারে চেপে যাবে। স্কুটার তো তাঁবুর বারান্দাতেই রয়ে গিয়েছে। এই বনের মধ্যেই আছে সে···ওকে খুঁজে বের করো···।"

"বনের মধ্যে আমি পাথর খুঁজছি, মানুষ খোঁজা তো আমার কাজ নয়।"

"পাথর খোঁজার সঙ্গে ওকেও খুঁজতে পারো, কেননা ও পাথরের কাছাকাছি ছিল। চলো, তোমাকে জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছি।"

বলে বুড়ি আমাকে হাত ধরে জিপ থেকে নামাল, তারপর টেনে নিয়ে চলল গাছপালার আড়ালে, চাপা-পড়া ঝরনাটির দিকে।

ঝরনার ধারে যেখানে সবুজ শ্যাওলা ধূসর রঙের পাথরকে সরের মতো ছেয়ে ফেলেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে সে বলল, "এখানেই ছিল সে। আমি ওকে ছুরি দিয়ে শ্যাওলা কেটে তুলতে দেখেছি। সে আমাকে বলেছিল যে, এই পাথরের স্তূপ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ সেন্টিমিটার অন্তর-অন্তর শ্যাওলার নমুনা তুলে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করবে।"

"কেন?" আমি প্রশ্ন করি, "কী হবে শ্যাওলা পরীক্ষা করে?"

"ওই শ্যাওলার মধ্যে নাকি নতুন ধরনের ব্যাকটিরিয়া আছে। এই ব্যাকটিরিয়াকে সে চিনে নিতে চায়। পরশু দিন ওর সঙ্গে এখানে এসেছিলাম, আমার ইচ্ছে ছিল ওকে ওর কাজে সাহায্য করি। কিন্তু ও বলল যে, একাই ওর কাজ করবে। তারপর আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল ক্যাম্পে, কিন্তু ফিরে এল না···।" বলতে বলতে বুড়ির বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

ঝরনার কাছে গিয়ে শ্যাওলা-ধরা পাথরের স্তূপ ও লতাঝোপের মধ্যে তন্ন-তন্ন করে খুঁজি আমি। পাথরের পর পাথর, ফার্ন, অর্কিড, ঘাস ও ঘাসফুলের পাশাপাশি রডোডেনড্রনের গুচ্ছ চোখে পড়ে। কিন্তু জনপ্রাণীর কোনও চিহ্ন নেই। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, একটা টিকটিকি বা গিরগিটিও নেই, পোকামাকড়, পিঁপড়েও দেখছি না, সবার ওপরে নেই কোনও পাখি।

হঠাৎ মনে এল রবীন্দ্রনাথের একটি গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি : বনে যদি ফুটল কুসুম, নেই কেন সেই পাখি?"

সত্যিই তো, বনে এত ফুল ফুটেছে, কিন্তু পাখি নেই কেন? পোকামাকড়, টিকটিকি, কাঠবেড়ালি, এরাই বা কোথায়? এমন তো

হওয়ার কথা নয়। বনের মধ্যে গাছপালার সঙ্গে পশুপাখি, কীটপতঙ্গের সহাবস্থান তো স্বাভাবিক ব্যাপার। তারা সব গেল কোথায়? গেলই বা কেন?

তারা নেই বলে কি বুড়ির ছেলেও নেই?

বুড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, "এখানে ঠিক কোথায় ছিল তোমার ছেলে? মানে কোথায় সে শ্যাওলা তুলছিল?"

"এই তো এখানে," বলে বুড়ি রডোডেনড্রনের গুচ্ছের পাশে একটি পাথরের চাতালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"এই তো লাল ফুলের পাশে কালো পাথর, তার সামনেই...," বলতে বলতে বুড়ির মুখের কথা মুখেই থেকে যায়, হঠাৎ তার ছোট-ছোট চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

"দেখেছ বাছা," বুড়ি রুদ্ধশ্বাসে বলে ওঠে, "এখানে লাল ফুল কীরকম বেগুনি হয়ে উঠেছে, ফুলের রঙ বদলাচ্ছে। কিন্তু ফুলের কি রঙ বদলায়?"

প্রশ্নটা বিঁধে যায় আমার মনের মধ্যে। ফুল ফোটে, বাতাসে গন্ধ বিলোয়, ঝরে পড়ে, কিন্তু তার রঙ কি বদলায়?

রঙ বদলানো উচিত নয়, কিন্তু তবু যে রঙ বদলাচ্ছে তা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার চোখের সামনে।

"কী রকম ভুতুড়ে ব্যাপার দেখেছ তো," বুড়ির গলার স্বর কেঁপে ওঠে, "ফুলের রঙ বদলায়, সঙ্গে-সঙ্গে আমার ছেলে অদৃশ্য হয়। নিশ্চয়ই কোনও ডাইনির কীর্তি এটা।"

"ঠিক বলেছ," আমি বললাম, "তবে এ-ডাইনি হচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস। সালফার ডায়োক্সাইড নামে এক ধরনের বিষাক্ত গ্যাস আছে, গন্ধক পুড়ে তার সৃষ্টি। সালফার ডায়োক্সাইড ফুলের রঙ বদলাতে পারে, লাল ফুল তার ছোঁয়ায় ক্রমে-ক্রমে সাদা হয়ে উঠতে পারে। এই গ্যাসের উগ্র গন্ধ সইতে পারেনি এখানকার পশুপাখি, পোকামাকড়, তোমার ছেলেও হয়তো। আচ্ছা তোমার ছেলের নাম যেন কী?"

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

"হঠাৎ থ্যাঙ্কস জানাবার কী হল। তোমার ছেলের নাম জানতে চাইছি বলে আমাকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছ তুমি?"

"না না, আমার ছেলের নামই থ্যাঙ্ক ইউ। বাছা, তুমি কি বলতে চাও যে, গন্ধক পুড়ে তৈরি-হওয়া গ্যাস থ্যাঙ্ক ইউকে অদৃশ্য করে দিয়েছে?"

"না না, তা নয়। আমার মনে হচ্ছে, গন্ধকের গ্যাস সইতে না পেরে পালিয়েছে থ্যাঙ্ক ইউ।"

"পালাল কোথায়? গ্যাস সইতে পারেনি তো ক্যাম্পে চলে এলেই পারত।"

"ক্যাম্প পর্যন্ত যেতে পারেনি হয়তো।"

"তবে কি পড়ে গিয়েছে নীচের খাদের মধ্যে," আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে বুড়ি।

"চেঁচিও না," আমি বললাম, "দেখছি সে গেল কোথায়। তোমার ছেলেকে দেখার আগে দেখা দরকার গ্যাস এখনও আছে কি না!"

চোখে দেখার আগে গন্ধেই টের পাই যে, গ্যাস আছে। চোখেও দেখি তাকে। সাদা ধোঁয়ার মতো বেরিয়ে আসছে পাথরের স্তর ভেদ করে।

সালফার ডায়োক্সাইডের উৎস তা হলে এই পাথর। পাথরের মধ্যে চাপা-থাকা গন্ধক পুড়ে সালফার ডায়োক্সাইডের সৃষ্টি, পাথরের ফাটল দিয়ে তা বেরিয়ে আসছে।

সালফার ডায়োক্সাইড বেরিয়ে আসছে, কাজেই পাথরের কাছে ঘেঁষতে পারি না। কিন্তু একটু তফাতে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পাথরটাকে চিনতে পারি। বেলেপাথর। বেলেপাথরের স্তরের নীচে কয়লার স্তরের আভাস পাই। এ-অঞ্চলে কয়লার মধ্যে গন্ধক আছে। গন্ধক আছে পাইরাইট রূপে। অর্থাৎ পাইরাইট গন্ধকযুক্ত খনিজ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কয়লার স্তরের মধ্যে গন্ধক পুড়ছে কী করে? পাইরাইট পুড়ছে, তাই গন্ধক পুড়ছে। কিন্তু পাইরাইট নিজের থেকে পুড়তে পারে না। অতএব ধরে নিতে হয় যে, কয়লা পুড়ছে। কয়লার স্তরের সঙ্গে-সঙ্গে পাইরাইট পুড়ছে, পাইরাইটের গন্ধক পুড়ে সালফার ডায়োক্সাইড সৃষ্টি হচ্ছে।

কিন্তু কয়লা পুড়ছে কী করে? কয়লার স্তরের মধ্যে কি স্বতঃস্ফূর্ত দহন চলছে? এ-প্রশ্নের জবাবের চেয়ে অবশ্য থ্যাঙ্ক ইউকে খুঁজে বের করা অনেক বেশি জরুরি। কোথায় থ্যাঙ্ক ইউ? ঝোপেঝাড়ে, পাথরের স্তূপগুলোর আনাচে-কানাচে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করি। ঝরনাতলার খাদের নীচে নেমেও দেখি। কিন্তু কোথাও কোনও চিহ্ন নেই তার। চিৎকার করে ডাকি, "থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।"

উত্তরে শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে আসে, থ্যাঙ্ক ইউ।

হঠাৎ বুড়ি উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, "থ্যাঙ্ক ইউ নেই, কিন্তু তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ আমার কানে আসছে। মনে হচ্ছে থ্যাঙ্ক ইউ ঘুমিয়ে পড়েছে। কাছেই কোথাও ঘুমিয়ে আছে সে।"

বুড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস শুধু নয়, চাপা একটা গোঙানির মতো আওয়াজও আমার কানে এল।

এই শব্দ অনুসরণ করে রডোডেনড্রনের গুচ্ছের পাশে একটা গুহার সামনে এসে দাঁড়াই। বুড়ি বলল, "এই গুহার মধ্যেই সে আছে বলে মনে হচ্ছে। চলো, ভেতরে ঢুকি।"

"না," বুড়ির হাত ধরে আমি বললাম, "সালফার ডায়োক্সাইডের গন্ধ এখানেও পাচ্ছি, এর মধ্যে ঢোকা নিরাপদ নয়।"

"কিন্তু থ্যাঙ্ক ইউ যে ঢুকে পড়েছে!"

"একটু অপেক্ষা করো বুড়িমা। জোয়াই থেকে গ্যাস-মাস্ক নিয়ে আসি, তারপর ঢুকব এর মধ্যে।"

জোয়াই থেকে গ্যাস-মাস্ক ছাড়া আমার এক ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে আসি। গ্যাস-মাস্ক মুখে দিয়ে আমরা দু'জনে ঢুকে পড়ি গুহার মধ্যে।

আন্দাজে ভুল করেনি বুড়ি, ওই গুহার মধ্যেই ছিল থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু ঘুমিয়ে নয়, অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল গুহার বেলেপাথরের মেঝের ওপরে।

থ্যাঙ্ক ইউয়ের জ্ঞান ফেরার পরে তাকে আমি প্রশ্ন করি, "তুমি কি সালফার ডায়োক্সাইড থেকে বাঁচার জন্য গুহার মধ্যে ঢুকেছিলে?"

"না," মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে জবাব দিল থ্যাঙ্ক ইউ, "গুহার মধ্যেও গ্যাস আছে, কাজেই গ্যাস থেকে বাঁচার জন্য গুহার মধ্যে ঢুকিনি। রডোডেনড্রন ফুলের মতো পাথরের গায়ে গজানো শ্যাওলারও রঙ বদলেছে সালফার ডায়োক্সাইডের ছোঁয়া লেগে। ওই গুহার মধ্যে শ্যাওলার সবুজ রঙ সাদা হয়ে গিয়েছে বলে গুহার মধ্যে ঢুকেছিলাম তার নমুনা নেওয়ার জন্য। জানেন মিস্টার রায়, ওই রঙ বদলানো শ্যাওলার মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ব্যাকটিরিয়া আছে বলে আমার ধারণা।"

থ্যাঙ্ক ইউয়ের ধারণা যে ভুল নয়, তার প্রমাণ তাদের শিলংয়ের ল্যাবরেটরিতে পায় সে। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার করে সে সালফার ডায়োক্সাইড গ্যাসের প্রভাবে রঙ-বদলানো শ্যাওলার মধ্যে। এ এক অদ্ভুত ধরনের ব্যাকটিরিয়া, যার খাদ্য গন্ধক। কয়লাকে গন্ধকমুক্ত করার জন্য কাজে লাগানো হতে থাকে এই ব্যাকটিরিয়া।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

মৃত্যুতালিকা

সুবোধ সরকার

জলে-ডোবা কাদার ভেতর দিয়ে অবয়বহীন প্রাণীগুলো ধীরে-ধীরে মহাকাশযানটির দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের শরীরে কোনও হাড় নেই। তুলো-ভর্তি বস্তার মতো মনে হচ্ছে। তাদের অগ্রগতি কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। প্রথম দিকে দু-একটি প্রাণীর শরীর বিশেষ রশ্মির সাহায্যে ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ফেটে ছড়িয়ে পড়া জেলি থেকে আবার নতুন করে জন্ম নিয়ে তারা সংখ্যায় ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল। চোখ নেই, মুখ নেই, পা নেই, হাত নেই—প্রাণীগুলো ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে। তাদের লক্ষ্য ওই মহাকাশযান।

ডঃ যোশি খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তাঁর ওপর দায়িত্ব অনেক। অনেক মানুষের জীবন নির্ভর করছে তাঁর সিদ্ধান্তের উপর। যা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। পৃথিবী থেকে এসে একমাত্র তাঁরাই পেরেছেন এই গ্রহে মহাকাশ-স্টেশন তৈরি করতে। কিন্তু তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, ধ্বংস মাত্র কয়েক হাত দূরে অপেক্ষা করছে। গত

দু'দিনের ভেতরেই ওই ভয়াবহ প্রাণীগুলো তাঁদের দুটি মহাকাশযান একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। তাদের শরীর থেকে নির্গত একরকম তীব্র অ্যাসিড ধীরে-ধীরে মহাকাশযানদুটিকে গলিয়ে কাদার ভেতর মিশিয়ে দিয়েছে।

কমাণ্ডার ডঃ যোশি তাঁর লম্বা দাড়িতে একবার হাত বেলালেন। তারপর মনে-মনে বললেন, দেখা যাক।

মিস্টার রঙ্গনাথন, যিনি এই মহাকাশ-স্টেশনের প্রধান টেকনোলজি অফিসার, এখনও আশা ছেড়ে দেননি। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে প্যাকেটের মুখটা খুলে ডঃ যোশির দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, "একটা ব্যবস্থা করা গেছে, চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বিশেষভাবে প্রস্তুত একরকম রশ্মি দিয়ে একটা দেওয়াল তুলে দেওয়া গেছে সামনের দিকটায়, কিন্তু তা দিয়ে তাদের বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না।" মিস্টার রঙ্গনাথন কথাগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারলেন। তাঁর খুব আশ্চর্য লাগছে প্রাণীগুলোর কথা ভেবে।

"আমাদের এই স্টেশন ছেড়ে যেতে হবে,"—খুব দ্রুত এই সিদ্ধান্তে এলেন ডঃ যোশি। যত দূর তাঁর চোখ যায়, দেখতে পেলেন বিশাল জলাভূমিটা একটা থকথকে জন্তুর মতো এগিয়ে আসছে। প্রাণীগুলোকে আলাদা ভাবে চেনা যাচ্ছে না আর।

মিস্টার রঙ্গনাথন বললেন, "ছেড়ে যাব ঠিকই, কিন্তু আপনি কি প্রাথমিক সমস্যাটা জানেন, স্যার?"

"হ্যাঁ জানি," ডঃ যোশি বললেন। তারপর সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে খুব বিষণ্ণ কণ্ঠে যোগ করলেন, "আমাদের দলের কুড়িজনকে এখান থেকে চলে যেতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে মৃত্যুর জন্য, মহাকাশযানটি সবাইকে নিয়ে যেতে পারবে না।"

"কারা-কারা যেতে পারবে তার তালিকা কি প্রস্তুত?" প্রশ্নটা এল ডঃ যোশির পেছন থেকে। তিনি ঘুরে দেখলেন, পাইলট রাও। রাও পাইলট হিসেবে অনন্য। তাঁর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। "আমার নাম যেন একেবারে শীর্ষে থাকে," হাসতে হাসতেই কথাগুলো বললেন পাইলট রাও। কিন্তু বোঝা যায় সেই হাসির ভেতর লুকিয়ে রয়েছে দুটো জিনিস। তা হল—অহংকার আর নিষ্ঠুরতা।

"দুঃখিত, পাইলট রাও, আমরা কেউই অপরিহার্য নই,"—ডঃ যোশি খুব স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন কথাগুলো।

"কিন্তু ভুলে যাবেন না কমাণ্ডার, এখান থেকে মহাকাশযানটিকে নিরাপদে নিয়ে যেতে আমিই সবচেয়ে সক্ষম ব্যক্তি।"

পাইলট রাওয়ের চোখ চিকচিক করে উঠল। তিনি যখন ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছেন, তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁরই সহযোগী পাইলট অবন মুখার্জি। খুবই কম বয়েস তাঁর, কিন্তু দক্ষতা তাঁরও আছে। তিনি রাওয়ের দুটো হাত নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বললেন, "এটা কী হচ্ছে পাইলট রাও, আপনি কি বুঝতে পারছেন না জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে আমরা এখানে সবাই সমান। আপনি শান্ত হোন।"

"ঠিক আছে, সবাইকে ডাকা হোক, কী মনে হচ্ছে, কতজন যেতে পারবে?" পাইলট রাও কথাগুলো বলে খুব বিশ্রীভাবে ডান ভুরুটাকে বাঁকালেন।

সেইদিকে তাকিয়ে ডঃ যোশি বললেন, "সেরকম কিছুই ঠিক করা হয়নি, সিদ্ধান্ত যা নেবার নেব আমরাই, কিন্তু কারা কারা যেতে পারবে তার তালিকা তৈরি করে দেবে আমাদের কম্পিউটার ক, খ, গ।"

ডঃ যোশি কম্পিউটারের কি-বোর্ডের সামনে এসে বসলেন। একটি মহাকাশযান, একশো চল্লিশ জনকে বহন করতে সক্ষম। সুতরাং একশো চল্লিশটি নামের তালিকার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন ডঃ যোশি। ডঃ যোশি পেছন ফিরে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা সমস্ত সেকশনে খবরটা পাঠিয়ে দিতে পারেন।"

সেন্ট্রাল কন্ট্রোল এরিয়াতে প্রত্যেকে অপেক্ষা করতে লাগলেন কম্পিউটার কার-কার নাম বাদ দেয় সেটা দেখার জন্য। প্রত্যেকের ভাগ্য ঠিক করে দিচ্ছে ওই ক, খ, গ। কম্পিউটার রোলার থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল নাম।

"আমার ব্যাগ গুছিয়ে নিই," আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বললেন পাইলট রাও। ব্যাগ গোছাতে চলে যাচ্ছিলেন পাইলট রাও। তখন তাঁকে থামালেন ডঃ যোশি।

"না পাইলট রাও, এই মহাকাশযানটিকে নিরাপদে পৌঁছে দেবার জন্য কম্পিউটার নাম করেছে আপনার সহযোগী পাইলট অবন মুখার্জির। ভাগ্যবানদের তালিকায় আপনার নাম নেই।" ডঃ যোশি পাইলট রাওয়ের মুখের দিকে তাকালেন। একটু থামলেন। তারপর বললেন "ভাগ্যবান ১৪০ জনের তালিকায় আমারও নাম নেই।"

"আমার নাম নেই? যাকে আপনারাই বলেন, দি বেস্ট ফ্লায়ার! আর কতগুলো যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি ওই কম্পিউটার মৃত্যু-পরোয়ানা দেবার কে? দিক, আমি মানছি না।" কথাগুলো পাইলট রাও বলার সময় দেখা গেল, তাঁর ঠোঁটের ডান দিকের কোণটা কাঁপছে।

"আমি কম্পিউটারের সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে মেনে নিয়েছি," বললেন ডঃ যোশি। "আপনি চিরকাল আমাদের শুনিয়ে এসেছেন আপনি কত বড় মাপের জিনিয়াস, সেটা এখন প্রমাণের সময় এসেছে পাইলট রাও।" কথা শেষ করে ডঃ যোশি তাঁর পকেট থেকে নিজের রুমাল বের করে রাওকে দিলেন। পাইলট রাও ঘামতে শুরু করেছেন।

"আমার খুবই খারাপ লাগছে, পাইলট রাও, আমি খুবই বিষণ্ণ বোধ করছি," পাইলট রাওয়ের পিঠে হাত রেখে অবন মুখার্জি দুঃখ প্রকাশ করলেন। এক ঝটকায় তাঁর হাত সরিয়ে দিয়ে পাইলট রাও ধমক দিয়ে উঠলেন, "তুমি একজন সামান্য অ্যাসিস্ট্যান্ট, আমার পিঠে হাত রাখার যোগ্যতা এখনও তোমার আসেনি।"

"এভাবে আর আমাদের সময় নষ্ট করা যাবে না," জানালেন মিস্টার রঙ্গনাথন। তিনি এও জানালেন, আরও এগিয়ে এসেছে সবুজ কাদার জলাভূমি।

কমাণ্ডার ডঃ যোশি ক্যাম্পের ভিতরে এলেন। পরিষ্কার গলায় কোনও আবেগ না রেখে তিনি মাইক্রোফোনের ছোট্ট মুখটিতে ঘোষণা করলেন হতভাগ্যদের নাম। ডঃ যোশির কণ্ঠ সমস্ত ঘরে-ঘরে পৌঁছে গেল। মৃত্যু-তালিকা পাঠ করার সময় যে নামটি তিনি প্রথমে পড়লেন, সেটি তাঁর নিজের।

তিনি প্রত্যেকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে জানালেন, "যাঁরা মৃত্যু-তালিকায় আছেন তাঁরা সেন্ট্রাল কমাণ্ডে রিপোর্ট করুন অনুগ্রহ করে, আর অন্যরা চলে যান মহাকাশযানের কাছে, জিনিসপত্র যা নেবেন তা যেন কখনওই তিন পাউণ্ডের বেশি না হয়।" বাঁ হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ডঃ যোশি আবার বললেন, "আমরা যাঁরা এখানে থেকে গেলাম, আপনাদের শুভ কামনা করি, আপনারাও আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন আশা করি।"

মুহূর্তের মধ্যে ছোটাছুটি লেগে গেল। দেখা গেল খুব দ্রুত এ-ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু মৃত্যু-তালিকার তেইশজনের

অনেকেই বুঝতে পারলেন, যাঁরা ভাগ্যবান তাঁদের অনেকেই তাঁদের দিকে তাকাতে পারছেন না। ভাগ্যবান ও ভাগ্যহীন—এরকম দুটো দলে ভাগ হয়ে গেলেন তাঁরা, যা কিছুক্ষণ আগেও ছিল না।

করিডর দিয়ে যাবার মুখে পাইলট রাও অবন মুখার্জির সামনে এসে দাঁড়ালেন, "তোমাকে কি আমি চিরকাল আমার ছোটভাইয়ের মতো দেখে আসিনি, অবন ? আমি যা জানি, তোমাকে কি সব শেখাইনি ? অবন, যে করেই হোক আমি বাঁচতে চাই।"

অবন মুখার্জি খুব ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর পাইলটের এরকম ভেঙে-পড়া তিনি কখনও দেখেননি। তিনি বুঝতে পারলেন না কী উত্তর দেবেন। ঠিক সেই সময়েই সেখানে উপস্থিত হলেন ডঃ যোশি।

"আমি শুনতে পেয়েছি পাইলট রাও, আমি আশা করব এক মুহূর্তও নষ্ট না করে আপনি পাঁচ নম্বর লেসার ব্যাটারির কাছে চলে যাবেন।"

"কমাণ্ডার, আপনি জানেন পৃথিবীতে আমার প্রচুর সম্পদ, আমি ফিরে গিয়ে আপনাকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে দেব, অনুগ্রহ করে···।"

"পাইলট রাও, আপনি আমার কথা অমান্য করতে শুরু করেছেন, আপনাকে কুকুরের মতো গুলি করতে পারি, সেকথা ভুলে যাবেন না।"

ওদিকে মিস্টার রঙ্গনাথন, যাঁর নামও মৃত্যু-তালিকায় রয়েছে, সেদিকে কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ না করে সবরকমের ঝুঁকি নিয়ে নিজের কাজ করে চলেছেন। অদ্ভুত রকমের পোশাক পরে রঙ্গনাথন তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ছোটাছুটি করছেন। তাঁর মাথায় শুধু একটাই চিন্তা, কী করে সময় বাঁচানো যায়। তিনি লেসার দেওয়ালের কাছ দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন কিছুটা কাদা লেগে তাঁর জুতোর মাথা গলে যাচ্ছে। বুঝতে পেরে দ্রুত সরে এলেন। সরে এসেই বুঝতে পারলেন মৃত্যু খুব কাছে এসে গেছে, আরও তাড়াতাড়ি তাঁদের কাজ করতে হবে।ওদিকে পাইলট রাও মানসিক ভারসাম্য হারাতে বসেছেন। যে করেই হোক তাঁকে বাঁচতেই হবে। পাঁচ-নম্বর লেসার ডিফেন্সে না গিয়ে তিনি ধীরে-ধীরে মহাকাশযান তিন-এর কাছে চলে এলেন। যে যাঁর প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। একফাঁকে পাইলট ঢুকে পড়লেন যানটির ভেতরে। ফ্লাইট-ডেকে ঢুকতে গিয়ে দেখতে পেলেন একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি পা টিপেটিপে তার পেছনে গিয়ে বাঁ হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে তার ঘাড়ে একটা আঘাত করলেন। একটি আঘাতেই লুটিয়ে পড়ল তার অজ্ঞান শরীর। তাকে পা দিয়ে সরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তিনি বসে পড়লেন পাইলট সিটে। যোগাযোগরক্ষাকারী একটা সুইচে আঙুল দিয়ে তিনি কথা বললেন। তাঁর কণ্ঠ সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। "শুভ সন্ধ্যা, ডঃ যোশি, আপনি নিশ্চয়ই আমার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছেন। শুনুন, আমি যদি না যেতে পারি, এখান থেকে জীবন নিয়ে কেউই ফিরতে পারবে না।"

"আমি শুনতে পাচ্ছি পাইলট রাও, আপনি নিজেকে সংযত করুন, এটা হয় না, হতে পারে না,"—ডঃ যোশি জানালেন।

"ডঃ যোশি, যদি আমি মারা যাই, আমরা সকলে মারা যাব," গার্গল করলে যেমন গলা হয়, তেমনি একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল মাইকে।

ডঃ যোশি বুঝতে পারছেন না কী করবেন। এদিকে খবর আসছে লেসার দেওয়ালের একটা অংশ কাজ করছে না। তারা ঢুকে পড়ছে। অন্যদিকে আর-একটি অংশে দেখা দিচ্ছে ত্রুটি। এদিকে ডেপুটি কমাণ্ডার জানতে চাইছেন মহাকাশযানটিকে আর ক'মিনিটের মধ্যে

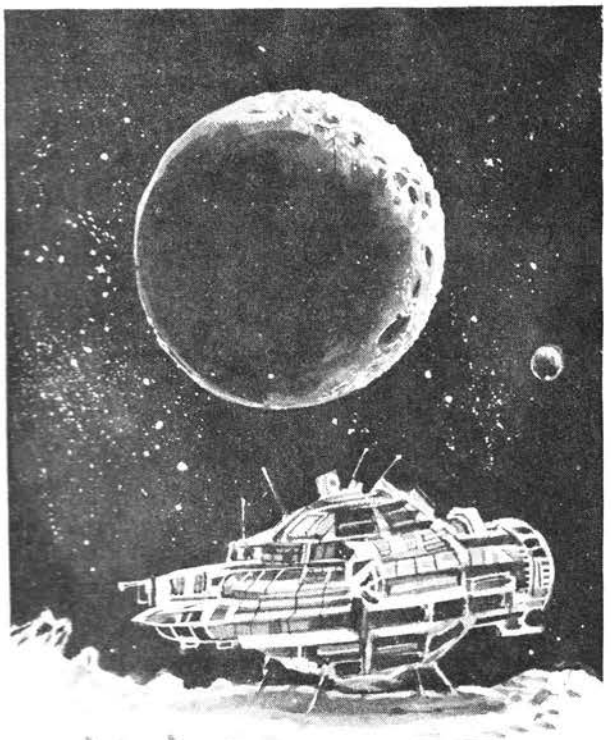

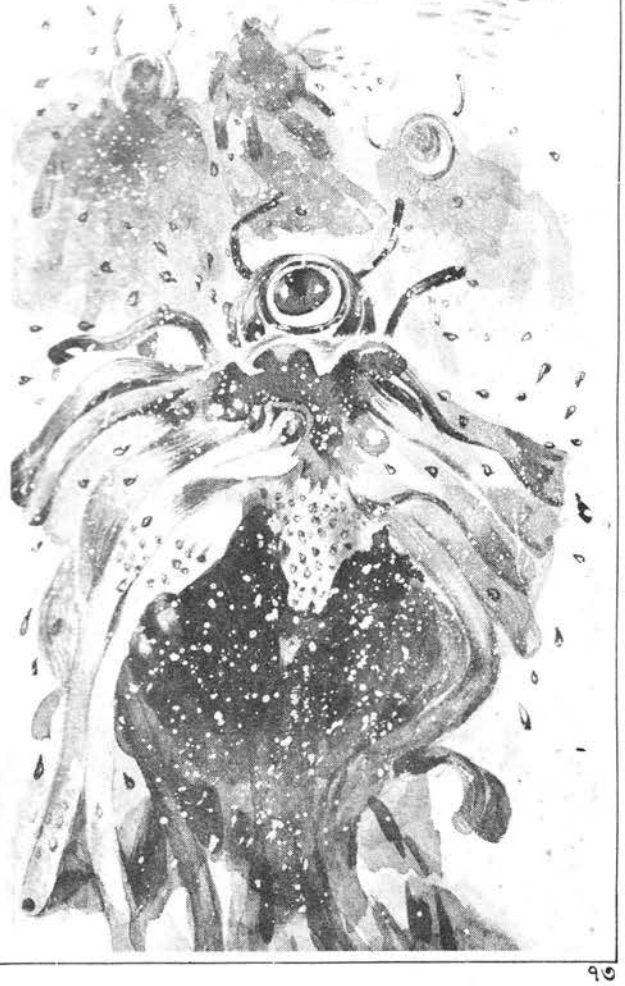

ছাড়তে হবে।

ডঃ যোশি দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে এলেন স্পেশাল ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। তাঁর নামও রয়েছে মৃত্যু-তালিকায়। "কোনওভাবে কি আমরা ফ্লাইট-ডেকটিকে মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারি না, মিস্টার বাজপেয়ী? মানে বুঝতেই পারছেন, আমি কীজন্য বলছি।"

"সেটা যে পারা যায় না, তা নয়, কিন্তু দেখতে হবে যাতে ফ্লাইট কন্ট্রোলের কোনওরকম ক্ষতি না হয়।"

"মাপ করবেন, স্যার," অবন মুখার্জির গলা, "আমি খুব ভাল করে চিনি পাইলট রাওকে, আমি একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"তুমি আমার ছেলের মতো, দ্যাখো, কিছু করা যায় কি না, কিন্তু আপনিও চেষ্টা করে যান, যে-করেই হোক ওকে ওখান থেকে নামিয়ে আনতেই হবে।" বাক্যটির প্রথম অংশ অবনকে অসহায়ভাবে বলে বাকি অংশটি ইঞ্জিনিয়ারকে জানালেন ডঃ যোশি।

ডঃ যোশি এলেন কর্মরত রঙ্গনাথনের কাছে। তিনি একটা বাক্স খুলে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করছেন। ডঃ যোশি খুব কাতর স্বরে বললেন, "জানি মিস্টার রঙ্গনাথন, আপনার ওপর খুব বেশি চাপ পড়ে যাচ্ছে, তবু কি লেসার-দেওয়ালকে আমরা আর-একটু শক্তিশালী করে তুলতে পারি না? আমি নিজেও ওই কাজে যোগ দিতে চাই, আমি পোশাক পরে আসছি···।"

"না, ডঃ যোশি, এ-কাজ আমাদের, আপনি একজন প্রকৃত বিজ্ঞানী, আপনার সিদ্ধান্তের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, তা ছাড়া আপনার বয়স হয়েছে, এ-কাজটা আমাদেরই করতে দিন।"

কথাগুলো শুনে এই মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও ডঃ যোশির বুক ভরে গেল।

পাইলট রাওয়ের চোখের পাতা পড়ছে না। তাঁর চোখ ক্রমশই লাল হয়ে উঠছে। তিনি পাইলট-সিটে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ভিডিও স্ক্রিনের দিকে। দেখতে পাচ্ছেন কাদার ভেতর দিয়ে উঠে আসছে প্রাণীগুলো, দেখতে পাচ্ছেন রঙ্গনাথন পাঁচ-ছ'জনকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

হঠাৎ পাগলের মতো অট্টহাস্য করে উঠলেন পাইলট রাও। তারপর বলে উঠলেন, "আমি সবাইকে বুঝিয়ে দেব আমি কী। প্রত্যেকে বুঝতে পারবে আমি কত বড়, কত বড় একজন পাইলট, কে বলেছে আমি অপরিহার্য নই?"

"পাইলট রাও, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?" অনেক দূর থেকে যেন ভেসে আসছে কথাগুলো, এরকম মনে হল রাওয়ের। আসলে দরজার তলার থেকে ভেসে আসছে কথাগুলো। চেতনায় ফিরে এসে পাইলট রাও লাফিয়ে উঠলেন। "ও! তুমি! তোমাকে আমি চিনি না? আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে চেয়েছিলে? কী ঔদ্ধত্য!"

কাঁচের ভেতর দিয়ে অবন মুখার্জি দেখলেন যে, পাইলটের হাতে পিস্তল, "ঠিক আছে আমি ক্ষমা চাইছি পাইলট রাও, কিন্তু আমাকে ভেতরে আসতে দিন, কয়েকটা কথা তো বলা যেতে পারে, আমি আপনার ছাত্রের মতো।"

"তোমার স্থান নরকে, এখানে নয়, যাও, ডঃ যোশিকে বলে দাও, তুমি থেকে যাচ্ছ এখানে, আর আমি চললাম একে উড়িয়ে নিয়ে।"

এদিকে, ইঞ্জিনিয়ার বাজপেয়ী মহাকাশযানটির নীচে দাঁড়িয়ে কাজ করে চলেছেন। তিনি ভাবতেও পারেননি এত তাড়াতাড়ি তাঁর পক্ষে এ-কাজ সম্ভব হয়ে উঠবে। জটিল সব সুইচবোর্ড এবং তার প্যানেলের ওপর সাজানো রয়েছে। তিনি যথা সম্ভব মাথা ঠাণ্ডা রেখে দুটো কেবল্ একসঙ্গে জোড়া দেবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কোনওরকমে ফ্লাইট-ডেকে অবন মুখার্জি প্রবেশ করতে পারলে ঘটনা অন্য খাতে প্রবাহিত হবে।

মিস্টার রঙ্গনাথনও তাঁর সহযোগীদের নিয়ে পরিশ্রম করে চলেছেন। সবুজ জেলির স্তূপ এগিয়ে আসছে ক্রমশ।

"খুলে গেছে,"—আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন বাজপেয়ী। ডঃ যোশি আনন্দিত মুখে ছুটে এলেন বাজপেয়ীর দিকে। ওপরে ফ্লাইট-ডেকের দরজা খুলে অবন মুখার্জি প্রবেশ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে ভূতগ্রস্তের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পাইলট রাও। তাঁর চোখ লাল, মনে হচ্ছে যেন এক্ষুনি ফেটে বেরিয়ে আসবে চোখের মণি।

অবন মুখার্জির বয়স কম। তাঁর হাত কেঁপে উঠল কিছুক্ষণের জন্য। কী করে এই উদ্‌ভ্রান্ত মানুষটার ওপর তিনি গুলি চালাবেন বুঝতে পারলেন না। কিন্তু এই দোলাচল অবস্থাই তাঁর জীবনের শেষ ভুল। উদ্‌ভ্রান্ত পাইলট রাওয়ের এমারজেন্সি পিস্তল থেকে এক টুকরো রশ্মি ছিটকে এল তরুণ অবনের নাকে। অবনের মৃত শরীর লুটিয়ে পড়ল। লুটিয়ে পড়ল সুইচ-বোর্ডের ওপর, যার ফলে পুনরায় কার্যক্ষমতা ফিরে পেল ফ্লাইট-ডেক।

পাগল হয়ে যাবার পূর্ব-মুহূর্তে মানুষ বোধহয় একবার ফের চেতনা ফিরে পায়। অনেকটা সেরকমই ঘটল পাইলট রাওয়ের ক্ষেত্রে। একদিকে মৃত অবনের শরীর আর অন্য দিক থেকে ছুটে আসা দশ-বারো জন, তাদের প্রত্যেকের হাতে মৃত্যুবর্ষী পিস্তল। দিশেহারা পাইলট রাও বুঝতে পারলেন তাঁর আর এ-জীবনে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া হল না। দ্রুত তাঁর হাতের পিস্তল নিজের নাকের কাছে স্থাপন করলেন, এবং ট্রিগার টানলেন।

ডঃ যোশি একটা সিগারেট বের করে ধরালেন। কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন রঙ্গনাথন। মহাকাশযান-তিন উড়ে গেছে এই গ্রহ ছেড়ে। একবার ঘড়ি দেখলেন ডঃ যোশি। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। খুব তাড়াহুড়ো করে কোনওরকমে অবনের শরীরটা নামিয়ে আনা গেছে। রাওয়ের মৃত শরীর ফ্লাইট-ডেকেই থেকে গেছে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ডঃ যোশি বললেন, "মিস্টার রঙ্গনাথন, আমাদের মধ্যে থেকে আর-একজন কিন্তু যেতে পারত, যদি পাইলট রাওয়ের শরীর নামিয়ে আনা যেত।"

রঙ্গনাথন হঠাৎ মৃদু হেসে ডঃ যোশিকে বললেন, "একবার কম্পিউটার চালিয়ে দেখবেন নাকি?"

"কেন বলুন তো?"

"না, এমনিই বলছিলাম, জাস্ট ফর ফান্, আমাদের ভেতর থেকে যে যেতে পারত, সেই ভাগ্যবানটির নাম জানতে ইচ্ছে করছে।"

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ডঃ যোশি হেসে ফেললেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "অবশ্যই দেখা যেতে পারে, চলুন।"

ওদিকে রঙ্গনাথনের নির্দেশে পুরোদমে কাজ চলেছে। যে করেই হোক প্রতিরোধ আরও শক্ত করে তুলতে হবে—এটাই এঁদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়।

আর কিছুক্ষণ পরেই হয়তো এঁদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে মৃত্যুর নিশ্বাস।

ডঃ যোশি ক, খ, গ,-র সুইচ-বোর্ডের সামনে এসে বসলেন, সুইচে হাত রাখার সঙ্গে-সঙ্গে যে নামটি স্ক্রিনে উঠে এল, তা হল 'পাইলট রাও'।

[অ্যাঙ্গাস অ্যালানের 'ডুমলিস্ট' গল্প অবলম্বনে]

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

স্পাইডারম্যান
লেখা : স্ট্যান লি
আঁকা : ফ্লোরো ডেরি
টুইপ !
অবিশ্বাস্য মাকড়সা-শক্তির অধিকারী পিটার পার্কার বৈজ্ঞানিক চাতুরি দেখিয়ে কৃত্রিম মাকড়সার জাল তৈরি করতে পারে...
সাধারণ একটা যন্ত্র, সেটাই তাকে দিয়েছে শহরের ছাদে ছাদে ঘুরে বেড়ানোর অবাধ অধিকার
আজ রাত্রে মাকড়সার আর দুঃসাহসিক অভিযান নেই । সুনাগরিকের মতোই আমি খবরের কাগজ পড়তে লাগলাম...
ওহো, কখনও ভাবিনি ওরা আবনের জিলডেনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে । এই শহরে সে খুবই প্রভাবশালী ।
ভাল কথা । যত প্রভাবশালী লোকই হোক, আইনের চোখে কেউ চিরদিন ধুলো দিতে পারে না ।
তবে আইনের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা ওরা করেই ।
বিচারপতি, এটাই আপনার শেষ সুযোগ । আমি বলছি, জিলডেনের বিচার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিন ।
তোমার থেকেও হোমরা চোমরা লোকদের হুমকি আগেও শুনেছি, হেজ । এখন দূর হও ।
তোমার কাকাকে বলো, হাওয়ার্ড ডান্টন, হেজ কখনও কাউকে হুমকি দেয় না । বন্ধুর মতো আমি কিছু উপদেশ দিই ।
বুঝতে পারছি না । হেজ বিখ্যাত ও সম্মানিত ব্যক্তি । আগামী নির্বাচনে সে গভর্নর পদে দাঁড়াচ্ছে । কিন্তু আপনি এমন ব্যবহার করলেন, যেন সে...
এই শহরের সব থেকে পাজি লোক । হ্যাঁ, সে ঠিক তা-ই
তাছাড়াও সে অত্যন্ত বিপজ্জনক । তোমার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল আমার তা একটুও ভাল লাগেনি !
!
এবার ক্ষমতার লড়াই !

স্পাইডারম্যান

লেখা : স্ট্যান লি
আঁকা : ফ্লোরো ডেরি

সুযোগ পেয়েও পিটার পার্কার তাঁর মাকড়সা-শক্তি প্রয়োগ করতে পারায়, এক অপরাধী আইনের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। সেই লোকটাই পরে পিটারের কাকাকে খুন করবে।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

(আগামী সংখ্যায় শুরু হচ্ছে টারজানের নতুন অ্যাডভেঞ্চার)

নতুন মানুষ

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

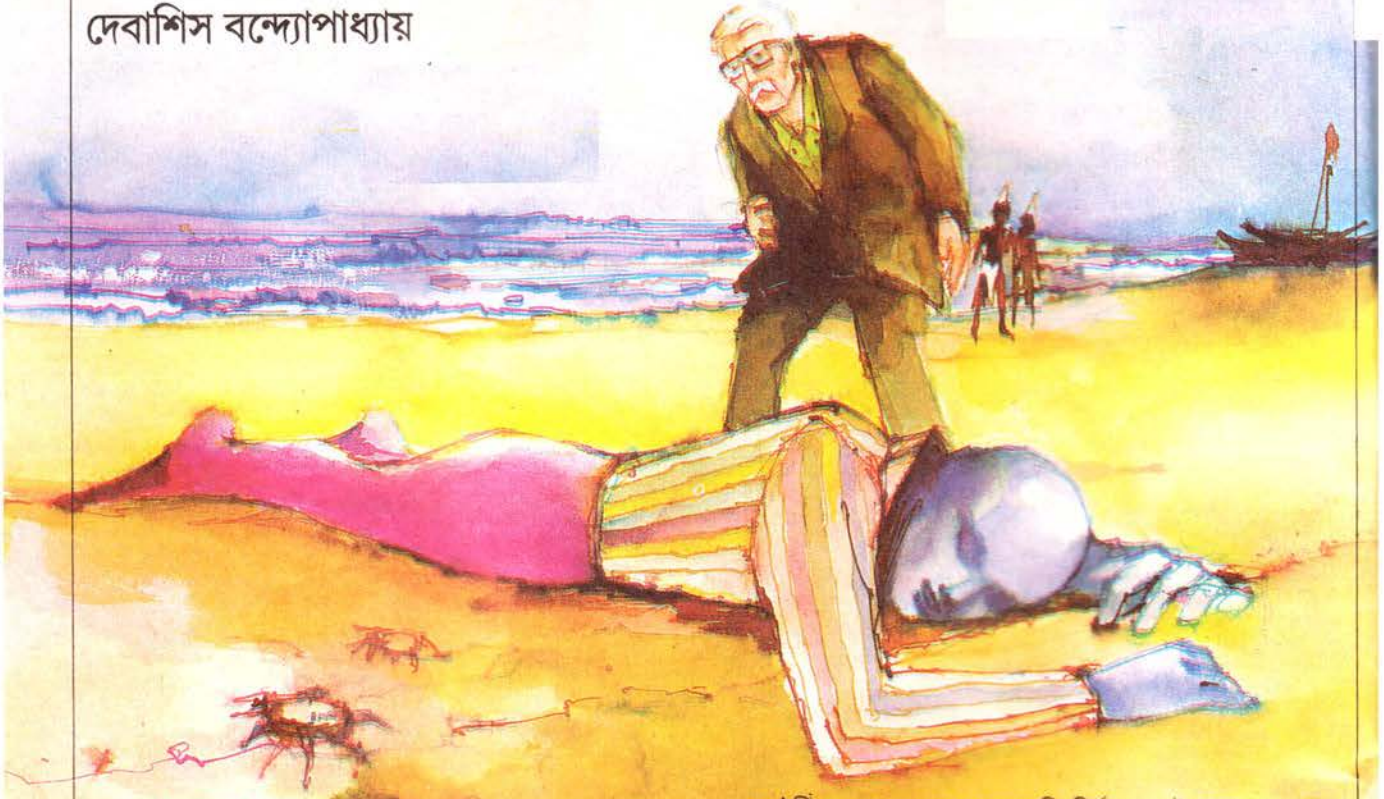

পুরী ও গোপালপুরের মাঝামাঝি নির্জন সমুদ্রসৈকতে ভোরবেলা লোকটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। প্রতিদিন ভোরবেলা অরবিন্দবাবুর পায়চারি করার অভ্যেস। তিনিই প্রথম মৃতদেহটি দেখতে পেলেন।

ঢেউয়ের কিনার ঘেঁষে তালগোল-পাকানো দেহটা যে আসলে মানুষের, তা দূর থেকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না। মনে হচ্ছিল, বড় একটা শুশুক বোধহয় ঢেউয়ে ভাসতে-ভাসতে ওখানে এসে ঠেকেছে। অরবিন্দবাবু পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে চমকে উঠলেন। একটা মানুষ মরে পড়ে আছে। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলেন, মেঘলা আকাশের নীচে বিশাল সৈকতে তিনি একা। বঙ্গোপসাগরের ঢেউ আদিমকাল থেকে সেই যে অশান্ত, বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে, আজও তার শেষ নেই।

পুরী বা গোপালপুরের মতো সমুদ্র-শহর হিসেবে এই জায়গাটা গড়ে ওঠেনি। সমুদ্রের কাছে জেলেদের পুরনো একটা গ্রাম। এ ছাড়া আশেপাশে আর জনবসতি নেই। জেলেদের একটি কুঁড়েঘর ভাড়া নিয়েছেন অরবিন্দবাবু। শীতের সময় প্রতিবারই তিনি কলকাতা

থেকে এখানে এসে মাসখানেক কাটিয়ে যান। ভিড় তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। সমুদ্রের সান্নিধ্যে একান্তে কয়েকটা দিন কাটানোর জন্য তিনি তাই এই জায়গাটাকেই বেছে নেন।

অরবিন্দবাবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলেন, যদি গ্রামের কাউকে পাওয়া যায়। জেলেরা ভোর-রাতে ডিঙি-নৌকোগুলো নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে যায়। অদ্ভুত এইসব নৌকো। হালকা কয়েকটা কাঠের তক্তা পাশাপাশি লাগিয়ে মোচার খোলার মতো একটা জিনিস ওরা তৈরি করে নেয়। এটাই ওদের নৌকো। দুরন্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে লুটোপুটি খেলেও নৌকাগুলো ডুবে যায় না। বিরাট এক-একটা ঢেউয়ের আছাড় ওরা অবলীলাক্রমে সহ্য করতে পারে। অরবিন্দবাবু ভেবেছিলেন, ওরকমই কিছু নৌকোয় গ্রামের কয়েকজন জেলেকে এখন দেখতে পাবেন। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। অর্থাৎ ওদের ফেরার সময় হয়নি। মৃতদেহটির পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এবার উনি কী যেন ভাবলেন। কে জানে, হয়তো আচমকা বড় কোনও ঢেউ এসে দেহটিকে আবার ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তাই এভাবে ফেলে যাওয়া উচিত নয়। দু'হাত দিয়ে তিনি মৃতদেহটিকে টানতে টানতে ডাঙার দিকে নিয়ে এলেন। আর সেই মুহূর্তেই চমকে উঠলেন অরবিন্দবাবু।

সেই প্রথম লোকটিকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ হল তাঁর। এক কিশোরের মৃতদেহ। দু'হাত দিয়ে দেহটিকে টানতে গিয়ে অরবিন্দবাবু টের পেলেন, কিশোরের চেহারা যতই শক্তপোক্ত হোক, ওর ওজন কিন্তু দেহের গঠনের তুলনায় বেশ কম। ফোলানো একটা জামা আর প্যান্ট ওর পরনে। পায়ের জুতো-জোড়া চ্যাটালো ও লম্বা। এ-ধরনের জুতো আমাদের ডুবুরিরাই সচরাচর ব্যবহার করে থাকে। অরবিন্দবাবু অবশ্য সবথেকে অবাক হলেন অন্য একটা ব্যাপার দেখে। তাঁর দু' হাতে আঠার মতো চ্যাটচেটে একটা জিনিস লেগেছে। শুকনো হাতে কী করে এই আঠার মতো জিনিসটা লাগল ? তখনই টের পেলেন, মৃত কিশোরের শরীরে এই আঠা লেগে আছে। দেহটি দু'হাত ধরে টানার সময় ওটা তাঁর গায়ে লেগেছে। অরবিন্দবাবুর হঠাৎ কী যেন মনে হল। তিনি তৎক্ষণাৎ মৃতদেহটিকে উপুড় করে শুইয়ে দেবার কথা ভাবলেন। তারপরই আবার নিজেকে সামলে নিলেন। মৃতদেহ নিয়ে নাড়াচাড়া করা ঠিক নয়। থানা-পুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে গেলে ছুটি কাটানোর আনন্দটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি নিজের ডেরায় ফিরে এসে ঠিক করলেন, থানায় একটা খবর পাঠাতে হবে।

ইতিমধ্যে জেলেরাও ফিরে এসেছে। আজ ওদের জালে ধরা পড়েছে বেশ কিছু পমফ্রেট। এমন টাটকা পমফ্রেট কলকাতায় সচরাচর মেলে না। জেলেরা এই মাছ নিয়ে পুরী বা গোপালপুরের বাজারে যাবে। জেলেদের ছেলে সামরু টাটকা মাছ দাঁড়িপাল্লায় অরবিন্দবাবুকে ওজন করে দিতে দিতে বলল, সে পুরী যাচ্ছে।

"তা হলে, তুই গিয়ে থানায় খবরটা দে।"

অরবিন্দবাবুর দিকে অবাক হয়ে তাকাল সামরু। কোট-প্যান্ট পরা এই প্রবীণ মানুষটি এই সাতসকালে নিশ্চয় রসিকতা করছেন না। সামরুর বয়স বছর-পনেরো হলেও, তার বুঝতে অসুবিধে হল না, পুরু চশমার আড়ালে গভীর উদ্বেগের ছায়া পড়েছে অরবিন্দবাবুর চোখে।

ওদিকে সৈকতে কারা হইচই জুড়ে দিয়েছে। চালাঘরের উঁচু দাওয়ায় বেরিয়ে এসে অরবিন্দবাবু যা ভেবেছিলেন, ঠিক তা-ই দেখতে পেলেন। মৃতদেহটিকে ঘিরে জেলেরা কয়েকজন জড়ো হয়েছে। কিছুটা উত্তেজনা, কিছুটা বিভ্রান্তি। শান্ত, ছিমছাম জীবনের ছন্দ ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছে মৃতদেহটি। জেলে-সর্দার সুমিনকে চেঁচিয়ে কী যেন বলতে শোনা গেল। তারপরই সুমিন হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মৃতদেহটির পাশে।

দুপুরের আগেই পুলিশের জিপ এসে হাজির। পুলিশ-অফিসার মিঃ মহান্তি এলেন অরবিন্দবাবুর কাছে। তাঁর কাছে সব খোঁজখবর নিলেন। ভোর থেকে যা-যা ঘটেছে তার বিবরণ দিলেন অরবিন্দবাবু। মিঃ মহান্তি তাঁর নোটবুকে সব লিখে নিয়ে, মৃতদেহটি জিপে তুলে পুরী ফিরে গেলেন। পুলিশ-অফিসার যেতে-না-যেতেই, জেলে-সর্দার সুমিন উত্তেজিত গলায় অরবিন্দবাবুকে যা বলল তা রীতিমত চমকপ্রদ। মরা মানুষটার গায়ে সে মাছের মতো আঁশ দেখতে পেয়েছে। তা ছাড়া, তার নাকের দুটো ফুটোয় ছিল চামড়ার ঢাকনি। যেন নাকে জল না ঢোকে। জেলে-সর্দার তার ষাট বছরের জীবনে এরকম মানুষ দেখেনি। তার দৃঢ় বিশ্বাস, মাছের মতো পাখনা আছে লোকটির। জামা খুলে দেখলেই সেটা ধরা পড়বে।

অরবিন্দবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়িতে ছোটখাটো যে লাইব্রেরিটি তিনি গড়ে তুলেছেন, সেখানে আছে বিবর্তন নিয়ে দুষ্প্রাপ্য বেশ কিছু বই ও পুঁথি। এরকম মানুষের বিবরণ তিনি কোনও বইয়েই পাননি। বিচিত্র শারীরিক গঠন নিয়ে কোনও-কোনও মানুষ জন্মায় বটে, কিন্তু আজ যে-মানুষটির নমুনা তিনি চাক্ষুষ দেখলেন, তাকে প্রকৃতির সে-রকম একটা খামখেয়ালিপনা বলে মেনে নিতে তাঁর মন রাজি নয়। এরকম একটা মানুষ আকস্মিকভাবে জন্মায়নি বলেই তাঁর সন্দেহ। তবে, নিছক সন্দেহই। প্রমাণ কিছু নেই। দেখা যাক, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট কী বলে।

পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে যা পাওয়া গেল, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। পোস্ট মর্টেম করেছিলেন ডাঃ রমেন গাঙ্গুলি। তিনি অরবিন্দবাবুকে চিনতেন। জানতেন, বিচিত্র সব ব্যাপারে অরবিন্দবাবুর আগ্রহ আছে। আগ্রহ আছে বলেই, বাড়িতে তিনি একটি ল্যাবরেটরি ও মিউজিয়মও তৈরি করে নিয়েছেন। পুরীতে নেমে, জেলেদের গ্রামে ছুটি কাটাতে যাবার আগে অরবিন্দবাবুও প্রতিবার ডাঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা করে যান। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর এবার পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটি নিয়ে ডাঃ গাঙ্গুলি সরাসরি অরবিন্দবাবুর কাছে উপস্থিত হলেন।

"দারুণ ব্যাপার মশাই। নিজে না দেখলে বিশ্বাস হত না।"

ডাঃ গাঙ্গুলিকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। ওঁকে আরও কোনও ভূমিকা করতে না দিয়ে অরবিন্দবাবু বললেন, "কী দেখলেন আগে সেটাই শুনি।"

"ছেলেটির আছে দু'জোড়া ফুসফুস। এমন অবস্থায় তাকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয় যে, তার জন্যই এই বাড়তি ফুসফুসের ব্যবস্থা। আমাদের ফুসফুস শুধু বাতাস থেকেই অক্সিজেন নিতে পারে। কিন্তু ছেলেটির আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। ভাবা যায় না। ঘাড়ে পালকের মতো বড়-বড় রোঁয়া। মনে হয়, জলের গভীরে সরাসরি অক্সিজেন নিয়ে এই রোঁয়াগুলো সেই অক্সিজেন পাঠিয়ে দেয় রক্তকণিকায়। হৃৎপিণ্ডও দেখলাম একেবারে নতুন ধরনের। সেখানে সাড়ে চারটি চেম্বার। অর্থাৎ মানুষের হৃৎপিণ্ডের থেকেও জটিল এই হৃৎপিণ্ড। নাকের ফুটো দিয়ে জল যাতে শরীরে না ঢোকে তার জন্য নাকে ঢাকনি দেওয়া আছে। ডাঙায় উঠলে আবার এই পাতলা চামড়ার ঢাকনিটা নিজে থেকেই ভিতরে গুটিয়ে যায়।"

জেলে-সর্দারের কথাটা মনে পড়ে গেল অরবিন্দবাবুর। সেও নাকে ঢাকনির কথা বলেছিল। ডাঃ গাঙ্গুলির কথা অবশ্য তখনও ফুরিয়ে যায়নি। ডাঃ গাঙ্গুলি কী বলছেন, শোনা যাক। তারপর সমস্ত

ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন অরবিন্দবাবু।

"ছেলেটির চোখ দুটোও অদ্ভুত। চোখ দুটো এমনই যে, কোথাও কোনও ধ্বনি বা প্রতিধ্বনি উঠলে এই চোখের তারায় ধরা পড়ে। চোখের পাতা নেই। আশেপাশে সূক্ষ্ম রাসায়নিক কোনও পরিবর্তন ঘটলে কিংবা অন্য কোনও প্রাণী নিঃশব্দে এসে উপস্থিত হলে এই চোখ দুটো তার সঙ্কেত দেয়।"

"তার মানে, তুমি বলতে চাও ছেলেটি জলের নীচে থাকত। ওর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো এমনই যে, জলের নীচে বাস করতে ওর কোনও অসুবিধাই হত না।

"নির্দিষ্টভাবে আমি কিছু বলতে চাই না। উভচর প্রাণীরও কিছু শারীরিক লক্ষণ ওর মধ্যে দেখেছি। তবে এটা ঠিক, জলের নীচে থাকলে হলে শরীর বিশেষভাবে তৈরি হওয়া দরকার। এবং ছেলেটির শরীর ঠিক সেরকমই।"

"ডেডবডি কি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ। তবে মিঃ মহান্তিকে অনুরোধ করেছি, তিনি যেন ডেড বডিটা বরফে জমিয়ে রাখেন। আমার মনে হয়, আরও খুঁটিয়ে দেখা দরকার। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে এরকম একটা জটিল মানুষ জন্মাতে পারে বলে আমার মনে হয় না।"

"তুমি বলছ, কেউ তাকে তৈরি করেছে?"

"অসম্ভব নয়। তবে হাতে যখন প্রমাণ নেই তখন এটা বলি কী করে। এটা কোনও ইঞ্জিনিয়ারের সৃষ্টি হলে আমি অবাক হব না।"

"ইঞ্জিনিয়ার্ড ম্যান? বলো কী!"

"ঠিক তা-ই। আপনি তো জানেন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের অসম্ভব কিছু নেই।"

"জিন নিয়ে গবেষণা কি এতদূর এগিয়ে গিয়েছে? এগিয়ে গেলেও আমরা তার খোঁজখবর পাইনি?"

"ওই ছেলেটার শরীর আরও চুলচেরা বিশ্লেষণ করুন। দেখবেন আরও অনেক কিছু জানতে পারবেন। ভবিষ্যতের মানুষের একটি প্রজাতি কেমন হবে তার অভ্রান্ত হদিস ওই ডেড বডির মধ্যে লুকনো আছে। তুতানখামান-এর রত্নভাণ্ডারের থেকেও দামি ওই ডেড বডিটা। আপনি একবার নিজে গিয়ে দেখুন।"

ডাঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় সন্ধে নেমে এসেছে। দুপুর থেকেই দু'জনে আলোচনা শুরু করেছিলেন। মাঝখানে অরবিন্দবাবু লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়েছেন। বারদুয়েক উঠে স্টোভ জ্বালিয়ে তৈরি করেছেন কালো কফি। কফির কাপে চুমুক দিতে-দিতে আবার দু'জনেই গভীর আলোচনায় ডুবে গিয়েছেন। বুঝতে পারেননি, সন্ধেও প্রায় ফুরোতে চলল। ডাঃ গাঙ্গুলির ফেরার সময় হয়েছে। বাইরে জিপ দাঁড়িয়ে। ওঁকে জিপে তুলে দিয়ে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালেন অরবিন্দবাবু। মাথার উপর সুবিস্তৃত আকাশ আর নক্ষত্রপুঞ্জ। নীচে কালো সমুদ্র। অরবিন্দবাবুর মনে হল, তিনি আদিম এক প্রকৃতির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। এই প্রকৃতির অনেক রহস্য আজও রহস্যই থেকে গেছে। মানুষ কয়েক হাজার বছরের চেষ্টায় এখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি রহস্যেরই জট খুলতে পেরেছে। আবার মানুষ নিজেও কম রহস্য সৃষ্টি করছে না। ওই রকমই একটি রহস্যের জাল তাঁর মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু অরবিন্দবাবুর আপাতত প্রশ্ন মাত্র দুটি। কে সৃষ্টি করল ওই উভচর মানুষ? আর এখানেই বা সে এল কী করে?

অরবিন্দবাবু লক্ষ করেননি, অন্ধকারে এক ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কথা শুনে প্রথমে তিনি চমকে উঠেছিলেন। তারপর বুঝতে পারলেন, সুমিন-সর্দার ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

"আমি সব কথা শুনেছি বাবু। ডাক্তারবাবু তোমাকে যা বলে গেল, সব আমি দাওয়ায় বসে শুনেছি। তোমরা আমাকে দেখতে পাওনি। আমি তো বলেছি বাবু, ওটা মাছ-মানুষ। জ্যান্ত ধরা পড়লে ভাল হত। তা হলে ওর কথা আমরা শুনতে পেতাম।"

"ও যে মানুষের ভাষায় কথা বলে, সেটা কি ধরে নেওয়া ঠিক হবে? জলের নীচে ঠোঁট নেড়ে ডাঙার মানুষের মতো কথা বলা যায় না। কথা শোনাও যায় না। ওই মানুষের হয়তো নিজস্ব ভাষা আছে।"

"ভাঙার মানুষের ভাষাও সে জানে বাবু। আমার তা-ই মনে হয়। ডাঙায় তো ওদের আসতে হবেই।"

এই কথাটাই এখনও স্পষ্ট নয় অরবিন্দবাবুর কাছে। সমুদ্রের নীচে যদি কেউ কোনও কলোনি বা উপনিবেশ গড়ে তোলে, তা হলে তাকে পৃথিবীর ভাষা জানতে হবে কেন? শরীরটাকেই যখন সে জলের নীচে বসবাসের উপযোগী করে নিয়েছে, তখন ভাষা কি আর সে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে না! সুমিন-সর্দারকে নয়, অরবিন্দবাবু এবার নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠলেন, ওরা মাছ-মানুষ নয়, জলের মানুষ। আর কেউ যদি সত্যিই ওরকম মানুষ তৈরি করে থাকে, তা হলে সে নির্ঘাত মানুষের প্রয়োজন মেটাতেই অন্যান্য প্রাণীও সৃষ্টি করবে। শুধুমাত্র বিশেষ কয়েকটা মানুষ সৃষ্টি করেই সে হাতগুটিয়ে বসে থাকবে না।

অরবিন্দবাবুর অনুমান যে অমূলক নয়, কয়েক দিন পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। মাইল-বিশেক দূরে ধরমপুরে ভোর রাতে জেলেদের জালে হঠাৎ এক কিম্ভূত প্রাণী ধরা পড়ল। খবর পাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ সেখানে দৌড়লেন অরবিন্দবাবু। সঙ্গে সুমিন-সর্দার। সুমিনই পথ দেখিয়ে তাঁকে সেখানে নিয়ে গেল। অরবিন্দবাবু যা দেখলেন, তার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এ তাঁর কল্পনার বাইরে।

বিশাল এক জলজ জন্তুকে জেলেরা ডাঙায় টেনে তুলেছে। জালে ধরা পড়ার সময় জন্তুটাকে যতটা ভারী মনে হয়েছিল, পরে দেখা গেল তা নয়। জালে আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে জড়িয়ে ডাঙায় তোলার জন্য কয়েকজন জেলে একসঙ্গে হাত লাগিয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, একজন জাল ধরে টানতেই জন্তুটা সুট্ করে ডাঙায় উঠে এল। বড় কথা, জন্তুটা এখনও প্রাণে বেঁচে আছে। সুমিন গিয়ে গা টিপে-টিপে দেখল। তাতে অবশ্য জন্তুটার আপত্তি দেখা গেল না। ওয়ালরাস বা সিন্ধুঘোটকের মতো চেহারা। চারটে পা। মাছের লেজের মতো লেজও আছে একটা। দেহের অনুপাতে চোখ দুটো খুবই ছোট। সুমিন আবার ওর গায়ে একটা খোঁচা দিতেই সে নড়েচড়ে উঠল। শুধু নড়েচড়েই উঠল না, ওজনও খানিকটা কমিয়ে নিল।

"দেখলেন বাবু, বেলুনের মতো হাওয়া-ভর্তি শরীর। ভুস্ করে হাওয়া বেরিয়ে গেল। চোখের সামনে দেখুন, কেমন চুপসে যাচ্ছে।"

অরবিন্দবাবুর অবশ্য তখন এসব কথা কানে ঢুকছে না। তিনি দেখলেন, জেলেদের ছোট ছেলে তামরু সমুদ্রের শ্যাওলা জন্তুটার মুখে গুঁজে দিতেই, সে কচ্‌মচ্ করে তা চিবোতে লাগল। তিনি আরও দেখলেন, দুগ্ধবতী গাভীর যেমন বাঁট থাকে, এই জন্তুর সেরকম বাঁট আছে। পলিথিনের নলের মতো দেখতে কয়েকটা নল সেই বাঁটে লাগানো। নলের মুখে বসানো আছে কল। অরবিন্দবাবু এটাও বুঝলেন যে, এই জন্তু ডাঙাতেও বেঁচে থাকে। তা না হলে, এতক্ষণ বেঁচে আছে কী করে?

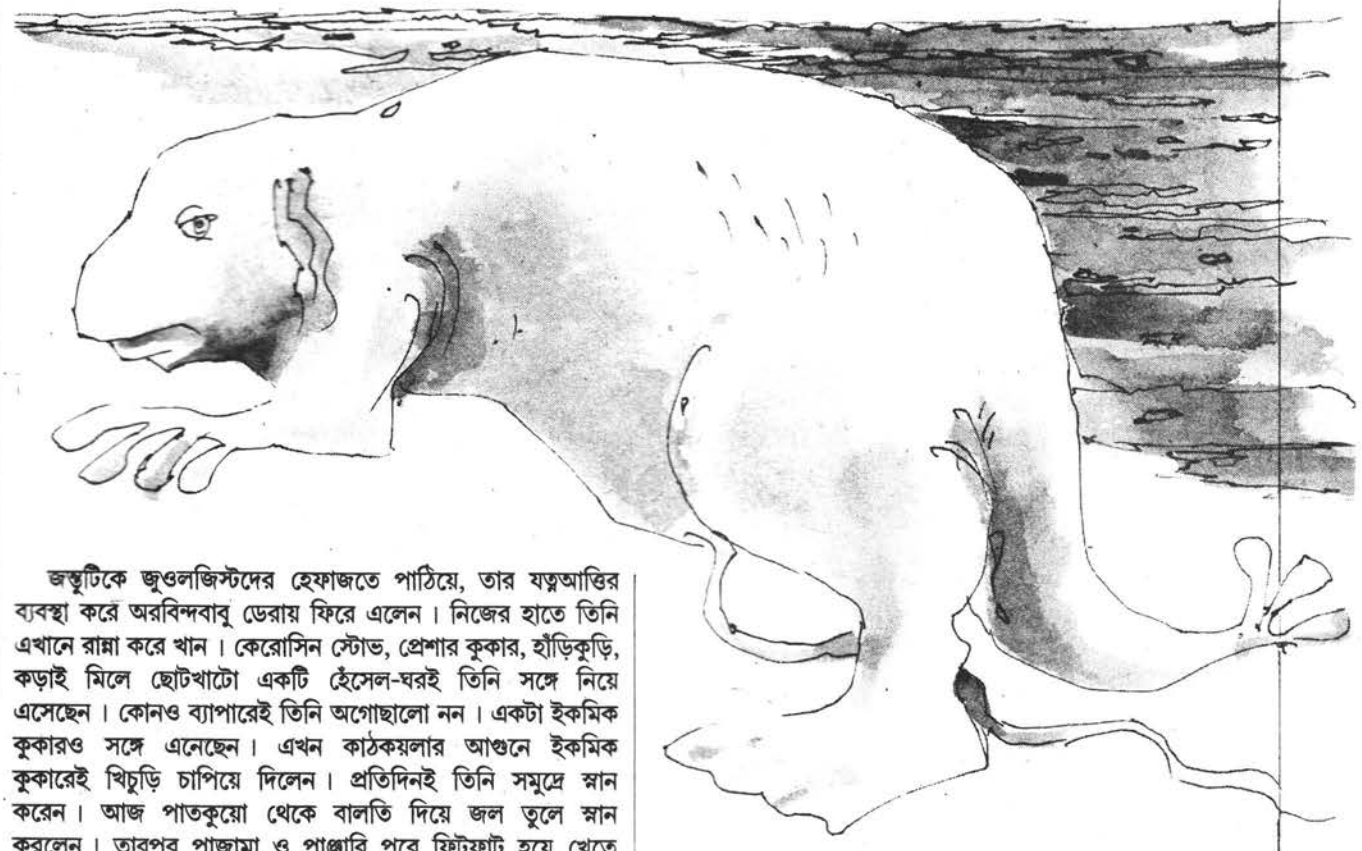

জন্তুটিকে জুওলজিস্টদের হেফাজতে পাঠিয়ে, তার যত্নআত্তির ব্যবস্থা করে অরবিন্দবাবু ডেরায় ফিরে এলেন। নিজের হাতে তিনি এখানে রান্না করে খান। কেরোসিন স্টোভ, প্রেশার কুকার, হাঁড়িকুড়ি, কড়াই মিলে ছোটখাটো একটি হেঁসেল-ঘরই তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। কোনও ব্যাপারেই তিনি অগোছালো নন। একটা ইকমিক কুকারও সঙ্গে এনেছেন। এখন কাঠকয়লার আগুনে ইকমিক কুকারেই খিচুড়ি চাপিয়ে দিলেন। প্রতিদিনই তিনি সমুদ্রে স্নান করেন। আজ পাতকুয়ো থেকে বালতি দিয়ে জল তুলে স্নান করলেন। তারপর পাজামা ও পাঞ্জাবি পরে ফিটফাট হয়ে খেতে বসলেন। গরম খিচুড়ি আর ডিমভাজা। সঙ্গে আলুসেদ্ধ। খাওয়ার দিকে আজ তাঁর একেবারেই মন নেই। খেতে-খেতে জানলা দিয়ে চোখ চলে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। দুপুরে হাওয়ার দাপট বাড়ে, সেইসঙ্গে দাপট বেড়ে যায় ঢেউয়েরও। ফুঁসে ওঠে সমুদ্র। ঢেউয়ের গর্জনে গর্জনে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। ঘরের পাশের খোলা মাঠে কখন জিপ এসে থেমেছে, অরবিন্দবাবু তাই তা টের পাননি। জিপের শব্দ ঢেউয়ের শব্দে চাপা পড়ে গিয়েছিল। ডাঃ গাঙ্গুলি ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে বছর পঁয়ত্রিশকের ছিপছিপে এক ভদ্রলোক। মাথার চুল অবিন্যস্ত। পথের লাল ধুলোয় গায়ের উরস্টেড কোটও রক্তিম আভা ধারণ করেছে। ভদ্রলোকের চেহারাটাও কেমন যেন উশকোখুশকো।

"আগে ওর সঙ্গে আপনার আলাপ করে দিই। বয়সে ও আমার থেকে অনেক ছোট হলেও, আমরা বন্ধুই বলতে পারেন। ওর সঙ্গে আমার আলাপ চণ্ডীগড়ে অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস-এ। আমি তখন চণ্ডীগড়ে একটা সেমিনারে গিয়েছিলাম। কেম্পিয়াও তখন ছুটিতে আমেরিকা থেকে কয়েক দিনের জন্য ওখানে এসেছিল। দারুণ ছাত্র। এম· আই· টি· ও প্রিন্সটনে সেলুলার অ্যাণ্ড মলিক্যুলার বায়োলজি নিয়ে গবেষণার পর ও এখন ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশনের বৃত্তি পেয়েছে। জিন-এর ওপর কাজ করছে। বিজ্ঞানী হিসেবে এই বয়সেই বেশ নাম করেছে কেম্পিয়া।"

"বোসো, বোসো। ভালই হল। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আলোচনা করা যাবে," অরবিন্দবাবু কেম্পিয়া ও ডাঃ গাঙ্গুলিকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন। বয়স মানুষকে একটা বাড়তি সুবিধে দেয়। অরবিন্দবাবুরও তাই হয়েছে। কেম্পিয়া নামীদামি বিজ্ঞানী হলেও, বয়সে তাঁর থেকে ছোট বলে তিনি তাঁকে প্রথমেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেন। তুমি বলে কাউকে সম্বোধন করলে, একটা স্নেহের সম্পর্কও তার সঙ্গে সহজেই পাতানো যায়। কেম্পিয়ার অবশ্য এ-ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেখা গেল না। ওকে ভেতরে-ভেতরে বেশ অস্থির বলেই মনে হল। আর সেই অস্থিরতা প্রবীণ অরবিন্দবাবুর চোখ এড়িয়ে গেল না।

"তা, কী মনে করে এখানে?" অরবিন্দবাবু একদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন।

কেম্পিয়ার হয়ে উত্তর দিলেন ডাঃ গাঙ্গুলি, "হঠাৎ খবর পেলাম ও দিল্লি এসেছে। তখনই ওকে টেলিগ্রাম করলাম। অদ্ভুত যে মৃতদেহটি পাওয়া গিয়েছে, সে-কথা জানিয়ে ওকে অবিলম্বে আমার কাছে চলে আসতে বলেছিলাম। টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্রই ও প্লেনে ভুবনেশ্বর হয়ে পুরী চলে এসেছে। আমিই ওকে আপনার কাছে নিয়ে এলাম।"

অদ্ভুত মৃতদেহ কিংবা সকালে-পাওয়া বিচিত্র জন্তুটি নিয়ে আলোচনার চেয়েও এই মুহূর্তে অরবিন্দবাবুকে অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহী দেখা গেল।

"দিল্লিতে কবে এসেছ? ছুটিতে নাকি? বাড়ি কোথায়?"

"বাড়ি ওর বাঙ্গালোরে। তবে দিল্লিতে সায়েন্স কংগ্রেসের কাজে এসেছে। আবার কয়েকদিন পরেই ফিরে যাবে। আমি ভাবলাম, মৃতদেহটা ওর দেখা দরকার। বিশেষ করে ও যখন এই লাইনেই কাজ

করছে।" ডাঃ গাঙ্গুলি কথা বলছেন কেম্পিয়ার হয়ে। মাঝখানে কেম্পিয়া নিজে কী যেন বলার চেষ্টা করল। কিন্তু ডাঃ গাঙ্গুলি তাকে থামিয়ে দিয়ে ওর মুখপাত্র হয়ে উঠলেন।

"তোমার বন্ধুটি বোধহয় নিজে কিছু বলতে চায় না? দিল্লি থেকে এতটা পথ উড়ে এসে ওকে কাহিল দেখাচ্ছে।" অরবিন্দবাবু মৃদু হেসে গাঙ্গুলিকে বললেন। কথাটা শুনে কেম্পিয়া নড়েচড়ে বসল। মনের অস্থিরতা সে কিছুতেই গোপন করতে পারছে না।

"ডেডবডিটা আমি দেখতে চাই। তা ছাড়া এ-নিয়ে আপনার কোনও ফাইন্ডিং আছে কি না সেটাও আমার জানা দরকার।" কেম্পিয়া অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল।

"ডেডবডি তো আমার হেফাজতে নেই। তুমি বরং পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আর আমার ফাইন্ডিং যদি কিছু থেকেও থাকে তা আমি তোমাকে জানাতে যাব কেন? যা বলার তা পুলিশকেই বলব। প্রথম আলাপেই কি সব কথা বলা যায়?" অরবিন্দবাবু সচরাচর কাউকে কড়া কথা বলেন না। কালেভদ্রে যদি সে-রকম কথা কাউকে বলেনও, তা হলেও গলার নরম সুরটি কিন্তু তাঁর অবিকৃতই থাকে।

"আমি আশা করি, বিজ্ঞানের স্বার্থে আপনি আমাকে সব কথা জানাবেন।"

"বিজ্ঞানের স্বার্থে?"

"যদি বলি ভারতীয় বিজ্ঞানের স্বার্থে?"

"ভারতীয় বিজ্ঞান, নাকি ভারতীয় বিজ্ঞানীর কথা ভেবেই আমাকে সব কথা বলতে হবে। দাবিটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি?" কথাটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন অরবিন্দবাবু। ভারতীয় বিজ্ঞানের স্বার্থ বলতে ঠিক কী বোঝাতে চাইছে কেম্পিয়া? আজ সকালে অদ্ভুত যে জন্তুটা ধরমপুরে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে, তার কথাও অরবিন্দবাবু বেমালুম চেপে গেলেন। কেম্পিয়া যেরকম ছটফট করছে, তাতে হয়তো সে নিজেই কিছু কথা কবুল করে বসবে। অরবিন্দবাবু একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, "আমি একটা অসমাপ্ত সভ্যতা আবিষ্কার করতে চলেছি। কেউ হয়তো ভাবছে জলের নীচে নতুন এক সভ্যতা গড়ে তোলা যায়। চাষবাসের জমি, খনি, বিদ্যুৎ, গৃহপালিত পশু কোনও কিছুরই অভাব থাকবে না সেখানে। আমি সেই সভ্যতার দুটি নিদর্শনের পরিচয় পেয়েছি। একটি মানুষ, অন্যটি গৃহপালিত পশু। পশুটিকে ঠিক কী বলব বুঝতে পারছি না। সামুদ্রিক গোরু, যে দুধ দেবে? আমি যা অনুমান করছি, তা ভুল নয়। কিন্তু, প্রশ্ন হল..."

"তার আগে বলুন, আপনি ওই সভ্যতাকে হাফ-ডান সিভিলাইজেশন বলে ধরে নিচ্ছেন কেন? যে ওই সভ্যতা সৃষ্টি করছে, সে কি মাঝপথে ইস্তফা দিয়েছে? সমস্ত ব্যাপারটাই তো এখনও এক্সপেরিমেন্ট-এর স্টেজে। এখনই শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক হবে?" অরবিন্দবাবুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে উঠল কেম্পিয়া। তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

"কোনও সিদ্ধান্তেই আমি পৌঁছতে চাইছি না। আমি অন্য কথা ভাবছি। জলের নীচে যদি সভ্যতা গড়ে ওঠে, তা হলে সে-সভ্যতা কেমন হবে? একেবারে আদি যুগের মতো অগ্নিহীন সভ্যতা? ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি না তো আমরা? আর জলের নীচে মানুষ কোনও ঋতু-পরিবর্তন দেখতে পাবে না। আসলে কোনও ঋতুই সেখানে থাকবে না। একঘেয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই তাদের দিন কাটবে।"

অরবিন্দবাবুর কথায় কেম্পিয়াকে চিন্তিত মনে হল। "আপনি ঠিকই বলেছেন। ঋতু-পরিবর্তন না-থাকলে মানুষের জীবনেও তার ছাপ পড়বে। মানুষের জীবন হয়ে উঠবে বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু তার আগে বলুন, সেই মানুষটিকে কেমন দেখলেন?"

"কার কথা বলছ?" না-বোঝার ভান করছেন অরবিন্দবাবু। নিশ্চল দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন কেম্পিয়ার চোখে।

"যার মৃতদেহ কয়েকদিন আগে এখানে পাওয়া গিয়েছে। যার পোস্টমর্টেম করেছেন ডাঃ গাঙ্গুলি।"

"তা-ই তো বলছিলাম জলের নীচে সভ্যতার প্রথম নিদর্শন ওই মানুষ। কিন্তু তুমি আমাকে আমার সব কথা বলতে দাওনি। আমি ভাবছি, কোথায় এই সভ্যতার কেন্দ্র? কে ওই প্রাণ সৃষ্টি করছে? এখানেই বা মৃতদেহটি ভেসে উঠল কেন? ছেলেটির মৃত্যুর কারণই বা কী? ডাঃ গাঙ্গুলি কিন্তু আমাকে ছেলেটির মৃত্যুর কারণ জানাননি।" পর পর কয়েকটা প্রশ্ন কেম্পিয়া ও ডাঃ গাঙ্গুলির দিকে ছুঁড়ে দিলেন অরবিন্দবাবু।

ডাঃ গাঙ্গুলি বললেন, "শ্বাসকষ্টে ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে। হয়তো জল থেকে ওঠার জন্যই তা হয়েছে।"

"কিন্তু তুমি তো বলেছ, উভচর প্রাণীর সব বৈশিষ্ট্যই ওর শরীরে আছে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু শ্বাসকষ্টই তার মৃত্যুর কারণ। কেন শ্বাসকষ্ট হল তার কোনও শারীরিক লক্ষণ মৃতদেহে ফুটে ওঠেনি। অর্থাৎ আমি পাইনি। এমনও হতে পারে, স্রষ্টার পরীক্ষানিরীক্ষা পুরোপুরি সফল হয়নি। তাঁর নির্মাণকৌশলেই হয়তো কোথাও ভুল থেকে গিয়েছে। এটা একটা রহস্য, যার উত্তর আমি জানি না।"

"রহস্যভেদ করবে পুলিশ। অন্তত এটা তাদের কাজ। আমি তাই তো কেম্পিয়াকে পুলিশের কাছে যেতে বলেছিলাম। যদি ওর কোনও আগ্রহ থাকে। জিন নিয়ে যখন সে গবেষণা করছে, তখন আমার মনে হয় শারীরবিদ্যার দিক থেকে ব্যাপারটা ওর খতিয়ে দেখা উচিত।" অরবিন্দবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

কেম্পিয়াকে নিয়ে ডাঃ গাঙ্গুলি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন অরবিন্দবাবু। একসময় উঠে গিয়ে স্টোভ জ্বালালেন। কফি তৈরি করে ধূমায়িত মগটি নিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসলেন। জানলা দিয়ে বাইরে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, অস্থির ঢেউগুলো যন্ত্রণায় আছড়াচ্ছে।

কয়েকদিন পর ধরমপুর সমুদ্র-সৈকতে আবার কেম্পিয়ার সঙ্গে তাঁর দেখা হল। কেম্পিয়া বলল, "এমন একটা দিন আসছে, যখন মানুষ নিজেই তার বিবর্তনের রূপকার হয়ে উঠবে। নিজের ইচ্ছে ও প্রয়োজনমতো সেদিন সে তার শরীরের বিবর্তন ঘটাবে।"

"তাতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রকৃতিকে হয়তো আমরা অস্বীকার করতে চাই। তাই নিজেরাই নিজেদের বিবর্তনের রূপকার হতে চাইছি।" অরবিন্দবাবু বললেন।

"এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, যখন এই বিবর্তন ছাড়া আর উপায় থাকবে না।" কেম্পিয়া হাসতে-হাসতে বলল। প্রথম দিন যাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছিল, সেই কেম্পিয়াকেই এখন বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। ধরমপুরের নির্জন সৈকতে সেদিন সে কী করছিল, কেনই বা সে তখনও দিল্লি বা আমেরিকা ফিরে যায়নি, তা আর জিজ্ঞেস করতে যাননি অরবিন্দবাবু।

কিন্তু এর থেকেও তাঁর একটা বড় প্রশ্ন ছিল। স্রষ্টারা কেন নিজেদের আদলে নতুন পৃথিবীর মানুষ সৃষ্টি করছেন না? স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির এই তারতম্য কি নতুন পৃথিবীর মানুষ ভাল চোখে দেখবে?

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

নীলমূর্তি রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : সন্তু তার কলেজের দুই বন্ধু জোজো আর অরিন্দমকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল বারুইপুরে। সেখানে জোজোর পিসেমশাই অংশুমান চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। এই অংশুমান চৌধুরী অনেকদিন ধরে চেনেন কাকাবাবুকে ; কিন্তু কাকাবাবুর ওপর তাঁর দারুণ রাগ। তিনি কাকাবাবুর ওপর প্রতিশোধ নিতে চান। একদিন কাকাবাবুর নাম করে দু'জন লোক বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেল সন্তুকে। তারপর কাকাবাবুর খোঁজ করতে-করতে সন্তু হাওড়া স্টেশনে উঠে পড়ল একটা ট্রেনে। সেখানে সে কাকাবাবুর বদলে দেখতে পেল তার বন্ধু জোজোকে, অজ্ঞান অবস্থায়। ওদিকে অংশুমান চৌধুরীও কাকাবাবুকে জোর করে ধরে নিয়ে চলেছেন অন্য একটা ট্রেনের কামরায়। তারপর ...

সন্তুর নাম শুনে কাকাবাবু একটু থমকে গেলেন। সম্বলপুরে সন্তু ? দু'জন ভদ্রলোক একদিন একটা বিদঘুটে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল তাঁর কাছে। একটা নীল পাথরের মূর্তি উদ্ধারের ব্যাপার। তাঁকে সম্বলপুর নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল খুব। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেখানেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সন্তুকে আগেই ধরে নিয়ে গেছে। এই অংশু চৌধুরী লোকটিকে পাগল বলে মনে হয়। সন্তুকে নিয়ে কী করবে কে জানে !

কাকাবাবু দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বললেন, "মিঃ চৌধুরী, আমার ওপর আপনার রাগ থাকতে পারে, তা বলে আমার ভাইপো একটা ছোট ছেলে, তাকেও জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন ? আপনাকে আমি ভদ্রলোক ভেবেছিলাম ! সন্তুর কলেজ খোলা, পড়াশুনো নষ্ট হবে ...."

অংশু চৌধুরী মেঝে থেকে তাঁর রুপো-বাঁধানো লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে সেটার ওপর এমন মমতার সঙ্গে হাত বুলোতে লাগলেন, যেন সেটা তাঁর নিজের হাত কিংবা পা।

মুখ না তুলে তিনি বললেন, "আপনাকে ক্রাচ দুটো ব্যবহার করতে দিয়েছি, সেটাই কি আমার ভদ্রতা নয় ? তা বলে যখন-তখন এই ক্রাচ তুলে মারতে আসবেন, এটাই কি আপনার ভদ্রতা ? আমি ইচ্ছে করলেই আপনার ক্রাচ দুটো সরিয়ে রাখতে পারতুম কি না ? তখন তো এক পা'ও হাঁটতে পারতেন না !"

তরুণ ডাক্তারটি এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাকাবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বলল, "এইরকম মারামারির ব্যাপার হবে জানলে আমি আসতুম না। আমাকে এনগেজ করা হয়েছিল ট্রেনে একজন অসুস্থ লোকের দেখাশুনো করার জন্য।"

অংশু চৌধুরী বললেন, "তোমার কাজ ফুরিয়ে গেছে। আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল ! তোমাদের মেডিক্যাল সায়েন্স যা জানে না, সেরকম একটা ওষুধ আমি আবিষ্কার করেছি। সেই ওষুধ একটা পিনের ডগায় অতি সামান্য একটু লাগিয়ে যে-কোনও মানুষের শরীরে ফুটিয়ে দিলে, সে পাঁচ-ছ' ঘন্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়বে ! কত বড় আবিষ্কার ভেবে দ্যাখো তো ! বড়-বড় খুনে-ডাকাতকেও এই সামান্য একটা পিন ফুটিয়ে কাবু করে দেওয়া যাবে ! এই আবিষ্কারের জন্য আমার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত !"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার সেই ওষুধ আমার গায়ে ফুটিয়ে পরীক্ষা করেছেন ? আমাকে জিজ্ঞেস না করে ?"

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর দিকে আঙুল তুলে বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন ! আমার ঝুলিতে এরকম আরও অনেকরকম ওষুধ আছে, বুঝলেন ? কাজেই, এর পরে আর হঠাৎ ওরকম যখন-তখন ক্রাচ তুলে মারবার চেষ্টা করবেন না। আপনার একটা পা তো নষ্ট হয়ে গেছেই, এরপর যদি আপনার একটা হাত কিংবা একটা চোখ নষ্ট হয়, সেটা কি ভাল হবে ?"

কাকাবাবু সামান্য হেসে বললেন, "আপনি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন বুঝি ? আমাকে মেরে ফেলা বরং সহজ, কিন্তু আমাকে ভয় দেখানো খুব শক্ত !"

অংশু চৌধুরী ডাক্তারটির দিকে ফিরে হুকুমের সুরে বললেন, "পাশের কিচেনে গিয়ে বলুন তো, আমাদের জন্য কফি আর টোস্ট দিতে। একটু খিদে-খিদে পাচ্ছে।"

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, অংশু চৌধুরী গোটা একটা সেলুন-কার ভাড়া নিয়েছেন। অনেক টাকার ব্যাপার। এত টাকা কে খরচ করছে ? অংশু চৌধুরী নিজে না সম্বলপুরের সেই দুই ভদ্রলোক ? নীল পাথরের মূর্তিটা তা হলে সাধারণ কোনও মূর্তি নয়। এবারে তাঁর কৌতূহল জেগে উঠল। মূর্তিটা একবার অন্তত দেখা দরকার। তা ছাড়া সন্তুকে যদি সম্বলপুরে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে সে-পর্যন্ত তো যেতেই হবে !"

দরজার কাছ ছেড়ে তিনি সিটে এসে বসলেন।

অংশু চৌধুরী কাষ্ঠ-হাসি হেসে বললেন, "আপনার ভাইপোর জন্য চিন্তা করছেন তো ? আপনি আপনার ভাইপোর পড়াশুনোর কোনও খোঁজখবরই রাখেন না। ওদের কলেজে পরীক্ষার সিট পড়েছে বলে পরশু থেকে ওদের সতেরো দিন ছুটি। এই ছুটিতে আমাদের সঙ্গে একটু জঙ্গলে বেড়িয়ে আসবে, তাতে ক্ষতি কী ? আপনারও চোখ কিংবা হাত নষ্ট করার ইচ্ছে আমার নেই। আমি শুধু আপনার মাথা ন্যাড়া করে দিতে চাই। আমার মতন আপনার মাথাতেও চুল থাকবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "মিঃ চৌধুরী, আপাতত আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি বরং আর-একটু ঘুমিয়ে নিই। সম্বলপুর এলে আমায় ডেকে দেবেন।"

"আপনি কফি-টোস্ট খাবেন না ?"

"ধন্যবাদ, এখন আমার আর কিছুর দরকার নেই।"

কাকাবাবু লম্বা সিটের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে পাশ ফিরে চোখ বুজলেন। কয়েক মিনিট বাদে ঘুমিয়ে পড়লেন সত্যি-সত্যি।

কয়েক ঘন্টা বাদে একজন কেউ তাঁর গায়ে ঠ্যালা মেরে জাগাল। কাকাবাবু চোখ মেলে দেখলেন, এ সেই রোগা ভিমু।

সে বলল, "উঠুন স্যার, নামতে হবে।"

কাকাবাবু উঠে বসলেন। ট্রেন থেমে আছে। কামরার দরজা খোলা। ডাক্তারটি আগেই নেমে গেছে, অংশুমান চৌধুরী মাথায় টুপি পরে, ছড়িটি হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে এক-দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কাকাবাবুর দিকে।

অংশু চৌধুরী বললেন, "আপনি নামুন আগে। আমি সব-শেষে নামব। ভিমু, সব ঠিকঠাক আছে তো?"

ভিমু বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার!"

এমনসময় প্ল্যাটফর্মে ঘ্যা-ঘ্যা ঘ্যা-ঘ্যা করে একটা দিশি কুকুর ডেকে উঠল। অংশু চৌধুরী সঙ্গে-সঙ্গে আর্ত চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ভিমু! ও কিসের ডাক? কোন্ জন্তুর?"

ভিমু বলল, "স্যার, চারজন কুলি লাগিয়েছি সব কুকুর-বেড়াল তাড়িয়ে দিতে। একটা বোধহয় কোনওরকমে আবার এদিকে চলে এসেছে। ওরা ঠিক তাড়িয়ে দেবে!"

অংশু চৌধুরী বললেন, "আগে দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখে নাও, সব ক্লিয়ার কি না!"

ভিমু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অনেকখানি মুখ ঝুঁকিয়ে দিয়ে বলল, "ওই যে চলে যাচ্ছে, একটা ছোট্ট নেড়ি কুত্তা! এই, ভাগাও, ভাগাও, একদম বাহার হাটাও, উধার খাড়া রহো!"

অংশু চৌধুরী বললেন, "প্ল্যাটফর্মে গন্ধ স্প্রে করে দাও.! আমি এখানেও বদ গন্ধ পাচ্ছি।"

কাকাবাবু পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছে নিলেন। তারপর ক্রাচ দুটি বগলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

প্ল্যাটফর্মে তিন-চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। কাকাবাবুকে দেখে একজন এগিয়ে এসে বলল, "নমস্কার রাজাবাবু। নমস্কার! পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো? বড্ড লম্বা জার্নি। ঘুম হয়েছিল আশা করি?"

কাকাবাবুকে সিঁড়ি দিয়ে নামবার জন্য খানিকটা কসরত করতে হয়। সেই লোকটি কাকাবাবুকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেও কাকাবাবু নিজেই কোনওরকমে নামলেন নীচে। তারপর বললেন, "আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না!"

নীল রঙের সাফারি স্যুট পরা লম্বা-মতন সেই লোকটি বিগলিত ভাবে হেসে বলল, "আমার নাম অসীম পট্টনায়ক। আমার দাদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আপনার মতন বিখ্যাত লোক যে এখানে আসতে রাজি হয়েছেন, সেজন্য আমরা খুব কৃতজ্ঞ হয়েছি। আজ সন্ধেবেলাতেই মিটিং, আপনি দুপুরে রেস্ট নিয়ে নেবেন, তারপর ..."

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "মিটিং? কিসের মিটিং?"

যুবকটি বলল, "এখানকার দু-তিনটে ক্লাব মিলে একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করেছে, সেখানে আপনি আপনার দু-চারটি অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাবেন। আমার দাদা বলেছেন যে, আপনি আসতেই চাইছিলেন না ...আমরা খুব আশা করে ছিলাম ..."

যুবকটি পিছন ফিরে বলল, "এই, মালা, মালা কোথায়?"

পেছন থেকে দু'জন লোক ফুলের মালা নিয়ে এগিয়ে এল এবং কাকাবাবু কোনও আপত্তি জানাবার আগেই তাঁর গলায় পরিয়ে দিল।

কাকাবাবু মনে-মনে হাসলেও মুখের ভাবটা গম্ভীর করে রাখলেন। তাঁকে যে জোর করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, তা যাতে কেউ বুঝতে না পারে সেইজন্যই বোধহয় এইসব ফুলের মালা-টালার ব্যবস্থা! মিটিং-এ বক্তৃতা দেবার কথা তো তাঁকে এর আগে কেউ একবারও বলেনি।

অসীম পট্‌নায়ক বলল, "আসুন স্যার, এদিকে আসুন। গাড়ি রয়েছে।"

কাকাবাবু বিনা প্রতিবাদে এগিয়ে গেলেন ওদের সঙ্গে। ট্রেন জার্নির পরই তাঁর স্নান করতে ইচ্ছে করে। জামাকাপড় পালটাতে ইচ্ছে করে। তাঁর সঙ্গে অন্য কোনও পোশাক নেই। এইসব চিন্তাই তাঁর মাথায় ঘুরছে এখন, অন্য কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

স্টেশনের বাইরে এসে একটা বড় স্টেশন-ওয়াগনে উঠতে গিয়ে তিনি দেখলেন, কাছেই একটা থামের আড়ালে একটা ছোট্ট বেড়াল

ছানা বসে আছে গুটিসুটি মেরে। কাছাকাছি আর কোনও কুকুর-বেড়াল দেখতে পেলেন না। ভিমুর লোক সেগুলোকে সব তাড়িয়ে দিয়েছে, এই বেড়ালছানাটা বোধহয় ওদের চোখে পড়েনি।

গাড়িতে উঠে কাকাবাবু অসীম পট্‌নায়ককে জিজ্ঞেস করলেন, "এখান থেকে কত দূর যেতে হবে?"

অসীম বলল, "খুব বেশিদূর নয়, স্যার। মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জার্নি।"

"যাবার পথে আমরা কি শহরের মধ্য দিয়ে যাব?"

"তা যেতে পারি। যদিও অন্য রাস্তা আছে। কেন বলুন তো স্যার?"

"একটা জামাকাপড়ের দোকানের সামনে থামতে হবে। আমার দু-একটা গেঞ্জি-জামা কেনা দরকার।"

"সেজন্য চিন্তা করবেন না, স্যার। সেসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমাদের এখানে যখন দয়া করে এসেছেন, তখন আপনার সব দায়িত্ব আমাদের।"

"আমার গেঞ্জি-জামা আমি নিজে দেখে কিনতে চাই।"

"বলছি তো স্যার, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওই তো, উনিও এসে গেছেন।"

কাকাবাবু দেখলেন স্টেশনের গেট পেরিয়ে বাইরে আসছেন অংশু চৌধুরী। চোখে কালো চশমা। একহাতে তিনি নিজের নাক টিপে আছেন, অন্য হাত ধরে আছে তাঁর সহকারী ভিমু। খুব সম্ভবত চোখ বুজে আছেন অংশু চৌধুরী।

অসীমরা এগিয়ে গেল তাঁকে গাড়ির কাছে খাতির করে নিয়ে আসার জন্য। অংশুমান চৌধুরীর জন্য আর-একটা আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা করা আছে। পাশেই সেই গাড়িটা দাঁড়ানো। সে-গাড়ির সব কাচ রং-করা। সিনেমার নায়ক-নায়িকারা এইরকম কাচ-তোলা গাড়িতে যায়।

অংশু চৌধুরী সেই গাড়ির কাছে এলেন। তখনও চোখ খোলেননি। তবে নাক থেকে হাতটা সরিয়ে বললেন, "ভিমু, আমার লাঠিটা কই?"

ভিমু বলল, "লাঠিটা যেন কার হাতে দিলাম? লাঠি, লাঠি, এই, স্যারের লাঠিটা দাও!"

অংশু চৌধুরী বিরক্তভাবে বললেন, "আমার লাঠি তুই অন্যলোকের হাতে দিয়েছিস? ইডিয়েট, বলেছি না, ওটা কক্ষনো কাছছাড়া করবি না। কোথায় গেল লাঠি, কে নিল?"

উত্তেজিতভাবে অংশু চৌধুরী একটু ঘুরে দাঁড়াতে যেতেই তাঁর এক পায়ের একটা ধাক্কা লাগল বেড়াল-ছানাটার গায়। অমনি বেড়ালছানাটা ভয় পেয়ে খুব জোরে ডেকে উঠল, 'ম্যা-ও-ও! ফ্যাঁচ!'

সঙ্গে-সঙ্গে অংশু চৌধুরী তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "ও কী? ওটা কী? ওরে ভিমু, ওটা কোন্ প্রাণী?"

অসীম বলল, "ও কিছু নয়, স্যার। একটা সামান্য বেড়ালছানা!"

অংশু চৌধুরী বললেন, "আমায় আঁচড়ে দিয়েছে? ভিমু, আঁচড়ে দিয়েছে? কামড়ে দিয়েছে?"

ভিমু বলল, "না স্যার, কিছু করেনি!"

অংশু চৌধুরী বললেন, "হ্যাঁ, আঁচড়ে দিয়েছে। আমি টের পাচ্ছি! জ্বালা করছে। ওরে বাবারে, মেরে ফেললে আমাকে! ভিমু, বিশ্বাসঘাতক ..."

কথা বলতে-বলতে অংশু চৌধুরী অতবড় লম্বা শরীরটা নিয়ে ধপাস করে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। (ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

ডেরাকাটা সামা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : ইস্কুলের ফাংশানে মজার সব কাণ্ড। বেঁটে আর লম্বু নিতুকে নিয়ে পালিয়েছিল। সুকু, কমল ভৌমিক এবং ডি· এম· ধরে ফেলেন। লম্বু আসলে গোয়েন্দা-লেখক সুদর্শন। পরে বেঁটে উধাও হল, ডি· এম'ও চলে গেলেন। বাড়ি ফেরার পথে সুদর্শনের হার্ট অ্যাটাক হল। ডক্টর মুখার্জি বললেন, এ-রোগ সাহারা মরুভূমির বেদুইনদেরই হয়। সবাইকে নিয়ে ডক্টর মুখার্জি টিয়াসাঁকোর আলম সাহেবের ডেরার ভেতরে ঢুকলেন। টর্চের আলোয় দেখা গেল ডালা-খোলা একটা কফিন। তার ভেতরে চিত হয়ে শুয়ে আছে একজন মানুষ। মনে হয় আলম সাহেব, মারা গেছেন। ডক্টর মুখার্জি কুলুঙ্গি থেকে সাপের বিষের শিশিটি নিয়ে বাইরে এলেন। সবাই হাসপাতালে ফিরলেন, কমল ভৌমিক চললেন ডক্টর মুখার্জির বাড়িতে খবর দিতে। পথে শিউপুজন নামে একজন লোকের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া শুরু হল। তারপর···

রাস্তার ওপারে ফাঁকা মাঠ। সেখানে ছোটমতো একটা মন্দির। মন্দিরের সামনে একটা আটচালা। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। উঁচু বাঁশের ডগায় হলুদ পতাকা সকালের বাতাসে ফুরফুর উড়ছে। শিউপুজন আর কমল ভৌমিক হনহন করে এগিয়ে চলেছেন সেই দিকে। পেছন পেছন চলেছে একদঙ্গল লোক। বহত মজা। কলকাতার বাবুর সঙ্গে জোর লড়াই। দঙ্গলে বেশ স্বাস্থ্যবান প্রবীণ একজন বুক ফুলিয়ে চলেছেন। বেশ ভাল সাজগোজ। চিকনের-কাজ-করা হাফ-হাতা বুক-খোলা পাঞ্জাবি পরেছেন। চেক-চেক সিল্কের লুঙ্গি। বুকের ওপর দুলছে সোনার একটা পদক। পায়ে খটখটে শুঁড়-তোলা নাগরা। দোকানের সামনে দোমড়ানো সাইকেলটা সেইভাবেই পড়ে আছে।

আখড়ায় এসে দঙ্গল থেমে পড়ল। সামনেই মহাবীরের মন্দির। পইতেধারী দেহাতি এক ব্রাহ্মণ। পরনে মালকোঁচা মারা লাল একটা কাপড়। ব্রাহ্মণ পুজোয় বসার আয়োজন করছেন। সাহায্য করছে বাচ্চা একটা ছেলে। ফুটফুটে সুন্দর। ছেলেটি দুলে-দুলে মালা গাঁথছে। ব্রাহ্মণ চন্দন ঘষছেন শিলে।

দঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন, "কেয়া তমাশা ?"

শুঁড়ওলা-নাগরা লোকটি বললেন, "লড়াই হোগা।"

ব্রাহ্মণ বললেন, "জয় মহাবীর বোলো।"

নাগরা কমল ভৌমিক আর শিউ পুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুনা, মহারাজনে কেয়া কহা ? বোলো, বোলো, জয় মহাবীর বোলো।"

কমল ভৌমিকের মহাবীরে তেমন ভক্তি নেই। তিনি হেঁকে বললেন, "জয় রামচন্দ্র কী জয়।"

শিউপুজন হাঁকলে, "পবন-সূত হড়ুমাঁড়চন্দ্র কী জয়।"

বলেই সে আখড়ার মাটিতে মারলে এক লাফ। নরম তুলতুলে তেলে-ভেজা মাটি দেবে গেল সামান্য। পূজারী ব্রাহ্মণ পূজার দালানে দাঁড়িয়ে বিশাল একটা শিঙ্গায় ফুঁ মারলেন। পোঁ-পোঁ করে বিকট একটা শব্দ হল। আর তখনই একটা সাদা ধবধবে গাড়ি মাঠের ওপারের রাস্তায় এসে থামল।

সেই দিকে তাকিয়ে নাগরা বললেন, "কেয়া বাত ! চৌবেসাব কাঁহাসে আ গইল বা।"

গাড়িটাকে থামতে দেখেই পূজারী ব্রাহ্মণ শিঙ্গা ফেলে এক লাফে চাতাল থেকে নেমে গাড়ির দিকে ছুটলেন।

যাঁকে চৌবেসাব বলে সবাই কেমন যেন হয়ে গেলেন, সেই বীর বাহাদুর চৌবে এই মহল্লার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সাঙ্ঘাতিক তাঁর দাপট। দাপট তো হবেই। বীর বাহাদুরের বাবার নাম ছিল আগ বাদাদুর। তাঁর বাবার নাম ছিল রণ বাহাদুর। তাঁর বাবার নাম ছিল জিত বাহাদুর। এই জিত বাহাদুর সিপাহি বিদ্রোহের সময় ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া অ্যান মেরিকে বাড়ির ইঁদারার মধ্যে তিন রাত লুকিয়ে রেখেছিলেন। মেয়েটি সেপাইদের আক্রমণ থেকে বেঁচে গেলেও পরে নিউমোনিয়ায় মারা গিয়েছিল। মারা যাবার তিন মিনিট আগে উট্রমকে ফিসফিস করে একটি কথাই বলতে পেরেছিল, 'মাই সেভিয়ার।' তার মানে জিত বাহাদুর আমার প্রাণ রক্ষা করেছে। সেই জিত বাহাদুরকে ইংরেজ সরকার পরে সাতমহলার জমিদার করে দিলেন।

জমিদারি পেয়ে যে জিত বাহাদুর ইংরেজ মেয়ের প্রাণ বাঁচালেন, সেই জিত বাহাদুর কমসে-কম দু-তিনশো দেশোয়ালি ভাইকে যমের বাড়ি পাঠালেন। কী তাঁর দাপট। শোনা যায়, চেহারাটাও ছিল যম দূতের মতো। বাদামি রঙের তাজা একটা ঘোড়ায় চড়ে টগবগিয়ে মহল্লা টহল দিতেন।

বীর বাহাদুর চৌবে তাঁরই বংশধর।

বীর বাহাদুর গাড়ি থেকে দেহটাকে টেনেটুনে বের করলেন। পাক্কা ছ'ফুট লম্বা। তিনি নামলেন। সঙ্গে-সঙ্গে নামলেন তাঁর স্ত্রী। প্রায় মাথায়-মাথায় লম্বা। এত সুন্দরী যে, জায়গাটা যেন ঝলমল করে উঠল। এপাশ-ওপাশ থেকে নেমে এলেন দাস-দাসী। গাড়ি থেকে বেরোতে লাগল পুজোর জিনিসপত্তর। সে যেন শেষ নেই।

চৌবেসাহাব লম্বা-লম্বা পা ফেলে মন্দিরের দিকে এগোতে লাগলেন। পেছন-পেছন চলেছেন তাঁর স্ত্রী, সঙ্গী লোকজন। আর মন্দিরের পূজারী পাশে-পাশে চলেছেন কুঁজো হয়ে, হাত কচলাতে-কচলাতে। বড়লোক ভক্ত এসেছেন। হাজার হাজার টাকার

জিনিসপত্র নিয়ে। এমন ভক্তের খাতির তো হবেই।

চৌবেসাহেবের চোখে সানগ্লাস। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর চোস্ত। দামি আতরের ভুরভুরে গন্ধ। কোমরের কাছটা সামান্য উঁচু হয়ে আছে। রিভলভার ছাড়া চৌবেসাহেব বাইরে বেরোতে পারেন না। বন্ধুর চেয়ে শত্রুই বেশি করে ফেলেছেন।

চৌবেসাহেব কমল ভৌমিকের সামনে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে একগাল হেসে বললেন, "আরে গুরুজি, কেয়া তাজ্জব!"

কমল ভৌমিক অবাক হয়ে বললেন, "আরে, চৌবে তুমি?"

চৌবে নিচু হয়ে কমল ভৌমিককে প্রণাম করলেন। কমল ভৌমিকের খাতির দেখে নাগরা, শিউপূজন, সকলেই অবাক। চৌবেকে দেখে সকলেই ইতিমধ্যে জড়োসড়ো।

চৌবে বললেন, "গুরুজি, আপনি এখানে কী করছেন?"

কমল ভৌমিক বললেন, "এই মর্কটটা আমাকে মারবে বলে এখানে টেনে এনেছে।"

শিউপূজন আর নাগরা ভিড়ের মধ্যে পালাবার তাল খুঁজছিল। কমল ভৌমিক খুচ করে হাতের আর পায়ের কী একটা কায়দা করলেন, দু'জন দু'দিকে অন্তত হাত-দশেক দূরে ছিটকে পড়ল।

চৌবেসাহেব তারিফ করলেন, "আহা, আহা, জবরদস্ত কাজ। গুরুজি, এ-মারটা কোন্ কেতাবে পড়ে?"

"এ হল তোমার হাত আর পায়ের সাত নম্বর চাল। এ-মারটা তোমাকে এখনও শেখাইনি। আর শেখাব কী, সেই যে তুমি চলে এলে!"

চৌবে নিজের একজন লোককে বললেন, "ধরে আন দুটোকে।"

নাগরা আর শিউপূজনকে তুলে আনা হল। চৌবে বললেন, "গুরুজি, পুন্‌পুনটা একবার সেরে নি, মওকা যখন মিলেছে।"

চৌবে শুধু দুটো হাত দিয়ে কী একটা করলেন, দুটো লোক দু'দিক থেকে ঠিকরে এসে মাথায়-মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। টিস্ করে একটা শব্দ হল। ভিড়ের মানুষ হইহই করে উঠল, "কেয়া বাত, কেয়া বাত।" নাগরা আর শিউপূজন মাটিতে পড়ে আছে। মহাবীর মন্দিরের পূজারী জোরে ঘন্টা বাজাতে শুরু করেছেন।

চৌবে পড়ে-থাকা লোক দুটোর দিকে তাকিয়ে কোমরে হাত রেখে বললেন, "বেয়াদব কাহাঁকা।" তারপর কমল ভৌমিকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "গুরুজি, হাত এখনও ঠিক আছে?"

"ঠিকই আছে, তবে বাঁ হাতটা একটু স্লো হয়ে গেছে। পুনপুন মারে দুটো হাতই সমান চলা চাই।"

"আঃ, ধরেছেন ঠিক। আমার বাঁ হাতে সামান্য চোট আছে। পায়ের খেলা দেখাব গুরুজি?"

"তুমি পাগোয়ালির কথা বলছ? কার ওপর দেখাবে?"

"কেন, এই দো বদমাশ!"

শিউপূজন হাঁউহাঁউ করে উঠল, "নেহি বাদশা, মর যায়েগা, একদম জিন্দা মর যায়েগা।"

চৌবেসাহেব ভেংচি কাটলেন, "ইঃ, মর যায়েগা। তু না মারনে আয়া?"

নাগরাকে দেখিয়ে বললেন, "উয় কৌন, বদবু, য্যায়সা ফিল্মকা ভিলেন।"

"মাস্টারজি হজৌর।"

"মাস্টারজি। কিসকা মাস্টার, কাঁহা কা মাস্টার?"

চৌবেজির রকমসকম দেখে ভিড় প্রায় পাতলা হয়ে এসেছে। সব দূরে-দূরে সরে গিয়ে আড়ালে-আবডালে খাড়া হয়েছে। চৌবেজি বললেন, "হর দুনিয়ামে তো একই মাস্টার হ্যায়, মেরা গুরু কমলজি। বোলো জিন্দাবাদ।"

সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, "কামাল গুরু, জিন্দাবাদ।"

চৌবে চিৎকার করে বললেন, "হল্লাগুল্লা মাত করো, ইয়ে দেবস্থান হ্যায়।"

মন্দিরের পূজারী মহারাজ শিঙ্গা ফুঁকতে লাগলেন জোরে-জোরে। ঝোলানো ঘণ্টার দড়ি ধরে টানছে আর একজন। আর একজন নেচে-নেচে বাজাচ্ছে ডুগডুগি। মহাশব্দে, মন্দিরের পাথরের মহাবীর যেন নড়েচড়ে উঠছেন।

চৌবেজি সেই ঘোর হট্টগোলে গলা চড়িয়ে বললেন, "গুরুজিকা গোড় লাগো।"

কমল ভৌমিকের কী খাতির। সবাই প্রণাম করতে লাগল। শিউপুজন আর নাগরা দাড়া-ভাঙা আরসোলার মতো রাস্তা পেরিয়ে মাঠের দিকে চলেছে। দোকানের সামনে পড়ে আছে ঢেউ খেলানো সাইকেল।

চৌবেজি কমল ভৌমিককে নিয়ে মন্দিরের চাতালে বসলেন। কমল ভৌমিকের খাতির তখন দেখে কে! গুরুর গুরু, মহাগুরু। ওদিকে মহা ধুমধামে মহাবীরের পুজো শুরু হয়েছে। বেঁটে, পাকতেড়ে শ্রীহনুমানজির মতো চেহারার একটি লোক নেচে-নেচে শিঙ্গা ফুকঁছে। বাচ্চা ছেলেটা দু'হাতে দড়ি পাকড়ে দুলে-দুলে ঝোলা ঘণ্টা বাজাচ্ছে ঢ্যাং ঢ্যাং করে। এমন শব্দ হচ্ছে যে,কমল ভৌমিক কিছু বললে চৌবেজি শুনতে পাচ্ছেন না, চৌবেজি কিছু বললে কমল ভৌমিক শুনতে পাচ্ছেন না।

চৌবেজি জিজ্ঞেস করছেন, "গুরুজি, আপনি এখানে কেমন করে এলেন?"

কমল ভৌমিক বললেন, "স্কুলের জিমন্যাস্টিক দেখাবার জন্যে এসেছি।"

"আপনাকে আর ছাড়ছি না। আমার গেস্ট হয়ে কমসে-কম এক বছর থেকে যেতে হবে।"

"কলকাতায় আমার কাজ নেই চৌবে? আমার ইনস্টিটিউট কে দেখবে? সেখানে হাজার ছেলে ট্রেনিং নিচ্ছে।"

"এখানেও আপনাকে একটা আখড়া করতে হবে। আপনাকে একটা মহল্লা লিখে দিচ্ছি। এক লাখ টাকার মতো ইনকাম। সব সময় একশো চেলা আমার গুরুজির সেবা করবে। জয়, গুরুজির জয়।"

বিশাল একটা লরি মাঠের ধারে পিচের রাস্তায় এসে থেমে পড়ল। ধুপধাপ করে লাফিয়ে পড়ল জনা-ছয় দৈত্যের মতো চেহারার লোক।

চৌবেজি চিৎকার করে বললেন, "কেয়া, আ গাইল বা গাবুয়া।"

গাবুয়া চিৎকার করে বললে, "হাঁ মহারাজ।"

চৌবে কমল ভৌমিককে বললেন, "তাঁবু এসে গেছে। আজ বড় উৎসব হবে। সারা রাত ভজন-কীর্তন আর মহাবীরজির ভোগ হবে। আমার স্ত্রীর মানত ছিল।"

কমল ভৌমিক হঠাৎ লাফিয়ে নেমে পড়লেন রক থেকে। মনে পড়ে গেছে। ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গিয়ে খবর দেবার কথা।

চৌবেজিও নেমে পড়লেন, "এ কী গুরুজি, আপনি চললেন কোথায়! আপনার সেবা, আর মহাবীরের সেবা এক জিনিস।"

কমল ভৌমিক হাসতে হাসতে বললেন, "কী যে বলো! আমার তো এখনও একটা জিনিস কমতি আছে। আমার তো ন্যাজ নেই। মহাবীরের কত বড় ন্যাজ দেখেছ?"

"গুরুজি, মহাবীরের ন্যাজ বাইরে আছে, আপনার আছে ভেতরে। আপনি মহাবীর-সে কমতি কেন হোবেন?"

কমল ভৌমিক বুঝতে পারলেন না চৌবের এই কথায় তাঁর গৌরব বাড়ল না কমল! তিনি বললেন, "শোনো চৌবে, এখনই আমি তোমাকে কিছু বলব না। আমি ভেবে দেখি!"

মাঠের মাঝখানে হইহই করে তাঁবু খাটানো শুরু হয়ে গেছে। চৌবের আয়োজনের কোনও অভাব নেই। এর মধ্যেই মাইক চালু হয়ে গেছে। হিন্দি গান বাজছে হইহই করে। কমল ভৌমিক হনহন করে মাঠ পেরিয়ে রাস্তার দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। আশপাশের সবাই এখন তাঁকে নমস্কার করছে। করবেই তো, গুরুর গুরু বলে কথা। শিউপুজন করুণ মুখে তার ধনুক হয়ে যাওয়া সাইকেলটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কমল ভৌমিকের খুব দুঃখ হল। পেছন থেকে হাত রাখলেন পিঠে, "শোনো বাবু, বাঙালি, হিন্দুস্থানি বলে কিছু নেই।"

শিউপুজন বললে, "জি হুজুর।"

"হুজুর নয়, বলো দোস্ত। আমরা সবাই মানুষ। পৃথিবী আমাদের দেশ।"

"জি সরকার।"

"জি হুজুর!"

"মারব মুখে এক থাবড়া। বলছি না, সরকার নয়, হুজুর নয়, দোস্ত।"

"বুঝেছি, তোমার দ্বারা হবে না। তোমার ধাত খারাপ হয়ে গেছে। দেহের ব্যায়ামও হয়নি, মনের ব্যায়ামও হয়নি।"

"জি সরকার।"

"তোমার মাথা। সরো দেখি, সাইকেলটা সোজা করে দি।"

কমল ভৌমিক নিচু হয়ে সাইকেলটা দু'হাত দিয়ে তুলে নিলেন। দম বন্ধ করে, আবার উলটো দিকে মোচড় মারলেন। রড সোজা হয়ে সাইকেল আবার সাইকেল হয়ে গেল। শিউপুজন বললেন, "আরে ব্বাপ।"

চৌবে ওপাশ থেকে চিৎকার করছেন, "কী হল গুরুজি? বেআদব কিছু বলছে?"

কমল ভৌমিক চিৎকার করে বললেন, "না না, কিছু বলেনি। সাইকেলটা সোজা করে দিলুম।"

জোরে গান বাজছে। কে কী শুনলেন কে জানে! সামনের রাস্তায় একটা গাড়ি যেতে-যেতে গতি কমে এল। সামনের আসন থেকে সুকু চিৎকার করছে, "কাকু, কাকু।"

গাড়ি থেমে গেল, ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এ কী, আপনি এখানে কী করছেন? এখনও বাড়ি যাননি?"

ডাক্তারবাবুকে দেখে চৌবে প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছেন, "নমস্তে, নমস্তে ডাক্তার সাব। ইনি আমার গুরু।"

"আপনার গুরু? আচ্ছা, আচ্ছা।"

"আসুন না, আজ আমাদের ফেস্টিভাল। সবাই মিলে একটু ভজন পূজন।"

"এখন তো সময় হবে না। দুপুরে আসব, হসপিটাল সেরে।"

কমল ভৌমিক পেছনের আসনে উঠে বসলেন। গাড়ি ছুটল। নিতু জিজ্ঞেস করলে, "কী করছিলেন কাকু?"

"সত্যি কথা বলব, মারামারি। একটু গা-গরম করে নিলুম।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "গরম হয়েছে তো?" (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

শুরু হল শার্লক হোমসের নতুন গল্প

গ্রিক দোভাষীর বিপদ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

শার্লক হোম্‌সের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। শুধু পরিচয় বললে ভুল বলা হবে। খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কিন্তু এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সত্ত্বেও হোম্‌স কখনও তার আত্মীয়-স্বজনদের কথা বা তার ছেলেবেলার কথা আমাকে বলেনি। নিজের জীবনের সম্বন্ধে হোম্‌সের এই ধরনের মনোভাব, এই উদাসীনতা আমাকে আশ্চর্য করে দিত। শেষকালে এমন হল যে, আমার ধারণা হয়ে গেল হোম্‌স স্বয়ম্ভূ। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি মানুষ। আত্মীয়-স্বজন নেই, এমনকী নিজের অতীত জীবন বলেও কিছু নেই। এ এমন একজন লোক, যার বুদ্ধি আছে কিন্তু হৃদয় বলে কিছু নেই। এর অসামান্য ধীশক্তি, কিন্তু স্নেহ-মমতা-ভালবাসা খুবই কম। হোম্‌স স্ত্রীলোকদের সব সময় এড়িয়ে চলত। নতুন করে কোনও লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পর্যন্ত করতে চাইত না। আর নিজের কথা কোনও সময়ে তুলতে চাইত না। এইসব দেখেশুনে আমার মনে হয়েছিল যে, ছেলেবেলাতেই হোম্‌স বোধহয় অনাথ হয়ে পড়ে। নিকট আত্মীয় বলতে তার কেউ ছিল না। তাই যখন হঠাৎ একদিন হোম্‌স তার দাদার কথা আমাকে বললে আমি তো একদম তাজ্জব বনে গেলুম।

গ্রীষ্মকাল। একদিন সন্ধেবেলায় আমরা দুজন বসে আড্ডা দিচ্ছিলুম। গল্‌ফ ক্লাব নিয়ে কথা হতে হতে আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে গেল সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ আর খালি চোখে সূর্যের গতিপথের যে হেরফের আমরা দেখি তা কেন হয়, এই সব কথা। তার থেকে আমরা কখন যে মানুষের ওপর তার বংশের প্রভাব বা কীভাবে এক-পুরুষ দু-পুরুষ বাদ দিয়ে বংশগত সাদৃশ্য দেখা দেয়, এইসব ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছি তা আমাদের খেয়াল ছিল না। কথা হচ্ছিল মানুষের কোনও ক্ষমতা তার নিজের চেষ্টায় বেড়ে ওঠে, নাকি তার সবটাই আসে বংশসূত্রে।

আমি বললুম, "তোমার নিজের কথাটাই ভেবে দ্যাখো না। তোমার নিজের কথা যেটুকু আমায় বলেছ তার থেকে বুঝেছি যে, তোমার এই যে-কোনও ঘটনাকে বিশ্লেষণ বা তার থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা—এটা তো তুমি নিজে চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে আয়ত্ত করেছ।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হোম্‌স বললে, "খানিকটা অবশ্য তাই বটে। আমার পূর্বপুরুষ ছিলেন পাড়াগাঁয়ের অবস্থাপন্ন লোক। এসব লোকের স্বভাব-চরিত্র যেরকম হয় এঁরাও সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন। তা হলেও আমি যে এদিকে এসেছি সেটার পেছনেও বংশের কিছু প্রভাব আছে। আমার ঠাকুমা ছিলেন ফরাসি চিত্রকর ভেরনের নিজের বোন। রক্তের মধ্যে যদি শিল্পকলার দিকে ঝোঁক থাকে তো তার ফলাফল যে কী হতে পারে তা বলা শিবেরও অসাধ্য।"

"কিন্তু তোমার মধ্যে যে বংশের ধারা কাজ করছে তাই বা তুমি জানলে কী করে?"

"তার কারণ হচ্ছে তুমি আমার যে ক্ষমতার কথা বললে, সে ক্ষমতা আমার ভাই মাইক্রফটেরও আছে। আমার চেয়ে বেশিই আছে।"

এটা বাস্তবিক একটা খবর বটে। ইংল্যাণ্ডে এরকম অসাধারণ লোক যদি আরও একজন থেকে থাকে তা হলে পুলিশ বা সাধারণ লোক কেউ তার সন্ধান জানবে, এটা কী করে সম্ভব? তাই আমি একটু ঘুরিয়ে বললুম যে, এ-কথাটা বলা বোধহয় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। হোম্‌স আমার কথায় হো-হো করে হেসে উঠল।

"দ্যাখো ওয়াটসন," হোম্‌স বললে, "যারা বিনয়কে সবচেয়ে বড় গুণ বলে মনে করে আমি তাদের দলে নেই। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যে চলে, সে সব-কিছুকেই ঠিক-ঠিক ভাবে দেখে। যে জিনিসটা যেরকম সেটাকে সেই ভাবেই দেখে। তাই নিজের ক্ষমতাকে সে বাড়িয়েও দেখে না, আবার কমিয়েও দেখে না। দুটোই তার কাছে ভুল বিচার বলে মনে হয়। তোমাকে যে আমি বললুম, মাইক্রফটের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আমার চাইতে বেশি, তা কিন্তু আমি মোটেই বাড়িয়ে বলিনি। আমি সত্যি কথাই বলেছি।"

"তোমার ভাই কি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট না বড়?"

"আমার চেয়ে সাত বছরের বড়।"

"কিন্তু তার নাম-ডাক শুনিনি তো।"

"ওর গণ্ডির মধ্যে ওর খুব নাম।"

"সে গণ্ডিটা কী?"

"ধরো ডাইয়োজিনেস ক্লাবে সবাই ওকে খুব খাতির করে।"

আমি এই ক্লাবের নাম-ধাম কিছুই শুনিনি। আমার মুখ দেখে আমার মনের কথা জানতে হোম্‌সের কোনও অসুবিধেই হয়নি। হোম্‌স পকেট থেকে ঘড়ি বের করলে।

"লণ্ডনে যত ক্লাব আছে তাদের মধ্যে ডাইয়োজিনেস ক্লাবই হচ্ছে সব চাইতে বেখাপ্পা ধরনের ক্লাব। আর মাইক্রফট হচ্ছে সবচেয়ে বেখাপ্পা রকমের লোক। প্রতিদিন পৌনে পাঁচটা থেকে আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট পর্যন্ত ক্লাবে থাকে। এখন ছটা বাজে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে তো চলো একটু বেড়িয়ে আসি। বেড়াবার মতো সন্ধে আজকে। যদি রাজি থাকো তো বলো। দু-দুটো নতুন জিনিসের সঙ্গে পরিচয় হবে।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম। আমরা রিজেন্ট সার্কাসের দিকে পা চালালুম।

হোম্‌স বললে, "ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ যে মাইক্রফটের এত প্রচণ্ড ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন সে ডিটেকটিভগিরি করে না। আসলে মাইক্রফটের ধাতে পোষায় না।"

"কিন্তু তুমি যেন বললে···

"আমি বলেছিলুম, পর্যবেক্ষণ করার আর তার থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার ক্ষমতা ওর বেশি। তবে ঘরের মধ্যে আরাম-কেদারায় বসে বসেই যদি ডিটেকটিভের কাজের শুরু আর শেষ দুই-ই হত, তবে আমার দাদাটি সবচাইতে বড় ডিটেকটিভ হতে পারত। কিন্তু ওর নাম করবার বাসনা বা পরিশ্রম করার ক্ষমতা কোনওটাই নেই। এমনিই ওর স্বভাব যে নড়াচড়া করা বা একটু কষ্ট করে কোথাও গিয়ে কোনও একটা সিদ্ধান্ত ঠিক না ভুল সেটা পর্যন্ত যাচাই করতে ওর কোনও উৎসাহ নেই। কষ্ট করে নিজের কোনও সিদ্ধান্তকে সত্য প্রমাণ করার চাইতে ও হাসিমুখে স্বীকার করে নেবে যে, ও যা বলেছে তা ভুল। অনেকবার অনেক কুটকচালে সমস্যা নিয়ে আমি মাইক্রফটের সঙ্গে দেখা করেছি। প্রতিবারই ও সেই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি যে, ও যা বলেছে সেটাই ঠিক। কিন্তু সেই সমাধানকে কোর্টে দাঁড় করাবার জন্যে যেসব পাথুর-প্রমাণ চাই তা জোগাড় করার মতো ক্ষমতা উৎসাহ বা ধৈর্য কোনওটাই ওর নেই।"

"ও। এটা তা হলে ওঁর পেশা নয়?"

"মোটেই নয়। আমার রুজি-রোজগারের উপায়টা মাইক্রফটের কাছে নেহাতই একটা শখের ব্যাপার। ওর অঙ্কে খুব মাথা। ও গভর্নমেন্টের কোনও একটা দফতরের জমা-খরচের হিসেব-টিসেব রাখে। প্যালম্যালের কাছে একটা বাসা নিয়ে আছে। প্রতিদিন সকালে হেঁটে-হেঁটে হোয়াইট হলে যায় আর সন্ধে হলে আবার একই রাস্তা ধরে হেঁটে-হেঁটে ফিরে আসে। এ-ছাড়া আর কোথাও যায় না। কোনওরকম পরিশ্রম করে না। ব্যায়াম-ট্যায়াম করাও ওর ধাতে নেই। আপিস আর বাড়ি ছাড়া ও নিয়মিত যায় ডাইয়োজিনেস ক্লাবে। ক্লাবটা আবার ওর বাড়ির ঠিক উলটো দিকে।"

"আমি কিন্তু এই ক্লাবের নাম কখনও শুনিনি।"

"এতে আশ্চর্য হওয়ার তো কিছু নেই। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, লণ্ডন শহরে এমন অনেক লোক আছে যারা লাজুক বলেই হোক বা মানুষের ওপর চটা বলেই হোক, কারও সঙ্গে মেলামেশা করা একদম পছন্দ করে না। কিন্তু তাই বলে তারা যে গদি-আঁটা চেয়ারে বসে মাসিকপত্র বা খবরের কাগজ পড়তে ভালবাসে না, তা তো নয়। এইরকমের লোকেদের জন্যে এই ডাইয়োজিনেস ক্লাবের গোড়াপত্তন হয়। লণ্ডন শহরের সবচাইতে অসামাজিক আর সবচাইতে কুনো লোকদের জন্যে এই ক্লাব। এদের নিয়ম হচ্ছে কোনও সভ্য অন্য সভ্য কী করছে না করছে সেদিকে নজর দিতে পারবে না। বাইরের লোকেদের বসাবার যে ঘর আছে সে ঘর ছাড়া অন্যত্র কথা বলা যাবে না। তিনবার আইন ভাঙলেই সভ্যপদ খারিজ হয়ে যাবে। আমার দাদা হচ্ছে যাকে বলে 'ফাউণ্ডার মেম্বার', যারা ক্লাব করেছে তাদের একজন। ওদের ক্লাবের পরিবেশটা আমার খুব ভাল লাগে।"

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা প্যালম্যাল পৌঁছে গেলুম। আমরা সেণ্ট জেমসের দিক থেকে আসছিলুম কার্লটন থেকে একটু এগিয়ে একটা বাড়ির দরজার সামনে হোম্‌স দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আমাকে সাবধান করে দিলে আমি যেন চুপ করে থাকি। আমি ঘাড় নাড়লুম। হোম্‌স দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। কাঁচের দরজা দিয়ে দেখতে পেলুম বিরাট আয়তনের একটা ঘর। সেই ঘরে বেশ কিছু লোক আলাদা-আলাদা ভাবে বসে কাগজটাগজ পড়ছে। হোম্‌স আমাকে একটা ছোট ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। ঘরটা প্যালম্যালের দিকে। রাস্তাঘাট সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমাকে বসিয়ে হোম্‌স চলে গেল। একটু পরে ফিরে এল। তার সঙ্গে এক ভদ্রলোক। বুঝলুম ইনিই হোমসের দাদা।

মাইক্রফট হোম্‌সের চেহারা শার্লকের চাইতে বড়সড় শক্ত-সমর্থ। শার্লকের তুলনায় মাইক্রফট বেশ নাদুসনুদুস। ওঁর মুখ খুবই বড়। তবু দেখলেই বোঝা যায় যে, শার্লকের মুখের সঙ্গে ওঁর মুখের বেশ মিল আছে। মাইক্রফটের চোখের চাউনিটা বড় অদ্ভুত। আমি বরাবর দেখেছি যে, হোম্‌স যখন খুব গভীরভাবে চিন্তা করে তখন ওর চোখের চাউনিটা কেমন যেন হয়ে যায়। চোখের রঙ হয়ে যায় খুব হালকা ছাই-ছাই। মাইক্রফটের চোখ দেখলুম স্বাভাবিক অবস্থাতেই ওই রকমের।

মাইক্রফট আমার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভাল লাগল।" আমার মনে হল যে, আমার হাতটা যেন সিল-মাছের থাবার মধ্যে আটকে গেছে। "আপনি শার্লকের কথা লেখবার পর থেকে ওর নাম তো লোকের মুখে মুখে ফেরে··· ভাল কথা, শার্লক, আমি গত সপ্তাহেই ভেবেছিলুম যে, তুমি ম্যানর হাউসের রহস্য নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবে।

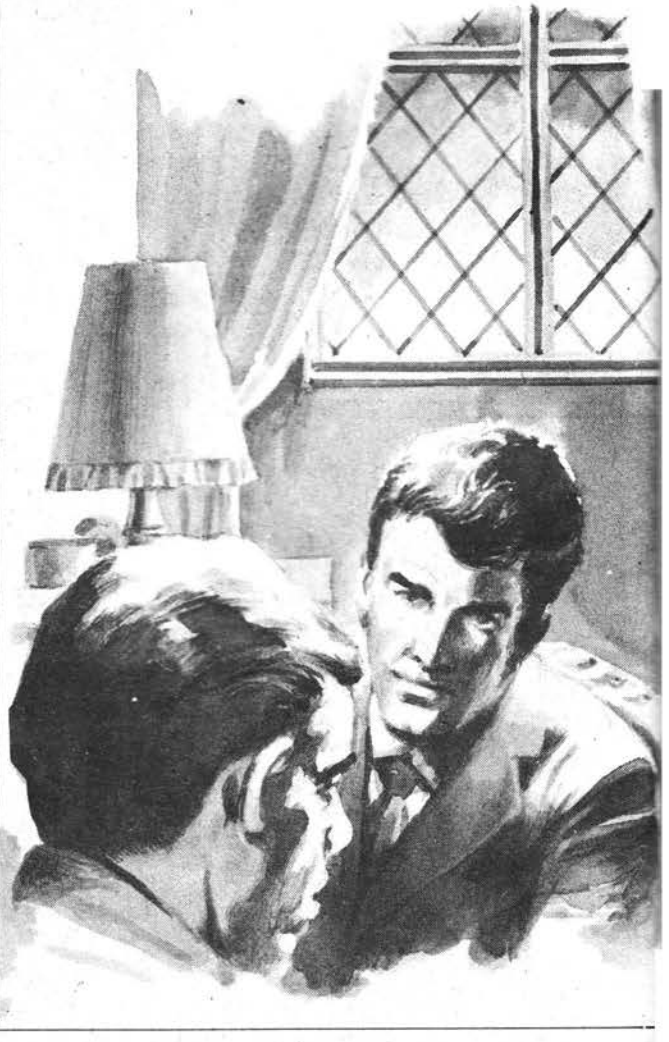

আমার মনে হচ্ছিল যে, ব্যাপারটা বোধহয় তুমি ঠিক কব্‌জা করতে পারছ না।"

হোম্‌স হেসে বললে, "না, আমি ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলেছি।"

"অ্যাডমস-ই করেছিল তো?"

"হ্যাঁ। অ্যাডমসই সব কিছুর মূলে।"

জানলার ধারে বসতে বসতে মাইক্রফট বললেন, "আমি অবশ্য গোড়া থেকেই জানতুম।" তারপর জানালা দিয়ে রাস্তা দেখতে দেখতে তিনি বললেন, "যদি কেউ মানুষের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে জানতে চায় তো এই জায়গায় দাঁড়ালেই তার সব জানা হয়ে যাবে। কত বিচিত্র রকমের চরিত্র সব।...ওই যে লোকদুটি এদিকে আসছে, ওদের দেখলেই আমার কথা সত্যি কি না বুঝতে পারবে।"

"ওই বিলিয়ার্ড-মার্কার আর ওর ওই সঙ্গীর কথা বলছ তো?"

"ঠিকই। ওই লোকটি সম্বন্ধে কী বলতে পারো?"

দুজন লোক জানলার ঠিক উলটো দিকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের একজনের ওয়েস্ট কোটের পকেটের কাছে খড়ির গুঁড়ো লেগেছিল। এ ছাড়া বিলিয়ার্ডের আর কোনও চিহ্ন দেখতে পেলুম না। অন্য লোকটি একটু বেঁটে। রঙ ময়লা। মাথার টুপিটা পেছনের দিকে হেলানো।

লোকটির হাতে-বগলে বেশ কয়েকটা কাগজের মোড়ক।

শার্লক বললে, "আমার মনে হচ্ছে ভদ্রলোক সেনাবাহিনীতে ছিলেন।"

"হ্যাঁ। অল্প কিছুদিন হল চাকরি থেকে ছাড়া পেয়েছেন।" শার্লকের দাদা বললেন।

"ভদ্রলোক দেখছি কিছুদিন ভারতবর্ষে ছিলেন।"

"উনি নন-কমিশনড অফিসার।"

শার্লক বললে, "রয়্যাল আর্টলারিতে ছিলেন।"

"ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেছেন।"

"কিন্তু ওঁর একটি সন্তান আছে।"

"একটি নয় হে, একের বেশি সন্তান আছে," মাইক্রফট হেসে-হেসে বললেন।

আমি হেসে বললুম, "এটা কি একটু বেশি রকমের বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

হোম্‌স বললে, "কেন, ভদ্রলোকের চেহারা, হাবভাব, তামাটে গায়ের রঙ এসব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ইনি অল্পদিন হল ভারতবর্ষ থেকে ফিরেছেন আর ইনি সাধারণ সৈন্য নন।"

"উনি যে খুব বেশিদিন চাকরি থেকে ছাড়া পাননি, তা বোঝা যায় ওঁর জুতোর দিকে তাকালে। উনি যে জুতো পরেছেন ওর নাম হচ্ছে অ্যামুনিশন বুট," মাইক্রফট বললেন।

"ওঁর হাঁটার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় যে উনি ক্যাভালরিতে ছিলেন না। কিন্তু লক্ষ করলে দেখবে টুপিটা উনি একটু হেলিয়ে পরছেন। আর ওইভাবে টুপি পরাই ওঁর অভ্যেস। তার ফলে কপালের একদিকটা রোদে ঝলসে গেছে বেশি। ওঁর চেহারাটি যেরকম গোলগাল, তাতে উনি মিলিটারির ইঞ্জিনিয়ার-বাহিনীতে ছিলেন বলেও মনে হয় না। উনি গোলন্দাজ-বাহিনীতে ছিলেন।"

"তা ছাড়া আরও লক্ষ করবার বিষয় হল, ওঁর পোশাক। কালো পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, ওঁর কেউ আপনজন মারা গেছেন। দেখতেই পাচ্ছ উনি বাজার করে ফিরছেন। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন। দ্যাখো, ছেলেদের জন্যেও উনি জিনিস কিনেছেন। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখবে, ওঁর পকেটে একটা ঝুমঝুমি। তাতেই বোঝা যায় যে, একটি ছেলে খুব ছোট। মনে হয় ছেলে হবার অল্পদিন পরেই ওঁর স্ত্রী মারা যান। আরও দ্যাখো, ভদ্রলোকের হাতে একটা ছবির বই। তা হলে আরও একটি ছেলে আছে বলে মনে হয়।"

এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলুম যে, কেন শার্লক বলেছিল তার দাদা মাইক্রফটের খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতা, বুদ্ধি, বিশ্লেষণ করার শক্তি তার চাইতে অনেক বেশি। শার্লক আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। মাইক্রফট একটা কচ্ছপের-খোলা-দিয়ে-তৈরি নস্যির ডিবে থেকে নস্যি বের করে বেশ বড় একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর পকেট থেকে একটা লাল রুমাল বের করে কোটের থেকে নস্যির গুঁড়ো ঝাড়তে লাগলেন। (ক্রমশ)

অনুবাদ: সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : বিমল দাস

আমাদের রাস্তাটা গিয়ে যেখানে পার্কের একটা কোণে মিশেছে, তার উলটো দিকে ছিল একটা ছোট্ট ছবি-বাঁধাইয়ের দোকান। মালিক মারা যাবার পর থেকে দোকানটা বন্ধই ছিল। তাও প্রায় বছর খানেক হল। এ-বছরের শুরু থেকেই সেই বাড়িটা দেখি ভাঙা হচ্ছে। পুজোর পর-পর একবার কানাঘুষো শুনেছিলাম, ওখানে নাকি ইস্কুল-বাড়ি হবে। কোন্ ইস্কুল কে জানে!

সেদিন দেখি বাড়িটা শেষ। জল্পনা-কল্পনারও অবসান। আপাতত দোতলা একটা বাড়ি তৈরি হয়েছে। দরজার পাশের দেওয়ালে ছোট্ট একটা চতুষ্কোণ পাথরের ফলক লাগানো। স্যাদা পাথরের ওপর কালো অক্ষরে লেখা 'বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-আবাস'। ইস্কুল নয়, ছাত্রদের জন্য তৈরি একটা হস্টেল। কিন্তু কাদের হস্টেল?

সঠিক খবর পাওয়া গেল ছোট্কার কাছে। ছোট্কাই বলল, নতুন বাড়িটায় থাকবে পলিটেকনিক কলেজের ছাত্ররা। শুধু কি খবরটাই দিল? না, সেইসঙ্গে দিল একটা ধাঁধাও, বলতে গেলে এমন একটা হস্টেল-বাড়ি নিয়েই তৈরি সেই ধাঁধা। সেটাই বরং বলি।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটি নতুন-তৈরি ছাত্রাবাসে থাকার জন্য ছাত্রদের আবেদনপত্র জমা পড়েছে। হস্টেল-সুপারিনটেনডেন্ট হিসেব করে দেখলেন, প্রত্যেক ছাত্রকে একটি করে ঘর দিতে হলে আটটা ঘর কম পড়ে যাচ্ছে।

আবার, প্রতি ঘরে যদি দুজন করে ছাত্রকে জায়গা দেওয়া যায়, তা হলে, আবেদনকারী ছাত্রের সংখ্যা অনুযায়ী, আটটা ঘর একেবারে ফাঁকা পড়ে থাকছে।

এ থেকে বলতে পারো, ক'টি ঘর ছাত্রদের জন্য রয়েছে সেই হস্টেলে, আবেদনকারী ছাত্রসংখ্যাই বা কত?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন্‌টি বেমানান?

কুঞ্জর, করী, মাতঙ্গ, গজ, নাগ, নগ।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

জাড়োজউহা

গতবারের উত্তর ॥ (১) ৪২ টাকা। (২) বাইবেল। (৩) মুসাফিরখানা।

সত্যসন্ধ

পরীক্ষার হলে বাবাই মাথা চুলকোচ্ছে দেখে ইনভিজিলেটর জিজ্ঞেস করলেন, "প্রশ্ন নিয়ে খুব সমস্যায় পড়েছে, তাই না?"

বাবাই চিন্তিত মুখে জবাব দিল, "প্রশ্ন ঠিকই আছে স্যার, আসলে উত্তরগুলো নিয়েই সমস্যায় পড়েছি।"

দুই মনোরোগীর দেখা হয়ে গেল এক মনোরোগ-বিশেষজ্ঞের চেম্বারের কাছে। একজন আর-একজনকে জিজ্ঞেস করল,

"আপনি চেম্বারে ঢুকছেন, না বেরোচ্ছেন?"

সঙ্গে-সঙ্গে জবাব এল, "সে-কথা জানলে কি আর এখানে আসি?"

"আমার মনে হয় অমলের অপারেশনটায় ডাক্তারবাবু একটু ঝুঁকি নিচ্ছেন।"

"ঝুঁকি নিচ্ছেন! তার মানে?"

"অমল বলেছিল, তার খুব সন্দেহ আছে যে, সে এই অপারেশনের ফি দিয়ে উঠতে পারবে।"

ছবি : প্রবীর সেন

মজার খেলা

চব্বিশটি পোড়া দেশলাইকাঠি লাগবে এবারের মজার খেলার জন্য। দু' ডজন টুথপিক দিয়েও খেলাটি করা যায়। কাঠিগুলো বন্ধুর হাতে দাও। তাকে বলো, এই কাঠিগুলো দিয়ে সে যেন ছ'টি সমান মাপের বর্গক্ষেত্র তৈরি করে।

শুনতে সহজ, কিন্তু দু' ডজন কাঠির সবগুলোকে ব্যবহার করে আধডজন একমাপের বর্গক্ষেত্র তৈরি করা, সহজ কাজ নয়। সহজ যে নয়, নিজে চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে। আর যদি পেরে যাও, তা হলে দেখবে, কী সুন্দর দেখতে একটা ছবি ফুটে উঠেছে চোখের সামনে। ঠিক এইরকম—

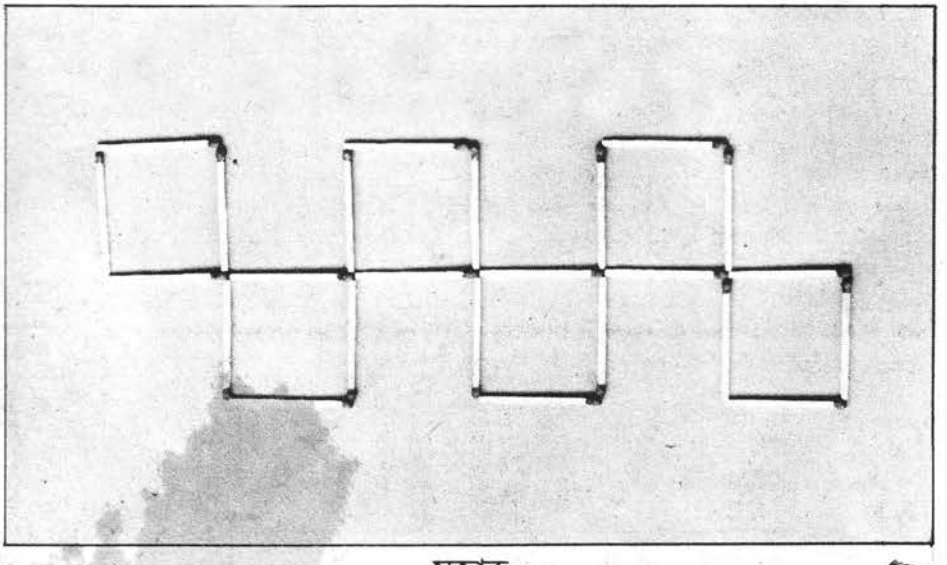

মজারু

কল্পনায় আঁকা হয়ে উঠুক

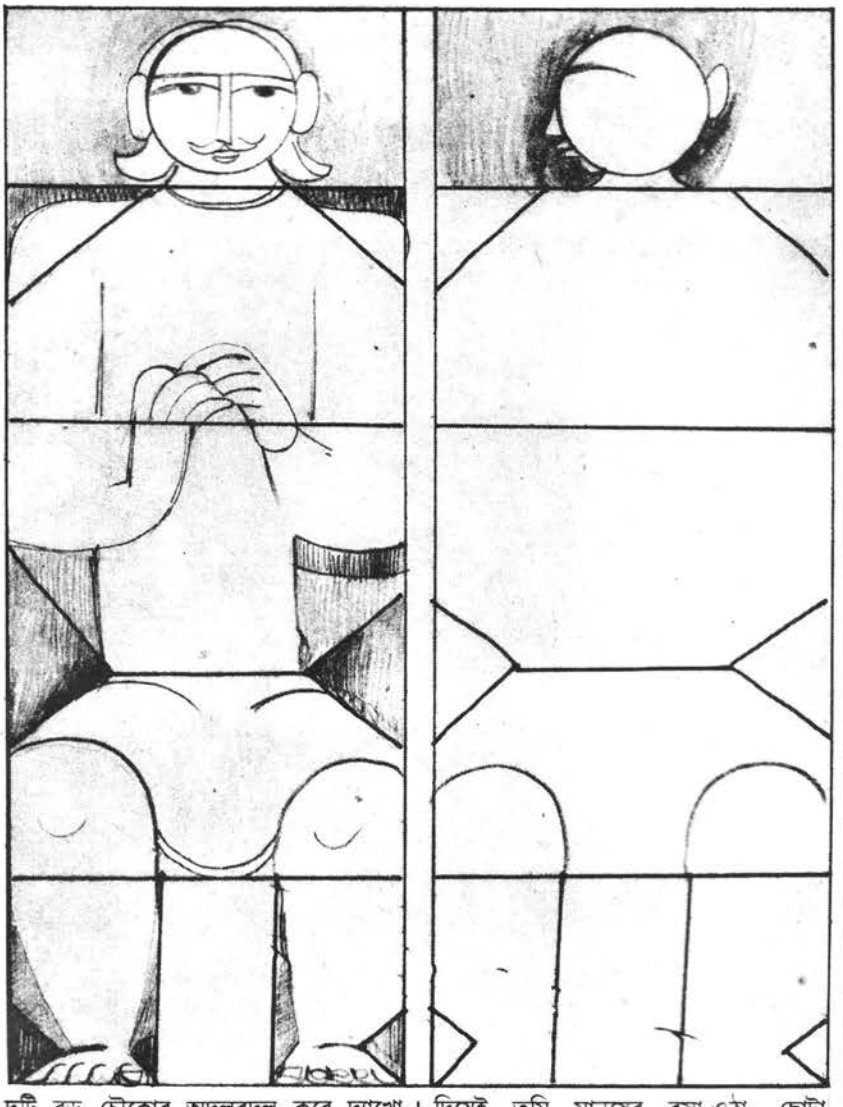

দুটি বড় চৌকোর অদলবদল করে দ্যাখো কেমন পরিবর্তন ঘটে গেল ! একটি মানুষকে সম্পূর্ণ এঁকে দেখানো হয়েছে, আর-একটি মানুষকে সম্পূর্ণ করা হয়নি। কারণ, কেবলই তোমার কল্পনার ভিতর দিয়ে সে আঁকা হয়ে উঠুক। তবে জানবে, এই আকারের মধ্যে দিয়েই তুমি মানুষের বসা-ওঠা, ছোটা, চলাফেরা—সবকিছু খুব সহজেই ধরতে পারবে। কোথাও তুমি আর আটকে যাচ্ছ না !

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিসের ফোটো

ফোটো : রবিন বিশ্বাস

গত সংখ্যায় ছিল দরজার ল্যাচের ফোটো

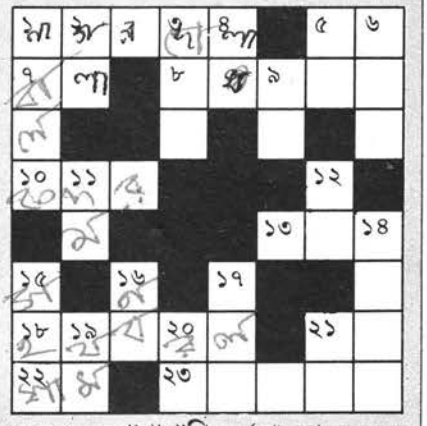

সংকেত : পাশাপাশি : (১) যাতে চড়ে ঘুরপাক খাওয়া যায়। (৫) দাম, দ্বিরাবৃত্তিতে প্রচুর ঘাম। (৭) বালিকা যখন হাতের অলংকার। (৮) অলৌকিক শক্তি বা কোনও বিষয়ে নিখুঁত জ্ঞান। (১০) মর্যাদা। (১৩) দনুর পুত্র। (১৬) সুকুমার রায়ের সৃষ্টি। (২১) জলের মাছকে যা আকৃষ্ট করে। (২২) চতুর্বেদের একটি। (২৩) পাহাড়ি জলধারা।

উপর-নীচ : (১) বলা হচ্ছে বালক না, কিন্তু আসলে তাই। (২) চোরের মায়ের কী বড় ? (৩) বন্দুকের বিশেষণ। (৪) লক্ষ। (৫) অহংকার। (৬) ঝংকার। (৯) নিপুণ। (১১) দূরপাল্লার দৌড়ে যা থাকা অবশ্যই দরকার। (১২) ব্রহ্মার চতুর্দশ পুত্রের অন্যতম। (১৪) মণিরত্ন ইত্যাদি। (১৫) হঠাৎ। (১৬) নতুন, নয়। (১৭) মাংস। (১৯) সংযমন। (২০) ধূলি। (২১) অব্যক্ত, অপ্রকাশিত।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

শ	কু	ন			ব	স	ন
ত		গ	দা		না	রা	জ
দ্রু	প	দ	ন	ন্দি	নী		রু
	রা		ব			লা	ল
যু	গ			মা		গা	
ব		শ	ম	ন	দ	ম	ন
রা	জী	ব		স	জ্ঞা		র
জ	ব	র			ল	লা	ম

রঞ্জন

আজেবাজে চিন্তা করে মনখারাপ কোরো না

প্রশ্ন : আমার সমস্যা হল, আমি পড়াশোনায় একদম মন বসাতে পারছি না। আসলে পড়াশোনা করতে গেলে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রয়োজন, আমার মধ্যে তারই ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এর প্রধান কারণ 'সায়েন্স রিপোর্টার' পত্রিকার একটি লেখা পাঠ। পড়তে বসলেই আমার মনের মধ্যে বৃদ্ধ বয়সের এক অক্ষম অসহায় ছবি ভেসে উঠছে, যার ফলে আমি মনকে একাগ্র রাখতে পারছি না। লেখকের বক্তব্য অনুসারে, একজন মানুষ বৃদ্ধ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ পূর্বস্মৃতি সে ভুলে যায় অথচ ওই সময়টিকেই আমি অতীত স্মৃতি রোমন্থনের সময় বলে জানতাম।

অসাধারণ নয়, সাধারণ সব বৃদ্ধ লোককে আমি দেখেছি অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ করতে। তবে কী কারণে কিছু লোকের বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিশক্তি সতেজ থাকে, কিন্তু কিছু লোকের থাকে না, (অবশ্য লেখকের মতে)। একজন মানুষ কি ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্মৃতিশক্তিকে অটুট রাখতে পারে না।

ভবিষ্যৎই মানুষকে প্রেরণা দেয়। আমার লক্ষ্য হল আজীবন নিজেকে লেখাপড়ার সাধনায় ডুবিয়ে রাখা আর এই লক্ষ্যটিকে বাধা দিচ্ছে উপরোক্ত তথ্য। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এই বিষয়ে সর্বশেষ গবেষণালব্ধ ফলাফলটুকু আমায় জানিয়ে আমার তরুণ মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার নতুন দীপ জ্বালিয়ে দেবেন।—কৃষ্ণেন্দু দাস, দুর্গাপুর।

আমার মনে হয় তুমি লেখার সারবস্তু বুঝতে ভুল করেছ। লেখক বলতে চেয়েছেন, তুমি তোমার মস্তিষ্ককে যেমন পরিচালিত করবে, তোমার মস্তিষ্ক তেমনভাবেই গড়ে উঠবে। বার্ধক্যকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের ভাষায় বলা হয় জেরিয়াট্রিক। বার্ধক্যে অন্য অনেক রোগ হত পারে, কিন্তু স্মৃতিভ্রংশ হয় না, যদি ছোটবেলা থেকে মস্তিষ্কের চর্চা করা হয়। আমাদের মস্তিষ্ক দু'মিলিয়ন, মানে কুড়ি লক্ষ, কথা ধরে রাখতে পারে। যে কথা বা ঘটনা

মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষে গভীরভাবে গেঁথে যায়, সেই ঘটনা বহুদিন মনে থাকে, আবার যে ঘটনায় গুরুত্ব দেওয়া হয় না, সে ঘটনা তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। সেইজন্যে দেখবে, দু' মাস আগে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, তাকে তুমি একেবারে ভুলে গেছ, কিন্তু দু' বছর আগে যাকে দেখেছ, যার সঙ্গে কথা বলে তোমার ভাল লেগেছে, তার কথা পুরোপুরি মনে আছে। মস্তিষ্কের কোষগুলি অনেকটা টেপের মতো, একটা ছবি মুছে গিয়ে সেখানে আর-একটা ছবি বসে যায়। এ কোনও রোগ নয়। এই হচ্ছে স্বাভাবিক শারীরতত্ত্বের কথা। একজন বৃদ্ধ কি সব কথা মনে রাখতে পারেন ? যেটি তাঁর স্মৃতিকোষে গভীরভাবে গেঁথে যায়, সেই ঘটনাই মনে থাকে, যেটি গভীরভাবে গাঁথেনি সেটি ভুলে যান। যদি কোনও ঘটনাই মনে রেখাপাত না করে, তা হলে সবই ভুলে যাবেন আর তাকেই বলা হয় স্মৃতিভ্রংশ। এ-ঘটনা দৈবাৎ ঘটে আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটে অতীত জীবনের হতাশার জন্যে। এই ধরনের মানুষ অল্পবয়সেই বৃদ্ধ হয়ে যান, যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় প্রিম্যাচিওর সেনিলিটি। এটি যেমন একটি রোগ, এর ভাল চিকিৎসাও আছে। তুমি এত অল্প বয়সে বার্ধক্যের কথা ভেবে উতলা হচ্ছ কেন ? বাড়ন্ত বয়স, লেখাপড়ার বয়স খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, সেইজন্যে অবাস্তব চিন্তা করে পড়াশোনার বয়স যদি একবার পার হয়ে যাও, সারাজীবনে আর পড়াশোনা করতে পারবে না। জ্ঞান বাড়াবার জন্যে অনেক বই পড়া ভাল। তাতে ভাল কথাও থাকবে, মন্দ কথাও থাকবে। তুমি নিজেকে তৈরি করার জন্যে সবসময় বই থেকে ভাল জিনিস বেছে নেবে। ভবিষ্যতের কথা কি কেউ বলতে পারে ? তুমি এখন থেকেই বার্ধক্যের কথা ভেবে হতাশায় ভুগছ, এটা ঠিক নয়। আজেবাজে চিন্তা ছেড়ে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো, একদিন দেখবে তুমিও বড় হয়েছ, প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। সেদিন হয়তো আমি থাকব না, কিন্তু আমার এই লেখাটি তোমাকে মনে করিয়ে দেবে বার্ধক্যের জীবন শুধু হতাশার নয়, গৌরবেরও।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

খেলাধুলোর 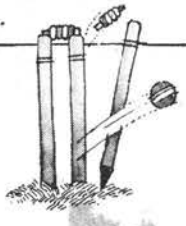 সাথী

বোরোলীন কাটাছড়া, ব্রণ, ফুসকুড়ি, ফাটা ও শুকনো চামড়ার ইনফেকশন সারিয়ে তোলে। বোরোলীনের অ্যান্টিসেপটিক গুণ ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম বোরোলীন

সাধারণ কাটাছড়ায় অসাধারণ কাজ দেয়

এটি প্রসাধন সামগ্রী নয়

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস

টিনটিন * হার্জ

বাপ্‌রে, ও যে ঘোড়ার মতো ছুটছে !··· ও ক্যাপ্টেন, অমন দৌড় লাগালে কেন ?
ছুটুক না, একটু বাদেই হাঁফিয়ে যাবে !
বারা রে, ঘুম পেয়ে যাচ্ছে যে !
ঘড়ঘড়ঘড় ··· ঘড়ঘড়···
আরে প্রোফেসর, তুমি এখানে কী করছ ?
ছাতাটা খুঁজছি ।
এই দ্যাখো, আমার কাছে কত ছাতা ! কোন্‌টা নেবে নাও !
ধুত্, এতে আমার চলবে না !
এইবারে কিস্তিমাত !
আমি··· আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ! স্বপ্ন দেখছিলুম ! এক বীভৎস স্বপ্ন !
সেই রাত্তিরে···
উঃ, পায়ে ভীষণ ব্যথা ! সকালে বোধহয় ঠিক হয়ে যাবে ! গুডনাইট !
গুডনাইট, সাহেব ।
গুডনাইট, ক্যাপ্টেন ।
আমার চোখ দুটি সুন্দর, আমার মন আরও সুন্দর !
?
!
!

তিব্বতে টিনটিন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

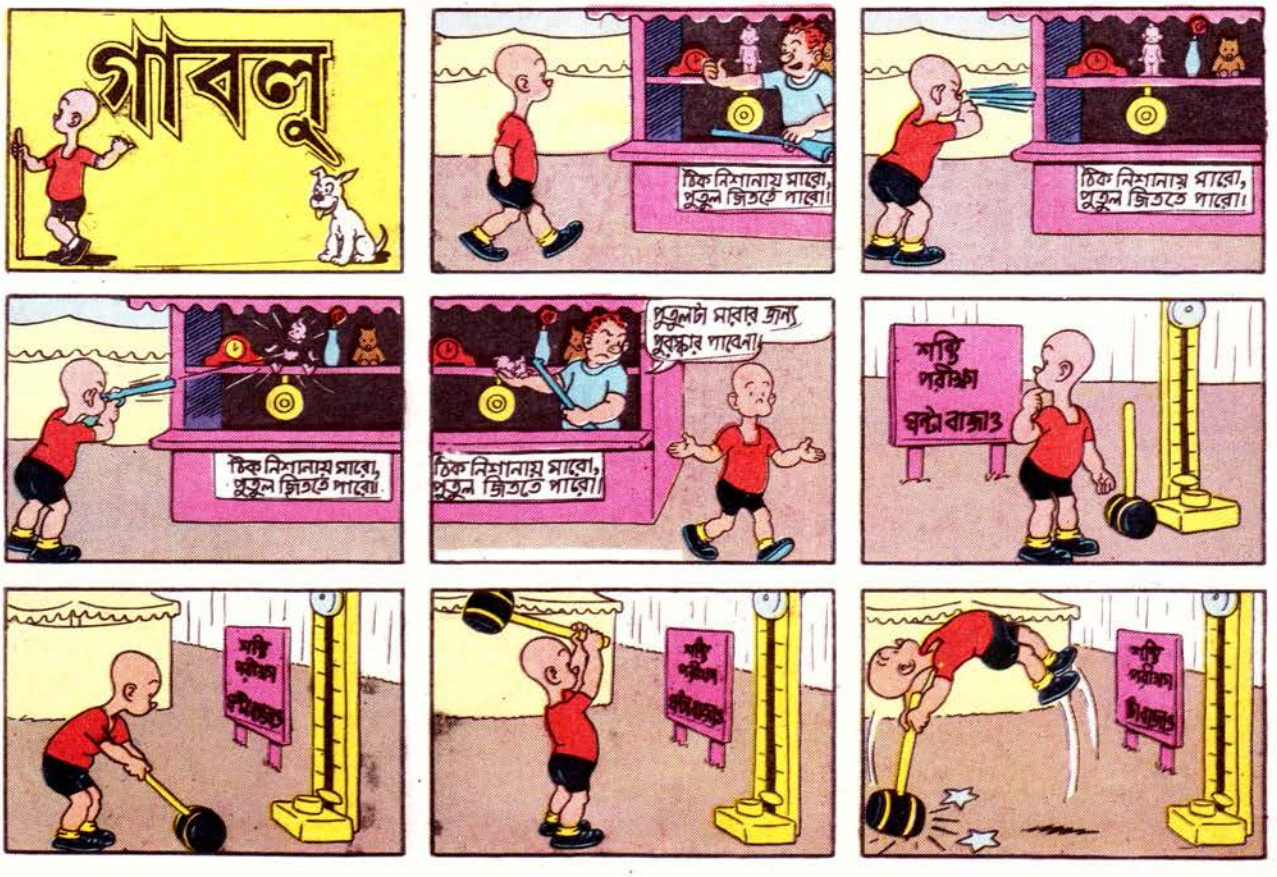

গাবলু
ঠিক নিশানায় মারো, পুতুল জিততে পারো।
ঠিক নিশানায় মারো, পুতুল জিততে পারো।
ঠিক নিশানায় মারো, পুতুল জিততে পারো।
ঠিক নিশানায় মারো, পুতুল জিততে পারো।
পুতুলটা মারার জন্য পুরস্কার পাবেনা!
শক্তি পরীক্ষা
ঘণ্টা বাজাও

গাবলু
বৈশাখ
বীজ পুস্তিকা
জ্যৈষ্ঠ
আষাঢ়
শ্রাবণ
ভাদ্র
আশ্বিন
কার্তিক
ভুট্টা খাওয়ার সময় হল বুঝলে কী করে?

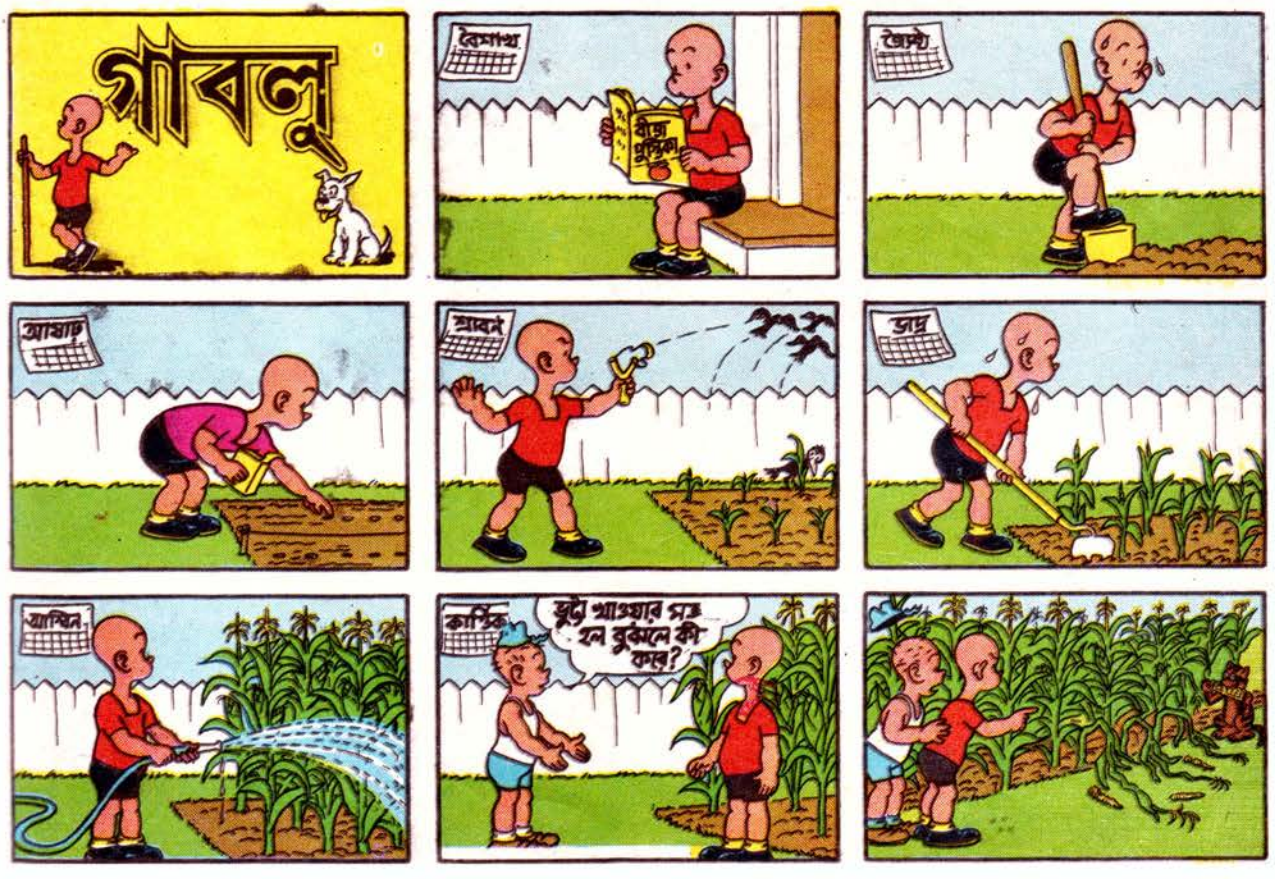

লাম্বা টেস্টেও সফল হবেন, আশা করা যায়

মানস চক্রবর্তী

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের মধ্যে সদ্য-সমাপ্ত সিরিজে ভারতীয় দলের একমাত্র আবিষ্কার রমন লাম্বা। অথচ এই ক'দিন আগেই তিনি ছিলেন অবজ্ঞার শিকার অথবা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। ইংল্যান্ড সফরে ভারতের অভূতপূর্ব সাফল্যের মধ্যে আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম, রমন লাম্বা নামে এক ওপেনার দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং সুযোগের অপেক্ষায় তাঁকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফরের শুরুতেই ভারতের নির্বাচকমণ্ডলী প্রথম দুটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ থেকে সুনীল গাওস্করকে বাদ দিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় নেওয়া হয়েছিল রমন লাম্বাকে। লাম্বা জানতেন, ক্রিকেটারদের সমস্ত অবহেলার জবাব দিতে হয় খেলার মাঠে। সুযোগ পেয়ে যোগ্য জবাব দিতে ভুল করেননি তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ছ'টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ২৬ বছর বয়সী দিল্লির এই যুবকের রান ৬৪, ১, ২০, ৭৪, ১৭ (রান আউট) এবং ১০২। গড় ৫৫.৬০। জীবনের প্রথম সিরিজেই 'ম্যান অব দ্য সিরিজ'-এর দুর্লভ সম্মান। আসলে, যখনই বঞ্চনার শিকার হয়েছেন লাম্বা, তখনই তাঁর ব্যাট ঝলসে উঠে তার যোগ্য জবাব দিয়েছে। গত মরসুমে জম্মু-কাশ্মিরের বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচে তিনি বাদ পড়েছিলেন। তাঁর বদলে যিনি দলে এলেন, তিনি চরম ব্যর্থ হওয়ায় আবার ডাক পড়ল

রমন লাম্বা
ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

পিটিয়ে খেলাই রমন লাম্বার বৈশিষ্ট্য
ফোটো : তারাপদ রায়

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক দিনের ক্রিকেট ম্যাচগুলিতে 'ম্যান অব দা সিরিজ' রমন লম্বা, হাতে চারমিনার চ্যালেঞ্জ ট্রফি

লাম্বার। তারপর গত মরসুমেই একটি ডাবল সেঞ্চুরি সমেত তিনটি সেঞ্চুরি। তার মধ্যে আছে কোটায় রাজস্থানের বিরুদ্ধে স্পিনিং উইকেটে শতরানের দুর্দান্ত একটি ইনিংস। এরপর অবশ্য অস্ট্রেলেশিয়া কাপ এবং ইংল্যাণ্ড সফরে লাম্বার জায়গা কেউ রুখতে পারেনি। তবে ষোলোজনের মধ্যে থেকে প্রথম এগারোজনের তালিকায় আসার কাজটাও তো কম দুরূহ নয়। বিশেষ করে এখনকার ভারতীয় দলে। তবে খুব কম সময়ের মধ্যেই লাম্বা ওই কাজেও সফল হয়েছেন।

পশ্চিম দিল্লির নিউ রাজিন্দার নগরের সালওয়ান স্কুলের এক রোগা লিকলিকে ছেলেকে ব্যাট হাতে ক্রিকেট খেলতে দেখে একদিন থমকে দাঁড়িয়েছিলেন তারক সিনহা। দিল্লির সফল বহু ক্রিকেটার তাঁর ছাত্র। এঁদের মধ্যে আছেন রণধীর সিং, সুরিন্দার খান্না, মনোজ প্রভাকর, কে· পি· ভাস্কর-এর মতো ক্রিকেটার। অভিজ্ঞ চোখ 'রত্ন' চিনতে ভুল করেনি। কিন্তু শৈশবে টাইফয়েডের ফলে লাম্বার চেহারা তখন হাড়-জিরজিরে। সিনহা ওঁর জন্য বিশেষ ব্যায়ামের ব্যবস্থা করলেন। অক্ষরে অক্ষরে সমস্ত নির্দেশ পালন করলেন রমন। ক্রিকেট ও শরীর—দুইই বাড়তে লাগল।

ততদিনে লাম্বা তারকবাবুর হাত ধরে আজমাল খান পার্কে সনেট ক্লাবের নেটে। ওদিকে স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি তখন পি· জি· ডি· এ· ভি· কলেজে। এমন সময় হঠাৎই ইরানি ট্রফিতে অবশিষ্ট ভারতের বিরুদ্ধে দিল্লির হয়ে খেলার সুযোগ এসে গেল। ওই দলের এক নিয়মিত খেলোয়াড় সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন। আর অবশিষ্ট ভারতীয় দলের বোলিং-এর ভার তখন বিনি, দোশি, যাদব ও ঘাবড়ির ওপর। পিটিয়ে খেলে লাম্বা তুলে আনলেন একটি ঝকঝকে অর্ধশতরান। তারপর থেকেই ঘরোয়া ক্রিকেটে রমন লাম্বা একটি পরিচিত নাম।

একদিনের ক্রিকেটে ভারতীয় দলে এখন লাম্বার স্থান পাকা। কিন্তু টেস্টে ? টেস্ট না খেললে তো কোনও ক্রিকেটারের জীবনে পূর্ণতা আসে না। দলের প্রয়োজনে ওপেনারের দায়িত্ব ছেড়ে লাম্বা নীচের দিকেও ব্যাট করতে পারেন। এ-সত্যটা জানা থাকলেও নির্বাচকমণ্ডলী এখনও লাম্বার জন্য কোনও জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে টেস্টে আজাহারের ধারাবাহিক ব্যর্থতা অথবা বর্ষীয়ান মহিন্দার অমরনাথের অনিশ্চয়তা হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে লাম্বাকে ভারতীয় টেস্ট দলে জায়গা করে দেবে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর একদিনের ক্রিকেটে সুযোগ পেয়েই তাকে কাজে লাগিয়েছেন লাম্বা। আর এখন যেরকম ফর্মে আছেন, তাতে সুযোগ পেলে টেস্টেও যে তিনি নিরাশ করবেন না, এটা আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। অনেকের আশঙ্কা, লাম্বার খেলার টেকনিক একদিনের পক্ষেই উপযুক্ত, তিনি সর্বদাই স্ট্রোক করার জন্য ব্যস্ত। টেস্ট খেলার মানসিকতা ও টেকনিক তাঁর নেই। লাম্বা এর উত্তরে বলেছেন, 'তা হলে তো ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনেকেই টেস্ট খেলতে পারতেন না।'

লাম্বার এই কথায় একটা জিনিস স্পষ্ট। তিনি স্ট্রোক করেই খেলবেন। সুতরাং একঘেয়েমিতে ভরা টেস্ট খেলাগুলিতে তিনি যে নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করবেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। রান দিয়ে কি সবসময় খেলার বিচার করা যায় ?

রে তৈরী ওষুধ, অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম, ক্যালামাইন্স, লোশন হেনতেন... কত কীই
া লাগালাম–কিন্তু আমার ব্রণর জন্যে শেষ পর্যন্ত কাজে দিল, ক্লিয়ারাসিলই!"

কত অসংখ্য উপদেশই না শুনতে হত···

"তেল মশলাওয়ালা খাবার খাওয়া ছাড়ো," "মুখটি রোজ স্টীম ক'রে নাও," "দিদিমা বলতেন, বেসনের প্রলেপই হ'ল সবচেয়ে ভাল," "কোনো স্কীন লোশন লাগিয়ে দেখেছ?" "ক্যালামাইন বাবা বড় ঠাণ্ডা,"

"এই বিউটি ক্রীমই নিশ্চয়ই কাজে দেবে," এই ধরণের কত না উপদেশ—কেউ কেউ তো আবার অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীমের কথাও বলেছেন...আর তারপর, বিশ্বাস করবেন? ঐ সবগুলি আমি লাগিয়ে দেখেছি—কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনোটিই কাজে দেয়নি।

এতকিছু করার পর, যখন একেবারে প্রায় নিরাশ হয়ে পড়ছিলাম···

...তখন আমার এক বান্ধবী বললেন, "অতি সাধারণ ফেস ক্রীম বা লোশনও হয় তেল-আধারিত, তাই ওসব দিয়ে ঐ সমস্যা আরও খারাপের দিকে মোড় নেয়, ব্রণর জন্যে তোর এমন কিছু ব্যবহার করা উচিত যা তেল-আধারিত নয়...এমন কিছু যা, বিশেষ ক'রে ব্রণর জন্যেই তৈরী হয়েছে...যেমন ধর ক্লিয়ারাসিল"। তখন আমি ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করতে শুরু করলাম, আর, বলুন তো তারপর কি হ'ল? ওটি চমৎকারভাবে কাজ করল!

ক্লিয়ারাসিল-এ ব্রণর জন্যেই বিশেষ ফর্মূলা থাকে ব'লে, এটি এত সুন্দরভাবে কাজ করে

ক্লিয়ারাসিল-এ, ব্রণ প্রতিরোধ করার বিশেষ ওষুধ থাকে, যা আসলে, আপনার ত্বকের সমস্ত বাড়তি তেল শুষে নেয়—ঐজন্যেই আপনার ত্বক থাকে একবারে তকতকে পরিষ্কার তাই, ব্রণও শুকিয়ে যেতে পারে খুব শিগ্‌গির। আর এবার, নতুন উন্নত ক্লিয়ারাসিল, ব্রণ বেরোতে দেওয়াই রোধ করে, কারণ এতে ট্রাইক্লোসান নামে একটি অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ওষুধ থাকে যা, ব্যাকটিরিয়ার প্রতিরোধ করে। তার ফলেই, কোনোরকম সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে না, আর ব্রণও হতে পারে না।

ক্লিয়ারাসিল লাগানো শুরু করুন, প্রথম থেকেই, কাঁচা বয়স থেকেই

মনে রাখবেন একটি ব্রণই আরেকটি ব্রণ হওয়ার রাস্তা খুলে দেয়। তাই, প্রথম ব্রণ হওয়ার লক্ষণ দেখা দেওয়ামাত্রই, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করতে থাকুন, ক্লিয়ারাসিল।

সেরা ফল পেতে হলে, ক্লিয়ারাসিল, একনাগাড়ে বেশ কিছুকাল ধরে দিনে দুবার ক'রে লাগাতে থাকুন।

ক্লিয়ারাসিল ৩ ভাবে কাজ করে:

ব্রণর ভেতর পর্য্যন্ত পৌছয়:
এর বিশেষ ওষুধ ব্রণর মুখ খুলে দিয়ে ব্রণর গভীরে পৌঁছয়।

ব্যাকটিরিয়ার প্রতিরোধ করে:
অ্যান্টি-ব্যাকটিরিয়াল ট্রাইক্লোসান, ব্রণ ছড়িয়ে পড়া রোধ করার জন্যে, ব্যাকটিরিয়ার প্রতিরোধ করে।

ব্রণ শুকিয়ে দেয়:
ত্বকের বাড়তি তেল শুষিয়ে দিয়ে ব্রণ শুকিয়ে দেয়।

ক্লিয়ারাসিল—ব্রণর বিশেষ ওষুধ, যা সত্যি সত্যিই কাজ দেয়।

OBM/7788/BEN

গাওস্কর

এখনও যাঁর কাছে খেলা শেখেন

রূপক সাহা

"পুনেতে এসেছেন, আর সুনীল গাওস্করের কোচের সঙ্গে দেখা করে যাবেন না? কেমন ক্রীড়া-সাংবাদিক আপনি মশাই?" বেশ অবাক হয়েই কথাগুলি বললেন রাজু মেহতা। আমরা কথা বলছিলাম পুনেতে সানি'জ স্পোর্টস বুটিক-এ বসে। অর্থাৎ কিনা সানির ক্রিকেট সরঞ্জাম বিক্রির দোকানে। মহারাষ্ট্রের রঞ্জি খেলোয়াড় রাজু আবার সানির ব্যবসার অংশীদার। রাজু দোকানে বসেই আঙুল দিয়ে দেখালেন, "ওই যে, ডেকান জিমখানা মাঠের ঠিক পিছনের বাড়িটাতেই থাকেন কমল ভাণ্ডারকর। সানি পুনেতে এলে একবার না একবার কোচের বাড়িতে যাবেই। এই তো গত সপ্তাহে দলীপ ট্রফির ম্যাচ খেলতে এসে ওখানে গিয়েছিল।"

মিনিট পাঁচেক পরই হাজির হলাম কমল ভাণ্ডারকরের বাড়িতে। লোহার গেট খুলে ঢোকার চেষ্টা করতেই তেড়ে এল একটা দিশি বড়সড় কুকুর। সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষীণ কণ্ঠে, "পমি, ওকে ভেতরে আসতে দাও।" ব্যস, ঘেউ-ঘেউ বন্ধ। লেজ নাড়াতে নাড়াতে পমিই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। একতলার বৈঠকখানায় বিছানার ওপর কমল ভাণ্ডারকর শুয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে কৌতূহলী চোখে উঠে বসলেন। তারপর বললেন, "বাড়িতে আর কেউ নেই। আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। পমিই আমাকে পাহারা দেয়।"

আমি পরিচয় দিতে প্রথমেই উনি জিজ্ঞেস করলেন, "কমল ভট্টাচার্য কেমন আছেন? আমরা একই সময়ে খেলেছি।" কমল ভট্টাচার্য বাংলার নামী ক্রিকেটার। ১৯৩৮-৩৯ সালে রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ান বাংলা দলে খেলেছিলেন (ওই একবারই বাংলার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছিল)। বাংলার ক্যাপ্টেন সেবারে ছিলেন লংফিল্ড। পরে অবশ্য ক্রিকেট ভাষ্যকার হিসেবেও যথেষ্ট পরিচিতি পান। কমলবাবুর কুশল জানাবার পরেই, বেশ উৎসাহের সঙ্গেই তুললাম গাওস্করের কথা। ভাণ্ডারকর আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে বললেন, "ও কিছু নয়। তারপর বলুন, বাংলা থেকে টেস্ট প্লেয়ার উঠে আসছে না কেন?"

আমিও নাছোড়বান্দা। একাধিক বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী গাওস্করের প্রসঙ্গ তুলেই ভেবেছিলাম, উনি নানা রোমাঞ্চকর ঘটনা শোনাবেন। কবে ভুল করার জন্য গাওস্করকে শাস্তি দিয়েছিলেন, তিনি কোচ না করলে গাওস্কর এত বড় হতে পারতেন কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে প্রদীপ ব্যানার্জিকে দেখে-দেখে কোচ সম্পর্কে অনেকের এমন ধারণাই হয়ে গেছে। কিন্তু ভাণ্ডারকর সেদিকে গেলেনই না। উনি নিজেও ত্রিশ-চল্লিশের দশকে নামী ক্রিকেটার ছিলেন। উইকেট রক্ষা করতেন। তবে টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। খেলা শিখেছেন সি· কে· নাইডুর (ভারতের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক) কাছে। দুষ্টুমি করে জানতে চাইলাম, "গাওস্করকে কি আপনি সি· কে· নাইডুর থেকেও বড় ক্রিকেটার মনে করেন?" একদিকে গুরু, অন্যদিকে শিষ্য—কাকে বড় বলেন, তা জানার জন্য উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলাম। উত্তর না দিয়ে ভাণ্ডারকর হোহো করে হেসে উঠলেন।

গাওস্করকে প্রথম দেখেছিলেন ভাণ্ডারকর, খুব ছোট্ট বয়সে। সানির বাবার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। একদিন বোম্বাইয়ে মনোহর গাওস্করের বাড়িতে গেছেন। সানি তখন ব্যাট হাতে বেরোচ্ছেন স্কুল টুর্নামেন্টের একটা ম্যাচ খেলার জন্য। ভাণ্ডারকর জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাট নিয়ে ঠিক কীভাবে ক্রিজে দাঁড়াও, দেখাও তো আমাকে?" সানি স্ট্যান্স নিলেন। ভাণ্ডারকর দেখে-টেখে বললেন, "তোমার ব্যাট ধরাতেই গলদ আছে। বড় ক্রিকেটার হবে কী করে?" সানির হাত থেকে ব্যাটটা নিয়ে উনি দেখাতে শুরু করলেন, কেমনভাবে ক্রিজে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত। ড্রয়িং রুমটা তখন হয়ে গেল প্রায় ক্রিকেট নেট। সেসময় ভাণ্ডারকর নাম করেছিলেন কোচ হিসেবে। সানি মন দিয়ে শুনে নিলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন ম্যাচ খেলতে। নতুন কোচের কথা শুনে খেললেনও ভাল, রানও পেলেন। ব্যস্, ভাণ্ডারকরকে আঁকড়ে ধরলেন সানি সেদিন থেকেই।

ভাণ্ডারকরের মুখে এসব কথা শুনতে বেশ ভাল লাগছিল। ভাবছিলাম, যাঁরা প্রতিভাবান, তাঁরা কত সহজে এবং দ্রুত সবকিছু গ্রহণ করতে পারেন! ভাণ্ডারকরের সামান্য টিপ্স থেকে সানি কত সহজেই না নিজের ভুল শুধরে নিলেন! ভাণ্ডারকর পুনের বাসিন্দা, সানি বোম্বাইয়ের। কীভাবে তা হলে ওঁকে কোচ করেছেন? ঘণ্টা চারেকের পথ, সানি কি তা হলে আসা-যাওয়া করতেন? ভাণ্ডারকর বললেন, "না, না, তা নয়। আসলে ও যখনই ব্যাটিং নিয়ে সমস্যায় পড়েছে, আমার কাছে তখনই ছুটে এসেছে। ওর ধারণা, আমার কাছে এলেই নিজেকে শুধরে নিতে পারবে। আমারও বাড়তি একটা কাজ হয়েছে। বসে-বসে টিভিতে ওর ব্যাটিং দেখা। ভুল করলে আমিই চিঠি লিখে ওকে এখনও ডেকে আনি। তারপর দু'জনে চলে যাই ডেকান জিমখানার নেটে।"

নিজের ভুল শোধরানোর জন্য সানি শেষ কবে এসেছিলেন? ভাণ্ডারকর বললেন, "তা প্রায় বছর চার-পাঁচেক আগে। তখন ওর ২৯টা সেঞ্চুরি হয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ায় ভাল রান পেল না। লেগ সাইডের বল খেলতে পারছিল না। মন খারাপ করে একদিন ছুটেও এল আমার কাছে। নেটে নিয়ে গিয়ে সারাদিন দেখালাম, কীভাবে দ্রুত পা সরিয়ে নিয়ে খেলতে হবে। তারপর চলে গেল। ওকে বেশি দেখাতে হয় না। দেখুন, ডন ব্রাডম্যানের রেকর্ডটা তো শেষ পর্যন্ত ভাঙল!"

সানি এত সফল হলেন কী করে? প্রশ্নটা শুনে ভাণ্ডারকর সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন, "নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা আর কঠিন সংকল্প, এই তিনটির জন্য।" মনে পড়ল, কয়েক দিন আগে গাওস্করও তরুণ ক্রিকেটারদের এই তিনটি সুপরামর্শই দিয়েছিলেন। ভবিষ্যতের গাওস্কররা কি তা মেনে চলবেন?

ওর দাঁতকে এখন থেকেই সুরক্ষিত করে নিন

এই ফ্লোরাইড সংরক্ষণ একে সিবাকা ফ্লোরাইড দিয়ে করুন

দাঁতকে জীবনভর সঙ্গী ক'রে নিতে হ'লে, দন্তছিদ্রের সংরক্ষণ করুন আর, সিবাকা ফ্লোরাইড-এর ফ্লোরাইডই দেয় ঐ অপরিহার্য সংরক্ষণ। কারণ, মুখের ভেতরের ক্ষতিকর অ্যাসিড যখন দাঁতের তলার ভাগকে ঘিরে ফেলে, তখন এই ফ্লোরাইড, দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে গিয়ে দন্তছিদ্র হওয়া রোধ করে—আর, ফলে, প্রাথমিক অবস্থাতেই দন্তক্ষয় হওয়াও রোধ হয়।

তাই সিবাকা ফ্লোরাইড দিয়ে, দন্তছিদ্র হওয়া বন্ধ করুন, দন্তক্ষয় রোধ করুন।

দাঁতে নব জীবনের সাড়া

সিবাকা ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

ভারতের সর্বপ্রথম ও প্রভাবশালী ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

ULKA-HCG-CF-10-86–BEN

উষার সাফল্যের মূলে

(ডাঃ) সুনীল ঠাকুর

আর সব সফল অ্যাথলেটের মতো উষাও যে আজ এতটা সফল হয়েছেন, তার প্রাথমিক কারণ তাঁর দৈহিক সক্ষমতা বা অসাধারণ ফিজিক্যাল ফিটনেস। এ-ধরনের শারীরিক পটুতা অর্জনের কয়েকটি বিশেষ উপায় আছে।

এক, বিশেষ অ্যাথলেটের শক্তিব্যয় (এনার্জি আউটপুট) করার ক্ষমতাবৃদ্ধির ওপর এটা অনেকাংশ নির্ভর করে।

দুই, মাংসপেশীর দৃঢ়তা বা সক্ষমতা (মাস্‌ল পাওয়ার) ক্রমে-ক্রমে বাড়াতে হয়।

তিন, মোটিভেশন, অর্থাৎ যে কোনও শাখায় (যেমন দৌড়ে উষা) পারদর্শিতা অর্জনের জন্য বিশেষ ধরনের মানসিক প্রস্তুতি এবং ওই বিষয়ে ট্যাকটিক্‌স বা কৌশল অর্জন।

চার, নিবিড় অনুশীলন ও বিজ্ঞানভিত্তিক কোচিং বা প্রশিক্ষণ।

উষার মধ্যে এই সব ক'টি গুণেরই সমাবেশ ঘটেছে। দৌড় প্রতিযোগিতায় ঠিক সময়ে গতি বাড়ানোটাই সবচেয়ে বেশি দরকার। গতি বাড়াতে হলে বায়বিক শক্তিও (এরোবিক এনার্জিও) বাড়াতে হয়। উষার এই ধরনের বায়বিক শক্তি বা অক্সিজেন গ্রহণক্ষমতা (আপটেক) বেশি। দেখা গেছে, এক লিটার অক্সিজেন গ্রহণের জন্য পাঁচ কিলো ক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয় এবং প্রতি মিনিটে নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন ব্যয় হয়। উষার মতো সফল দৌড়বিদের অক্সিজেন গ্রহণক্ষমতা সাধারণের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি।

পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, দৌড়ের কোনও প্রতিযোগী কতটা সফল হবেন, সেটা নির্ভর করে তাঁর অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা এবং ওই অক্সিজেনকে মাংসপেশীর মধ্যে সঞ্চালন করার বিশেষ ক্ষমতার ওপর। মাংসপেশীর দৃঢ়তা এবং সক্ষমতার ওপর ছোটার গতি বাড়ে-কমে। উষার পা দুটি লম্বা এবং ওঁর মাংসপেশীর দৈর্ঘ্যও বেশি। এর ফলে ওঁর পায়ের মাস্‌লের অক্সিজেন আপটেক বা গ্রহণ ক্ষমতা অনেক বেশি। আর এই অক্সিজেন ইউটিলাইজেশন-এর ওপর মাংসপেশীর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

দেহের গড়ন ও প্রকৃতি (অ্যানথ্রোপোয়েমেট্রিক মেজারমেন্ট) এবং পায়ের পদক্ষেপের দূরত্ব বৃদ্ধিও একজন দৌড়বীরকে সফল হতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। উষাকে আমি দেখেছিলাম নবম এশিয়ান গেমসের সময় নয়াদিল্লিতে ১৯৮২ সালে। পাতলা ছিপছিপে গড়ন (স্লিম ফিগার) এবং লম্বা পা দুটির সাহায্যে উষা আজ বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারিণী। উষার স্ট্রাইড-লেংথই ওঁকে বাড়তি সুবিধা এনে দিয়েছে বলে আমি মনে করি।

দৌড় প্রতিযোগিতার আর-একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দিক হল ফুসফুসের বিশেষ ক্ষমতা। যাঁর দম এবং ভাইটাল ক্যাপাসিটি (ফুসফুস থেকে শ্বাস গ্রহণের পর সবচেয়ে বেশি কতটা গ্যাস ত্যাগ করা সম্ভব সেই ক্ষমতার পরিমাপ) যতটা বেশি, তিনি ততটা সফল। একজন দৌড়বীরের ফুসফুসের ভাইটাল ক্যাপাসিটি এভাবে মাপা হয়: প্রথমে তাঁকে বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিতে (ডিপ ইনস্‌পিরেশান) এবং তারপরে সেই শ্বাস সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে বলে এক সেকেন্ডে কতটা ভাইটাল ক্যাপাসিটি হয় তা মেপে তাঁকে একশো গুণ করলে ওই দৌড়বীরের সম্পূর্ণ ভাইটাল ক্যাপাসিটির একটা হিসেব পাওয়া যাবে। উষার ভাইটাল ক্যাপাসিটির মাপ হবে মোটামুটি শতকরা আশি।

মাংসপেশীর দৃঢ়তা, সঙ্কোচন ও প্রসারণক্ষমতা একজন দৌড়বীরের অন্যতম বিশেষ মূলধন। যাঁর মাস্‌লের স্ট্রেংথ যত বেশি, তিনি তত সফল। মাংসপেশীর দৃঢ়তা ও শক্তি নির্ভর করে অনেকটা ওই দৌড়বীরের ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণের ওপর। বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়াম এবং নিবিড় অনুশীলনের দ্বারাই মাংসপেশীর সক্ষমতা আনা সম্ভব। অনেকে হয়তো বলবেন, উষার পক্ষে জয়ী হওয়া সম্ভব হয়েছে ওঁর দৈহিক গড়ন এবং লম্বা পদক্ষেপের জন্য, যা তাঁর বংশগত ও জন্মগত বৈশিষ্ট্যের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? হয়তো কিছুটা সত্যি। তবে উষা মনেপ্রাণে নিজেকে গভীর প্রশিক্ষণের মধ্যে নিয়োজিত রেখেই এতটা সফল হয়েছেন। এই যে বড় হবার অদম্য সঙ্কল্প, কৃতী দৌড়বীর হবার দুর্মর বাসনা, অর্থাৎ তাঁর সহজাত ইচ্ছা বা কামনা (ইনহেরেন্ট মোটিভেশন)—এটাই তাঁর আসল মূলধন। আর এটা তাঁকে অর্জন করতে হয়েছে অনেক আত্মত্যাগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে। উষা নিজেও কথাটা স্বীকার করেছেন।

প্রতিটি স্যুইট খাসা দারুণ মজায় ঠাসা!

বড় আকার!
খেতেও বড় মজাদার!

নিউট্রিন
SuperStar
সেরা টফি চমৎকার

nutrine ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর স্যুইট
নিউট্রিন কনফেকশানারী কোং প্রাঃ লিঃ, চিত্তুর, অ. প্র.

রোভার্সের রয়

সেদিন দেখা গেল এক আশ্চর্য ফ্রি-কিক !

রয় যেহেতু ক্লাবের পিছনে বড্ড বেশি সময় দিচ্ছে, ক্ষুব্ধ পেনি তাই যমজ বাচ্চা দুটিকে নিয়ে ক্রিটে চলে যায় । দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যেতে পারে রোভার্স, ইউরোপিয়ান কাপেও সে জালমোর কাছে হারতে বসেছে । এই সময়ে দর্শকদের আসনে দেখা যায় পেনিকে । রোভার্স ফ্রি-কিক পেয়েছে···

(ক্রমশ)

বিজ্ঞানে রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত

অরূপরতন ভট্টাচার্যের

সাড়া-জাগানো, বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শ

কী খাব না খাব

দাম ৮·০০

ভাতের সঙ্গে জল খাওয়াটা কি অনুচিত ?
স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য টনিক খাব, না অন্য কিছু ?
প্লাস্টিকের ঠোঙায় খাবার রাখা কি নিরাপদ ?
ঘন করে ফুটিয়ে খাব দুধ, নাকি অল্প জ্বাল দিয়ে ?
পোলট্রির ডিম খাব, না দেশী ডিম ? হাঁসের ডিম না মুরগির ডিম ?
চিনি বেশি উপকারী না গুড় ?
নিরামিষ খাব, না আমিষ খাব ? কুচো মাছ, না বড় মাছ ?
তেল খাব, না ঘি ?
মিষ্টি খেলে কি ক্রিমি বাড়ে ? ঠাণ্ডা লাগলে কি দই-কলা খাওয়া ঠিক নয় ? টক ফল খেলে কি অ্যাসিড হয় ?
আমাদের প্রতিদিনের জীবনে এমনতর সব প্রশ্ন, এই সংক্ষিপ্তায়তন অথচ মূল্যবান বইতে তারই জবাব দিয়েছেন বিজ্ঞানে রবীন্দ্রপুরস্কারবিজয়ী লেখক অরূপরতন ভট্টাচার্য।
বিজ্ঞানসম্মত এই সব উত্তরে ঘুচে যাবে বহু সংশয়, ভেঙে যাবে বহু বদ্ধমূল সংস্কার, দূর হবে বহু অযৌক্তিক ধারণা। অরূপরতন জানেন, জটিল বিষয়কেও কী করে নিতান্ত সহজভাবে সাধারণের সামনে তুলে ধরতে হয়। লেখার সেই জাদুতেই এ-বইটি দ্বিগুণ আকর্ষণীয়।
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সমীর বিশ্বাস।

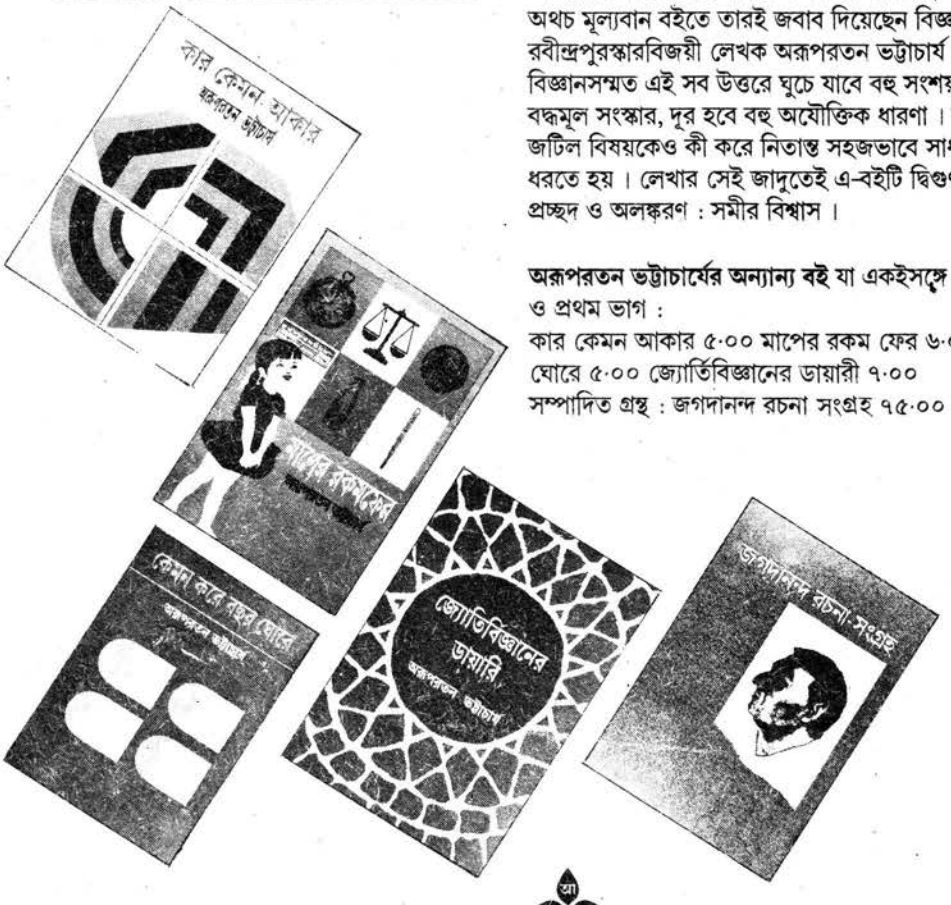

অরূপরতন ভট্টাচার্যের অন্যান্য বই যা একইসঙ্গে বিজ্ঞানের সহজ পাঠ ও প্রথম ভাগ :
কার কেমন আকার ৫·০০ মাপের রকম ফের ৬·০০ কেমন করে বছর ঘোরে ৫·০০ জ্যোর্তিবিজ্ঞানের ডায়ারী ৭·০০
সম্পাদিত গ্রন্থ : জগদানন্দ রচনা সংগ্রহ ৭৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

আপনার ত্বক কি বলে?

আপনার ত্বক যদি কথা বলতে পারতো, তাহলে তার দাবী নিশ্চয়ই শুনতে পেতেন, "মার্গো সাবান আমার চাই-ই—রোজ"।

কেন জানেন?

কারণ, মার্গো সাবান আপনার ত্বকের সত্যিকারের আপনজন। ভারতের আদি নিম সাবান মার্গোয় খাঁটি নিমতেলের প্রাচুর্য সব থেকে বেশি। যে নিমতেল অনেক ভাবে ত্বকের উপকার করে।

তাই মার্গো সাবান আপনার ত্বককে শুধু পরিষ্কারই রাখে না, যত্নও করে তার।

মার্গোর অ্যান্টিসেপ্টিক গুণে রোমকূপের গভীর থেকে লুকোনো ধুলোময়লা বেরিয়ে আসে—ত্বক পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সুস্থ চামড়ায় কোন খুঁত বা দাগের অবকাশ থাকে না।

মার্গোর প্রাকৃতিক উপাদানের এমনই গুণ যে, স্নানের সময় ধুয়ে যাওয়া তেল আবার সহজেই তৈরী করে নিতে পারে ত্বক।

মার্গো সাবানের আরো এক গুণ, অত্যধিক তেলতেলে ভাব কেটে গিয়ে ত্বকে আসে এক ঝরঝরে সজীবতা।

তাই, এমন সাবান যদি চান যা আপনার ত্বকের প্রয়োজন বুঝবে, তবে মার্গো মেখে দেখুন।

শুধু আমরা বলছি বলে নয়, দেখুন আপনার ত্বক কি বলে।

কান পেতে শুনেছেন ত্বক কি বলে?

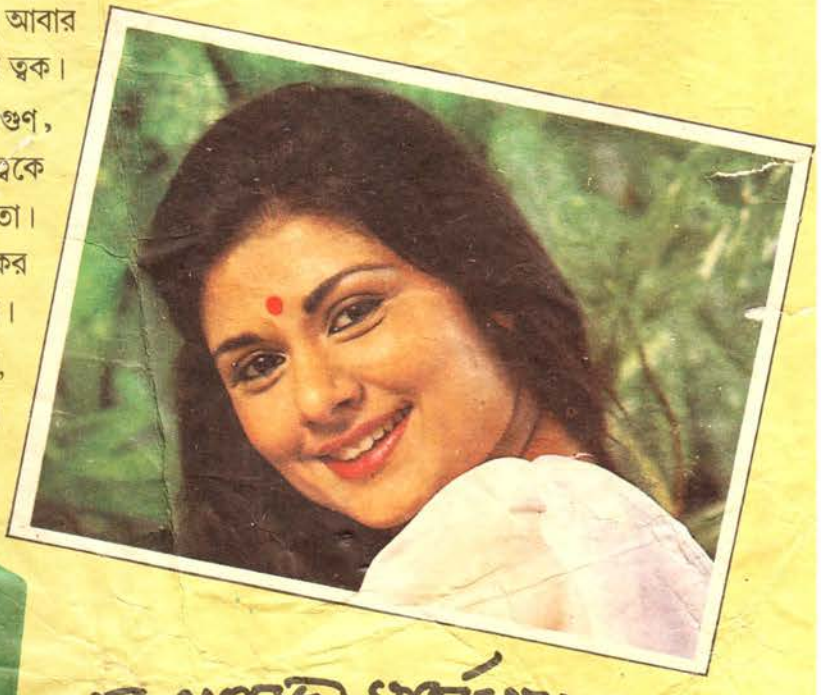

ত্বকের আপনজন মার্গো সাবান

THE ORIGINAL NEEM SOAP
SINCE 1920
ALSO SOLD IN EUROPE & USA

esponse 3004 R

মার্গো তৈরী করেন ক্যালকাটা কেমিক্যাল

Anandamela 24 December 1986. Regd. No. WB/CC/264. MH By-South
683TN/MS(c)/731

Winner of Top PLEXCONCIL EXPORT AWARD–1978-79-80-81-82-83-84

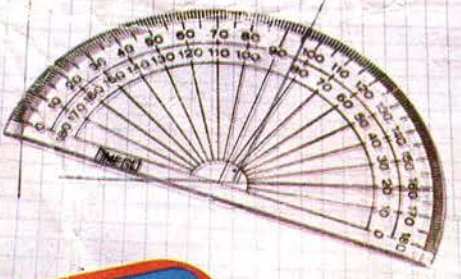

Omega– The ultimate in quality.

Allied Instruments Pvt. Ltd.,
30-CD Government Industrial Estate,
Kandivli (West), Bombay-400 067.
Phone: 692425 • 685068 • 696721 • 697188
Telex: 011-3069 AIPL • Cable: ARTCORNER

Also Available:
Omega Eagle
Omega Glory
Omega Glory-86
Omega Liba
Omega World Time

Distributors: GREATER BOMBAY: M/s. D. Jagjivandas & Company, 177, Abdul Rehman Street, BOMBAY-400 003. Tel. 326524 * MAHARASHTRA: M/s. A. Aalok & Co., 107, Regal Industrial Estate, Acharya Donde Marg, Sewree (West), BOMBAY-400 015. Tel.: 8823295, 8823215 * GUJARAT: M/s. N. Chimanlal & Company, Jasmine Bldg., Khanpur, AHMEDABAD. Tel.: 395193 * DELHI, HARYANA, PUNJAB, J.K. & HIMACHAL PRADESH: M/s. Bharati Traders, C/o. Kirparam Sethi & Sons, 89, Chawri Bazar, DELHI-110 006. Tel.: 262854 * KARNATAKA, ANDHRA PRADESH & GOA: M/s. Sanghvi Corporation, "Suresh Building", First Floor, No. 17, 4th Cross, Kalasipalayam, New Extension, BANGALORE: 560 002. Tel.: 225702 * CALCUTTA & WEST BENGAL: M/s. Sanghvi Corporation, 14/1/A, Jackson lane, IInd Floor, Calcutta-700 001. Tel.: 262141 * UTTAR PRADESH: M/s. Sanghvi Corporation, 7 A, Balmiki Marg, Kaisar Baugh, Lucknow (U.P.)-Tel.: 35095 *, TAMILNADU: Sanghvi Corporation, 35 Strotten Muthia Mudali Street, 1st Floor, MADRAS-600 079.
* REST OF INDIA: M/s. Sanghvi Corporation, 107, Regal Industrial Estate, Acharya Donde Marg, Sewree (West), BOMBAY-400 015. Tel.: 8823295-8823215

3 Brothers/OS/286